দ্য মিথ অব সিসিফাস
আলবের কামু
অনুবাদ : উদয়শংকর বর্মা
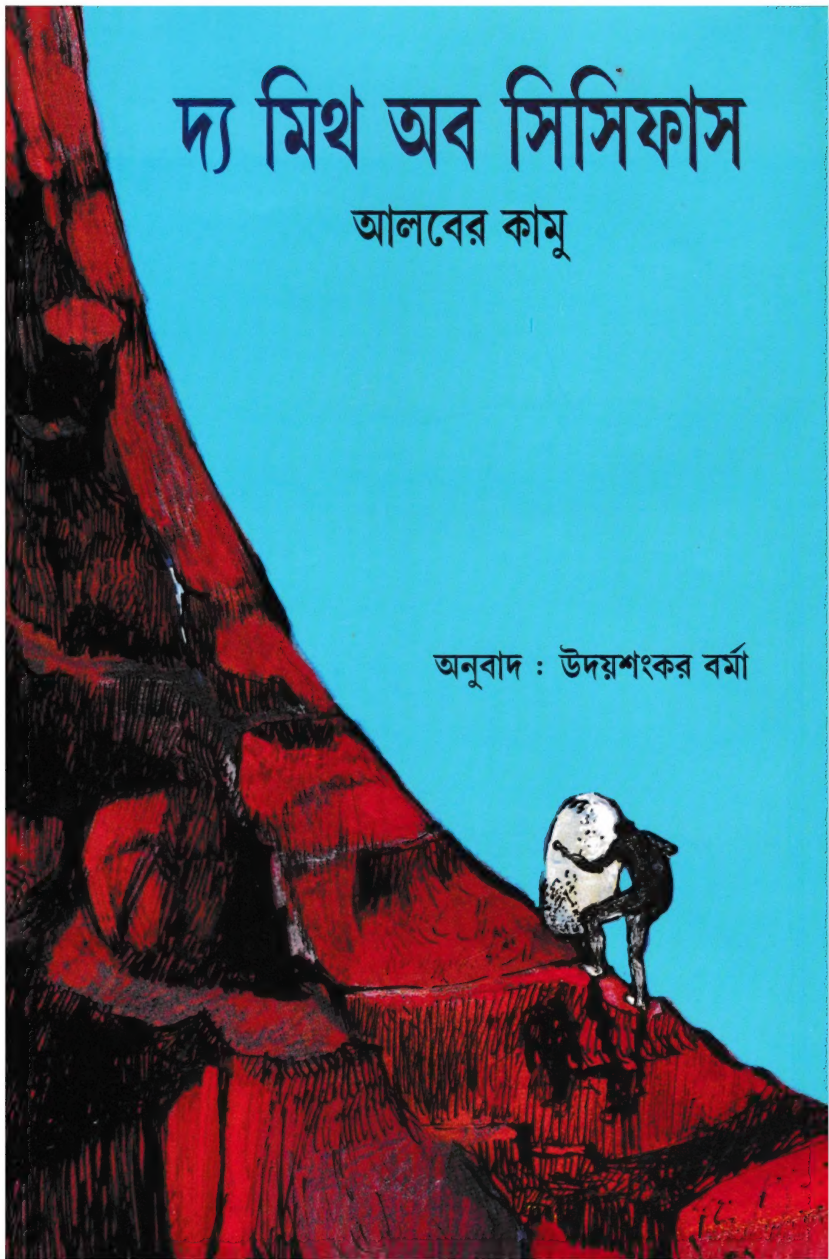
ল্য মিত্ দ্য সিজিফ্ বা দ্য মিথ্ অব সিসিফাস আলবের কামু'র দর্শনবিষয়ক প্রথম প্রবন্ধ সঙ্কলন। এটি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। অ্যাবসার্ডের তত্ত্বই এখানে মূল উপজীব্য। যখন ঈশ্বরের দেখা নেই, ধ্রুব সত্য বা মূল্যবোধ বলেও কিছু নেই, তখন অসঙ্গতির এই ভুবনে প্রাঞ্জলতার জন্যে মানুষের আকুতিকে, জীবনের অর্থের খোঁজে তার তৎপরতাকে কামু গভীরভাবে অনুধাবন করতে চেয়েছেন। উৎকণ্ঠা, হতাশা ও ব্যর্থতা কাটিয়ে আত্মহত্যাকে জয় করার কথা বলেছেন, ব্যক্তির প্রতিবাদী সত্তাটির চেয়েছেন উন্মোচন। সাহিত্য ও দর্শনের যুগল সম্মিলনে, কামুর যুক্তিপূর্ণ তর্ক ও মননপ্রখর ভাবুকতায় এই ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থটি পৌনে এক শতক ধরে বিশ্বময় অগণিত পাঠককে আবিষ্ট করে রেখেছে। অ্যাবসার্ডের আলোয় ফ্রান্ৎস কাফকার সাহিত্যকীর্তি ও শিল্পী সত্তাটিকেও অতি নিপুণতায় এখানে বিশ্লেষণ করেছেন কামু।

আলবের কামু (১৯১৩-১৯৬০)
স্বনামধন্য ফরাসি সাহিত্যিক, দার্শনিক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম *লেত্রঁজে* (বিদেশি)-১৯৪২, *লা পেস্ত্* (মড়ক)-১৯৪৭, *লা শ্যুত্* (পতন)-১৯৫৭, *লা মরতোরোজ* (সুখী মৃত্যু)-১৯৭১ ইত্যাদি। এছাড়া অসংখ্য নাটক, প্রবন্ধগ্রন্থ ও ছোটগল্পের বইও আছে তাঁর। কামু জন্মেছিলেন ফরাসি উপনিবেশের আলজিরিয়ায়, মন্দোভি-তে যা এখন দ্রেয়ঁ নামে পরিচিত। আলজিরিয়া থেকে প্যারিসে চলে এসেছিলেন চিরতরে, জন্মভূমির নাড়ী ছিঁড়ে। সেই প্রবাসবোধ কখনই কাটেনি তাঁর। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন তিনি। ১৯৫৭-য় মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি অর্জন করে নিয়েছিলেন নোবেল পুরস্কারের বিরল সম্মান।

এই গ্রন্থের অনুবাদক উদয়শংকর বর্মা একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ও সমালোচক। বহুভাষাবিদ এই প্রাবন্ধিক ও অনুবাদকের ইতিমধ্যেই প্রকাশিত যে বইগুলি পাঠকের অভিনন্দন কুড়িয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ***উপন্যাসের অন্য ভুবন*** (দেশ বিদেশের উপন্যাসবিষয়ক আলোচনা), ***অন্তরঙ্গ জার্নাল*** (বোদলেয়ারের জুর্নো অ্যাঁতিম-এর অনুবাদ), ***মঁপার্নাসের বুবু*** (শার্ল লুই ফিলিপের বুবু দ্য মঁপার্নাস নামের ফরাসি উপন্যাসের সরাসরি বাংলা অনুবাদ) ইত্যাদি। ধ্রুপদী ও আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য নিয়ে এই লেখকের বেশ কিছু নিবন্ধ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

# দ্য মিথ অব সিসিফাস

(ল্যা মিত্ দ্য সিজিফ্)

# দ্য মিথ অব সিসিফাস

## (ল্য মিত্‌ দ্য সিজিফ্‌)

আলবের কামু

মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ, ভূমিকা ও টীকা
উদয়শংকর বর্মা

এবং মুশায়েরা
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

THE MYTH OF SISYPHUS
(LE MYTHE DE SISYPHE)
par Albert Camus
Bengali Translation from French by Uday Sankar Barma

Price Rs. 250.00 (EUR 4)



প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪২৫। এপ্রিল ২০১৮

প্রচ্ছদ
আরাত্রিকা চৌধুরী

প্রকাশক
সঞ্জয় সামন্ত
এবং মুশায়েরা
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০৭৩
Email mushayera@gmail.com

ISBN 978-93-85119-99-6

মুদ্রক
প্রিন্টিং আর্ট
৩২এ, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

মূল্য : দুইশত পঞ্চাশ টাকা

অনুবাদকের উৎসর্গ

আমার পিতামহ
শিল্পী গোবিন্দ চন্দ্র সরকার (বর্মা)

ও

পিতৃব্য
পণ্ডিত নবীন চন্দ্র সরকারের (বর্মা) স্মৃতির উদ্দেশে

# অনুবাদকের কথা

আলবের কামু'র 'ল্য মিত্ দ্য সিজিফ্' শিক্ষিত সাধারণ বাঙালি সমাজে 'দ্য মিথ অব সিসিফাস' নামে পরিচিত। সুতরাং ওই নামেই বইটিকে প্রকাশ করতে হলো। অবশ্য-ই 'সিসিফাসের কিংবদন্তী' নামে প্রকাশ করতে পারলে ভালো লাগত। কিন্তু তাতে এ অনুবাদগ্রন্থটিকে কামু'র মূল বইটির সঙ্গে সাধারণ পাঠকেরা অভিন্ন প্রতিপন্ন করতে পারবেন কি না—সে সংশয় ছিল। গ্রন্থমুদ্রণের এই দুর্মূল্যের বাজারে বলাই বাহুল্য কোনওরকম ঝুঁকি আমরা নিতে চাইনি। যাই হোক, এই বইটির বঙ্গানুবাদের একটি মূল্য যদি নিহিত থাকে বইটির আসামান্য সাহিত্যিক ও দার্শনিক আবেদনে, তো অন্য গুরুত্বটি রয়েছে আত্মহত্যা-উন্মুখ ব্যক্তিদের একটি কাউন্সেলিঙ-গ্রন্থ হিসেবে। সবাই জানেন, কামু'র 'লেত্রঁজে' (*আউটসাইডার* নামেই বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কাছে সমধিক পরিচিত) উপন্যাসটির চেয়ে এ বইটি কোনও অংশেই কম আকর্ষণীয় নয়। কিন্তু বইটি মূলত দর্শননির্ভর হওয়ায় ভাষান্তরের সময়ে পরিভাষাগত সমস্যার মুখে পড়েছি। ফলে, বাংলা ভাষার দর্শনগ্রন্থগুলি থেকে সাহায্য নিতে হয়েছে। প্রয়োজনে কিছু কিছু বাংলা পরিভাষার পাশে ফরাসি ও ইংরেজি প্রতিশব্দটি লিখে দিয়েছি। গ্রন্থোক্ত ইংরেজ, রুশ, জার্মান, স্প্যানিশ সাহিত্যিক, দার্শনিক বা নাটক-উপন্যাসের চরিত্রাদির নামের প্রতিবর্ণীকরণে ফরাসি উচ্চারণরীতি এড়িয়ে গিয়েছি (যেমন স্তাভ্রোজিন-কে স্তাভ্রোজ্যাঁ করিনি)। ফরাসি নামের প্রতিবর্ণীকরণেও বাংলা ভাষার উপরে নিপীড়ণ চালাইনি। তাই আলবের কামুকে অর্থাৎ *আলব্যের কাম্যু* করিনি (করলে আলব্বের কাম্মু উচ্চারণ করতে হতো)। মূল ফরাসি গ্রন্থটিতে একত্রিশটি টীকা ছিল। কিন্তু সাধারণ পাঠকের সুবিধার্থে আমি আরও একত্রিশটি সংক্ষিপ্ত টীকা সন্নিবেশিত করেছি। 'কথাসূত্র' অংশে বইটির পটভূমিকা ও বিষয়বস্তুর চুম্বক তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, যাতে বিতর্কমুখ্য গ্রন্থটিতে প্রবেশকালে পাঠক অন্তত প্রাথমিক দিশাটুকু পেতে পারেন। তবে কোনওভাবেই সাবলীলতার অজুহাতে কামু'র নৈয়ায়িক ভাষাকাঠামোটিকে বিনষ্ট করি নি। তাই পাঠককে খানিকটা ধৈর্যশীল হওয়ার অনুরোধ করছি। বাংলা ভাষায় যেভাবে সম্ভ্রমাত্মক ও তুম্যর্থক সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের যথেচ্ছ প্রয়োগ ঘটে তা অনুবাদের ক্ষেত্রে অনেকসময় বিপত্তির কারণ হয়ে ওঠে। তাই আমি এখানে কেবলমাত্র উদ্দিষ্ট পাঠক বা নির্দিষ্ট নাট্যকার, গল্পকারদের ক্ষেত্রেই সম্ভ্রমাত্মক সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছি

(যেমন, সর্বনামের ক্ষেত্রে *আপনি, তিনি, তাঁরা* এবং ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে করেছেন, বলেছেন ইত্যাদি)। অন্যত্র সাধারণভাবে লেখক বা শিল্পীর ক্ষেত্রে এবং সাহিত্য-শিল্পের কল্পিত চরিত্রাদির ক্ষেত্রে তুম্যর্থক *সে, তারা* সর্বনাম ও *করেছে, বলেছে* ইত্যাদি ক্রিয়াপদের ব্যবহার করেছি।

প্যারিসের বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা গালিমার কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটি শর্তসাপেক্ষে অনুবাদের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন। কল্যাণীয়া আরাত্রিকা চৌধুরী চমৎকার একখানি প্রচ্ছদচিত্র এঁকে দিয়েছে, তার কল্যাণ কামনা করি। বিভিন্ন বইপত্র ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছে বাসন্তী দেবী কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক শ্রী মিতঋক বর্মা—এ কথাও উল্লেখনীয়। 'এবং মুশায়েরা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী সুবল সামন্ত মহোদয়ের নিরন্তর তাগাদা ছাড়া যে এ কাজে কখনই হাত দিতুম না, অকপটেই তা কবুল করছি। এবারে আখেরে কী দাঁড়ালো 'তদ্ উদারা সুধিয়ো বিচারয়ন্তু'।

বিনীত
উদয়শংকর বর্মা

# কথাসূত্র

## পটভূমি

আলবের কামু'র সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ *লেত্রঁজে*-এর প্রতিস্পর্ধী যদি তাঁরই কোনও গ্রন্থ থেকে থাকে, তবে তা *ল্য মিত্ দ্য সিজিফ্*। গ্রন্থ দুটি একই সঙ্গে পাশাপাশি রচিত হয়েছিল এবং উভয়ের প্রকাশ-কালের ব্যবধানও ছিল খুবই কম। *লেত্রঁজে* বেরিয়েছিল ১৯৪২-এর ১৯শে মে, আর *ল্য মিত্ দ্য সিজিফ্* অক্টোবরে। ফ্রান্সের জাতীয় বিপর্যয় ও কামু'র ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের সম্মিলন যেন এই রচনা দুটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ আবহে একদিকে নাৎসী জার্মানের হাতে ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয়, অন্যদিকে যক্ষ্মা রোগে কামু'র প্রাণসংশয়কর অবস্থা। জীবনের অর্থহীনতা আর মৃত্যুর অমোঘতা এই বই দুটির মূল উপজীব্য[১]। তবে প্রথমটি উপন্যাস আর দ্বিতীয়টি প্রবন্ধ সংকলন। গাস্তঁ গালিমার যখন 'লেত্রঁজে' প্রকাশে সম্মতি জানিয়ে কামুকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তখন তার জবাবী চিঠিতে কামু লিখেছিলেন, "আপনার শর্তগুলি আমি মেনে নিচ্ছি। আমার অন্য বই "অ্যাবসার্ডবিষয়ক প্রবন্ধ", যার কথা মালরো আপনাকে বলেছেন, সেটিকে অতি সহজে আমার উপন্যাসটি থেকে আলাদা করা যাবে না। ফলে, সেটিকেও আমি একসঙ্গেই প্রকাশ করার পরামর্শ দেব, অন্তত বেশ কাছাকাছি সময়ের মধ্যে তো বটেই (J'accepte vos conditions. Quant à mes autres œuvres, Malraux a dû vous parler d'un "Essai sur l'Absurdes" qui ne se détaché pas facilement de roman et dont jaurais souhaité publication sinon simultanée, du moins très rapprochés)।"[২]

## আখ্যান বস্তু

*ল্য মিত্ দ্য সিজিফ্* গ্রন্থটি মূলত চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত

**১. অ্যাবসার্ড যুক্তিবিচার পদ্ধতি** (*এর আবার চারটি উপবিভাগ আছে ক. অ্যাবসার্ড*

---

১. In both books, as the text makes clear, the idea that life has no meaning is linked to the idea of the inevitability of death.—Thody, Philip. "Technique, Codes and Ambiguity" *Albert Camus*. London Macmillan. 1993. p. 29.

২. www.gallimard. fr/Footer/Ressources/Entretiens-et-documents/Histoire-d-un-livre-L-Etranger-d-Albert-Camus/(source)/138776

Date [illegible] December 2017 Time 13:00 IST

*ও আত্মহত্যা খ. অ্যাবসার্ড পাঁচিলগুলো গ. দার্শনিক আত্মহত্যা এবং ঘ. অ্যাবসার্ড স্বাধীনতা*)।

২. **অ্যাবসার্ড মানুষ** (*এর আছে তিনটি উপবিভাগ। যথা, ক. ডন জুয়ানবাদ খ. নাটক এবং গ. জয়*)।

৩. **অ্যাবসার্ড সৃষ্টি** (*এটিরও তিনটি উপবিভাগ আছে ক. দর্শন ও উপন্যাস খ. কিরিলভ এবং গ. ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি (বা যে সৃষ্টি আগামীতে থাকবে না*)।

৪. **সিসিফাসের কিংবদন্তী**। এছাড়া রয়েছে একটি **পরিশিষ্ট : কাফকার রচনায় আশা ও অ্যাবসার্ড**।

## ১. অ্যাবসার্ড যুক্তিবিচার পদ্ধতি

**ক. অ্যাবসার্ড ও আত্মহত্যা** উপবিভাগটি শুরুই হয়েছে এই ঘোষণা দিয়ে যে, গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সমস্যার একমাত্র সমাধান আত্মহত্যা। কামু এখানে জোর দিয়ে বলেছেন যে, তাঁর লক্ষ্য অ্যাবসার্ডের বর্ণনা দেওয়া, বৌদ্ধিক ব্যাধির বর্ণনা দেওয়া। বৈপরীত্যে ভরা সমাধানহীন অসঙ্গতির পৃথিবীটিকে প্রাঞ্জলভাবে বোঝার জন্যে মানুষের আকৃতি ও লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা দিয়ে এই বৌদ্ধিক ব্যাধিকে উপলব্ধি করা সম্ভব। কিন্তু, অসম্বদ্ধতাপূর্ণ এই পৃথিবীতে মানুষকে নানা উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সেই উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই আত্মহত্যার বাসনা দ্বারা তাড়িত হয়ে থাকে। সুতরাং আত্মহত্যা আধুনিক জীবনে কোনও অভাবনীয় ঘটনা নয়। কামু এই আত্মহত্যার প্রসঙ্গ দিয়েই তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন। কিন্তু আত্মহত্যা জীবনের উলট-যাত্রা, জীবনবিমুখতা। ফলে, কামু আত্মহত্যাকে সমর্থন করেন নি। কিন্তু জীবনের অ্যাবসার্ডিটিকে বিশদ করতে ও তার আবহের মধ্যেই জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে আত্মহত্যার একটা রূপ নির্মাণ করেছেন, আত্মহত্যার জটিলতা ও তীব্রতাকে বার বার আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছেন।

**খ. অ্যাবসার্ড পাঁচিলগুলো** উপবিভাগে কামু জানিয়েছেন যে, জীবন-বিবিক্ত কোনও দর্শনে তিনি উৎসাহী নন। বলেছেন "আমাকে যা আগ্রহী করে, তা অ্যাবসার্ড আবিষ্কারমালা নয়, তার পরিণামসমূহ" (৪১)* এই আবিষ্কারগুলো নিত্যদিনের জীবনের মধ্যেই লভ্য—"এই পৃথিবীটাকে আমি স্পর্শ করি এবং একইভাবে বিচার করি যে, এটা আছে। আমার জ্ঞানের সীমা ওই পর্যন্তই, বাকিটা তৈরি করা।" (৪৩) কিন্তু এই পৃথিবীটা জীবনকে কোনও অর্থ বা সুবোধ্যতা কোনোটাই দান করে না। কামু খেদের সঙ্গে বলেন, "নিজের কাছে চিরদিনই এক অপরিচিতের মতো রয়ে যাব

---

* বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো এ বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যার নির্দেশক।

আমি।” (৪৩) অপরিচয়তার এই আবহে কামু সারাক্ষণ অ্যাবসার্ডের বর্ণনা দিয়ে গেছেন—“কিন্তু অ্যাবসার্ড হচ্ছে এই যুক্তিহীনতা এবং সুবোধ্যতার জন্যে মানুষের আদিম আকাঙ্ক্ষার একটা পারস্পরিক সংঘাত, যার আহ্বান তার হৃদয়ে অনুরণিত হয়।” (৪৫) এখানে কামু সেই পাঁচিলগুলোর কথা বলছেন অ্যাবসার্ড মুহূর্তে মানুষকে যেগুলি ঘিরে রাখে। পাঁচিলের ভেতর থেকেই মানুষটিকে জীবনের অর্থ খোঁজার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়।

**গ. দার্শনিক আত্মহত্যা** উপবিভাগটিতে কামু দেখিয়েছেন যে, অ্যাবসার্ডিটির মধ্যে বাস করে মানুষ শুধু দৈহিক আত্মহত্যা নয়, দার্শনিক আত্মহত্যাও ঘটিয়ে ফেলে। এখানে কিয়েৰ্কেগার্দের কিছুটা সমালোচনা করেছেন তিনি। তাঁর দর্শনকে অভিহিত করেছেন দার্শনিক আত্মহত্যা নামে। কারণ, তা পালিয়ে যাওয়ার কথা বলে। কামু'র মতে, কিয়েৰ্কেগার্দ— অভিজ্ঞতার মধ্যে নতুন কিছুই খুঁজে পান নি এবং নিজের বন্ধ্যাত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ থেকে কোনও সন্তোষজনক সূত্র মেলে নি। কিয়েৰ্কেগার্দ নিজেই জানিয়েছেন যে, যুক্তিহীনের মতো আচমকা দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি অতীন্দ্রিয়ের কথা বলেছেন এবং জীবনের অতিমানবিক তাৎপর্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন। (৫৪) যে অস্তিত্ব অন্ধবিশ্বাসের আনুষ্ঠানিক আচারের মধ্যে সব কিছুর ব্যাখ্যা খোঁজে, “সাধারণ এবং বিশেষের অচিন্তনীয় ঐক্যের” বিশ্লেষণ করে, সে সম্পর্কে কামু স্পষ্টভাবেই নিজের অবস্থান ব্যক্ত করেছেন। কিয়েৰ্কেগার্দ প্রমুখের সিদ্ধান্তকে যুক্তিপরম্পরাবাহিত মনে করেন নি। তাকে 'অতীন্দ্রিয়তা (transcendance)' বলেছেন। জীবনে এ রকম কোনও অতীন্দ্রিয় সত্তার হস্তক্ষেপের জন্যে কিয়েৰ্কেগার্দের অপেক্ষমানতাকেও ভর্ৎসনা করে কামু বলেছেন,—“হয়তবা আমার এ ধারণাটি আরও স্পষ্ট হবে, যদি আমি এই মর্মান্তিক মন্তব্যটি করি—ঈশ্বরবিহীন অ্যাবসার্ড পাপ।” (৬০) অন্য অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদেরও ছাড় দেন নি তিনি। বলেছেন—“অস্তিত্ববাদী দর্শনের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে আমি দেখেছি যে, সবাই পালিয়ে যাওয়ার কথাই বলে।” (৫৪) অ্যাবসার্ডিটির অসহনীয়তা সত্ত্বেও পলায়নপরায়ণতায় নয়, জীবনে সম্পৃক্ত থাকার কথাই তিনি বলেছেন। এখানে এডমণ্ড হুসের্লকে ভিত্তি করে অবভাসবিদ্যাকেও (phenomenology) টেনে এনেছেন—“অবভাসবিদ্যা জগতের ব্যাখ্যানে অসম্মতিজ্ঞাপন করে, শুধুই বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে চায়। স্রেফ সত্য ছাড়া আর কোনও সত্য নেই—এই প্রাথমিক দৃপ্ত ঘোষণার মাধ্যমে তা দৃঢ়ভাবে অ্যাবসার্ডকে প্রতিষ্ঠা করে।” (৬২) হুসের্লের মধ্যে তিনি সদর্থক কিছু খুঁজে পান নি। অবভাসিক পদ্ধতির উপরে বেশি গুরুত্ব আরোপনকে কামুর মনে হয়েছে—“সমস্ত কিছুই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত—কথাটি এই কথাটির অনুরূপ যে, সমস্ত কিছুই সমতুল।” (৬৩)

**ঘ. অ্যাবসার্ড স্বাধীনতা** উপবিভাগে কামু আবারও জানিয়ে দিয়েছেন যে, অ্যাসার্ডিটির ধারণাটি পরিব্যাপ্তিপ্রবণ—"আমাকে ঘিরে থাকা চারপাশের এই পৃথিবীর যা কিছু আমাকে আহত কিংবা উদ্বেল করে, তাদের সবগুলিই আমি নস্যাৎ করতে পারি, কেবল এই বিশৃঙ্খলা, এই অদম্য সম্ভাবনা এবং নৈরাজ্যসঞ্জাত এই পবিত্র সাদৃশ্যটিকে বাদ দিয়ে।" (৬৮) অ্যাবসার্ডিটিকে স্বীকৃতি ও গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ অর্থহীনতা সত্ত্বেও জীবনকে পরিপূর্ণভাবে মেনেই নেয়—"আমি জানিনা, এই পৃথিবীটার কোনও মানে আছে কিনা, যা কিনা নিজেকেও ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু, এটুকু বুঝি যে, ওই মানেটা আমি জানি না এবং এখনই আমার পক্ষে তা জানাও সম্ভব নয়। নিজের বৃত্তের বাইরের কোনও একটা মানে-তেই বা কী প্রয়োজন আমার? মানবিক বিষয়গুলির মধ্যেই শুধু তাকে উপলব্ধি করতে পারি আমি।... অন্যদিকে এটা এখন স্পষ্ট যে, অর্থ না থাকলেই আরও ভালভাবে বেঁচে থাকা যাবে।" (৬৮ এবং ৭০) তবে এই স্বাধীনতাকে বৃহত্তর জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological) প্রেক্ষায় দেখেন নি তিনি—"মানুষ স্বাধীন কি স্বাধীন নয়, এই জ্ঞানটির প্রতি আমার কোনও আগ্রহ নেই। আমি আমার নিজের স্বাধীনতাটুকুকেই শুধু উপভোগ করতে পারি।" (৭২)

**২. অ্যাবসার্ড মানুষ**

**ক. ডন জুয়ানবাদ** উপবিভাগে ডন জুয়ান নিয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে। তবে বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় অ্যাবসার্ড মানুষ-এর তিনটি উপবিভাগ জুড়েই ডন জুয়ান চরিত্রটির প্রতি কামু'র অফুরন্ত মুগ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে— "তাকে দেখে সেই শিল্পীদের কথা মনে পড়ে, যারা নিজেদের সীমাবদ্ধতা জানে ও কখনই সেই সীমাকে অতিক্রম করে না এবং ওই বিপজ্জনক বিরতিপর্বে যখন তারা আধিদৈবিক অবস্থান নেয়, সে সময় মহৎ শিল্পীদের চমৎকার সহজাত দক্ষতাকে উপভোগ করে।" (৮৫) ডন জুয়ানের সময়জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর। কামু লিখেছেন— "অ্যাবসার্ড মানুষ সময়-বিবিক্ত নয়। ডন জুয়ান আর রমণী "জোগাড়"-এর কথা ভাবে না। সে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণের (নির্দিষ্ট সংখ্যক নারীর সাহচর্য লাভ) সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সম্ভাবনাগুলিকেও নিঃশেষ করে ফেলেছে। "জোগাড় করা" মানে হচ্ছে নিজের অতিবাহিত অতীত জীবনের সমতা অর্জন। কিন্তু অনুতাপকে, আশারই ভিন্ন এই রূপটিকে সে প্রত্যাখ্যান করেছে।" (৮৭) ডন জুয়ান নিশ্চল নয়। সক্রিয়ভাবে জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলে সে। সে সচেতন যে, প্রেমিক ছাড়া অন্য কিছু কিছু সে হতে পারবে না। এটাকে কাটিয়ে উঠতেও চায় না সে। অতীতের প্রেম-সফলতা নয়, বর্তমানের প্রেম সম্পর্কগুলির মধ্যে থাকতেই সে পছন্দ করে।

**খ. নাটক** উপবিভাগে কামু জানিয়েছেন যে, কোনও একটি চরিত্রকে সর্বাঙ্গীনভাবে

ফুটিয়ে তুলতে অভিনেতার অ্যাবসার্ড মন অভিনয়ের প্রতি মুগ্ধতা সরিয়ে রেখে অভিনয়ের ভেতরে ঢুকতে চায়। কারণ, নাটক নিজেকে কেন্দ্রিভূত করে বতর্মান মুহূর্তটির উপরেই(৯১) এবং "—আমাদের যাবতীয় পূর্বসংস্কারগুলিকে পরম নিশ্চিতির দিকে চালিত করে অর্থাৎ তাৎক্ষণিকের দিকে।" (৯২) বিচিত্র ধরনের জীবনকে তুলে ধরা বা তাৎক্ষণিককে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য খ্রিস্টান চার্চগুলো অভিনেতাদের নির্বাসিত করেছে। তাই কামুর মনে হয়েছে যে, অভিনয়ের পেশা বেছে নেওয়া নরক-গমনের সমতুল। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি কামুর বিরূপতা প্রকাশ পেয়েছে এখানে। বিশেষ করে খ্রিস্টান চার্চগুলোর প্রতি।

গ. জয় উপবিভাগে কামু বিজয়ীর মুখে নানা ধরনের শব্দ প্রয়োগ করেছেন। কখনও লিখেছেন—"ওদের সম্পর্কে সাবধান, যারা বলে "বিষয়টাকে খুব ভালোভাবে এ জন্যেই জেনে নি-ই, যাতে তাকে ভালোভাবে প্রকাশ করা যায়।' ফলে, ওরা যদি সেটা না করতে পারে, সেটা ঘটে তাদের অজ্ঞতার জন্যে কিংবা অলসতাহেতু বিষয়ের খোলসের বাইরেই আটকে যাওয়ায়।" (৯৭) কখনওবা লিখেছেন—"কিন্তু কোনও বিশেষ মতবাদ বা শাশ্বতকে নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। যে সত্য আমার নাগালের মধ্যে, তাকে তো হাত দিয়েই ছোঁয়া যায়। নিজেকে তা থেকে আলাদা করতে পারি না।" (১০০-১০১)

অ্যাবসার্ড মানুষ নামের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ডন জুয়ান, অভিনেতা ও বিজয়ীকে কামু অ্যাবসার্ড মানুষেরই বিভিন্ন রূপ হিসেবে তুলে ধরেছেন। এই রূপগুলির কোনওটির মধ্যেই কোনও চিরন্তন মূল্যবোধ বা ধারণার প্রকাশ নেই। যদিও নৈরাশ্যের উপস্থিতি আছে। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস, নৈরাশ্যে অভিভূত না হয়েও অ্যাবসার্ডের মধ্যে বেঁচে থাকা যায়।

### ৩. অ্যাবসার্ড সৃষ্টি

ক. দর্শন ও উপন্যাস উপবিভাগে অ্যাবসার্ড সৃষ্টি নিয়ে কামু আলোচনা করেছেন। সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে স্রষ্টার দূরত্ব ও বিযুক্তির তত্ত্বটিকে স্বীকার করেন নি তিনি। সুবোধ্যতাকে নস্যাৎ করে বলেছেন, যদি জগৎটা সুবোধ্য হতো, তবে আর্টের অস্তিত্ব থাকত না। লিখনক্রিয়া শুরু হয় তখনই, অস্তিত্ব ও যুক্তিবিচার পদ্ধতির মধ্যে সুবিশাল দুস্তরতাটিকে যখন লেখক আবিষ্কার করেন। মহৎ ঔপন্যাসিক বলতে তিনি দার্শনিক ঔপন্যাসিকদেরই বুঝিয়েছেন। বিশেষত দস্তেয়ভস্কি এবং কাফকাকে।

খ. কিরিলভ উপবিভাগটিতে দস্তেয়ভস্কির 'ভূতাবিষ্টেরা' (Les possédes) উপন্যাসের মূল চরিত্র কিরিলভকে নিয়ে আলোচনা করেছেন কামু। কিরিলভকে তিনি

বলেছেন 'যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আত্মহত্যার' প্রবক্তা। দস্তেয়ভস্কির এ উপন্যাসটির থিমের ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন—"ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকলে, সবই ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করে এবং আমরা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে করতে পারি না কিছুই। ঈশ্বর না থাকলে সবই নির্ভর করে আমাদের উপরে। কিরিলভের কাছে নীৎশের মতোই ঈশ্বরকে হত্যা করার তাৎপর্য ঈশ্বরে পরিণত হওয়া। এই পৃথিবীতে অনন্ত জীবনকে অনুভব করার কথা গোস্‌পেলেও আছে।" (১১৬-১১৭) কিরিলভ বিশ্বাস করে যে, তার মৃত্যু এক ধরনের স্বাধীনতার অর্জন। কিন্তু তা এক ঈশ্বরবিহীন জগতে। সুতরাং দস্তেয়ভস্কির যে আত্মহত্যার থিম, তা অ্যাবসার্ড। দস্তেয়ভস্কির ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি কামু'র সমর্থন নেই। কিন্তু তাঁর অ্যাবসার্ড জীবনবীক্ষার প্রতি আস্থা আছে।

**গ. ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি (বা যে সৃষ্টি আগামীতে থাকবে না)** শুরু হয়েছে এভাবে—'যাইহোক, এখানে পৌঁছে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, চিরকাল আশাকে পাশ কাটানো সম্ভব নয় এবং যারা তার থেকে মুক্ত থাকতে চায়, তাদেরকেও আশা অবরুদ্ধ করে ফেলতে পারে।'(১২১) অ্যাবসার্ডিটির যুগের লক্ষ্যটা হলো কোনও কাজকে একটা নির্দিষ্ট সীমার ভেতর আবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত রাখা। এভাবেই অনেক ব্যতিক্রমী শিল্পের সৃষ্টি হয়, যেগুলি অস্তিত্বের বৈচিত্র্যের প্রতিনিধিত্ব করে। মানুষের সৃজনশীলতার একমাত্র সীমাবদ্ধতা হলো মৃত্যু। মানুষের একমাত্র ভবিতব্যের বাইরে যা কিছু আনন্দ বা সুখ তাই মুক্তি। কামু বিশ্বাস করতেন যে, আমাদের যাপিত জীবনের বাইরের (অর্থাৎ পরলোকের জীবনে) জীবনের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা অর্থহীন। কারণ, তাতে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এই পার্থিব, ক্ষণস্থায়ী জীবন অবহেলিত হয়। কামু'র সিদ্ধান্ত এখানে সুস্পষ্ট "মানুষকে যা মুগ্ধ ও বিচারশক্তিহীন করে তোলে, তা সেই পবিত্র ঐশী উপকথাটি নয়, বরং মর্ত্য মুখচ্ছবি, ভঙ্গিমা এবং নাটক, যার মধ্যে এক দুরূহ প্রজ্ঞা এবং ক্ষণস্থায়ী একটি আবেগ সংহত হয়েছে।" (১২৪)

### ৪. সিসিফাসের কিংবদন্তী

**সিসিফাসের কিংবদন্তী** শুধু এই চতুর্থ অধ্যায়টির নামই নয়, পুরো বইটিরই শীর্ষনাম। গ্রিক পুরানের চরিত্র সিসিফাসের মাধ্যমে জীবনের অসংখ্য বৈপরীত্য এবং অর্থহীনতাকে এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মানুষের অন্তহীন ব্যর্থ প্রয়াসের প্রতীক সিসিফাসের পাথর ঠেলা। কামু লিখেছেন, "দেবতারা সিসিফাসকে এই দণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন যে, তাকে পাহাড়ের চুড়োয় একটি পাথরের খণ্ডকে সারাক্ষণ তুলতে হবে, যখন সেটি নিজের ওজনে বার বার গড়িয়ে পড়বে নিচে। তাঁরা যুক্তিসম্মতভাবেই ভেবেছিলেন যে, নিষ্ফল আর নিরাশ শ্রমের থেকে বেশি ভয়াবহ আর কোনও শাস্তি নেই।" (১২৭) সিসিফাসের ভাগ্য অন্যের দ্বারা নির্ধারিত, কিন্তু

প্রতিকূলতার সামনে অর্থহীন জয়ের চেষ্টাটি তারই বেছে নেওয়া। এটি অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে তখনই যখন প্রবলতম প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সে তার অধ্যবসায় চালিয়ে যেতে পারবে। প্রতিটি মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয় নিয়ন্ত্রণহীন কোনও শক্তির দ্বারা, তবে তা ঈশ্বর নয়।

**পরিশিষ্ট কাফকার রচনায় আশা ও অ্যাবসার্ড**

কাফকার রচনায় আশা ও অ্যাবসার্ড শীর্ষক পরিশিষ্ট অংশে কাফকার রচনাকে কামু প্রতীক-রচনা হিসেবে গণ্য করেছেন। বলেছেন যে, কাফকার লেখার প্রতিটি অংশের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কেননা, যেকোনও প্রতীকই তার বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে ব্যঞ্জনাকে সুদূরপ্রসারী করে তোলে। কাফকার প্রতীকী লেখায় কামু অস্তিত্ববাদী দর্শনের ছায়া দেখতে পান, নৈতিকতার বিপ্রতীপ সত্যকে লক্ষ্য করেন। আশার আভাস পান। কেননা,—কাফকা যত শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা দেন, আশা ততই আগ্রাসী হয়ে ওঠে। কাফকার লেখায় মানুষ সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যে তার পারিপার্শ্বিক দুর্গতিকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে, তার থেকে বড় আশা এর কিছুই হতে পারে না বলে মনে করেন কামু। কামুর স্বীকারোক্তি পরিষ্কার—"আমি এও জানি যে, যা সর্বজনীন, তাকে আমি খুঁজছি না, খুঁজছি সত্যকে। এ দুয়ের সমাপতন নাও ঘটতে পারে" (১৪১)।

**অ্যাবসার্ডতত্ত্ব**

দর্শন ও সাহিত্যের আলোচনায় অ্যাবসার্ডের তত্ত্বটি এখন অতি-অপরিহার্য। সুতরাং সে প্রেক্ষিতে কামু'র দৃষ্টিকোণটিও বিচার্য। এ ক্ষেত্রে কিয়ের্কেগার্দ ও সার্ত্রের অ্যাবসার্ড ভাবনার প্রসঙ্গটি আসবেই। যদিও তাঁদের সঙ্গে কামু'র পার্থক্য প্রচুর। কারণ, বাকিদের মতো কামু অস্তিত্ববাদী নন। সার্ত্র বলেন যে, মানুষের অস্তিত্ব অ্যাবসার্ড, কারণ, তা আকস্মিক এবং অর্থহীন। মানুষের এই পরিস্থিতির পেছনে বাইরের কিছু দায়ী নয়। উল্টোদিকে কিয়ের্কেগার্দের অ্যাবসার্ড নিহিত রয়েছে খ্রিস্টান মূল্যবোধের ভেতরে, যা মানুষের পার্থিব অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধতা করে। কিয়ের্কেগার্দ বলেন, অ্যাবসার্ড কিংবা অ্যাবসার্ডের সংঘটন হয় ঈশ্বরবিশ্বাসে ভর করে। 'ল্য মিত্ দ্য সিজফ্'-এ কামু কিয়ের্কেগার্দের এই ধারণাকে সরাসরি 'দার্শনিক আত্মহত্যা' রূপে অভিহিত করেছেন। সার্ত্রের অ্যাবসার্ড-তত্ত্বটিকেও মানতে পারেন নি তিনি। সার্ত্রের '*বিবমিষা (La Nausée)*' উপন্যাসের আলোচনায় কামু লিখেছিলেন যে, জীবন দুর্ভাগ্যময় বলেই তা 'ট্র্যাজিক', সার্ত্রের এ ধারণা ঠিক নয়। বরং, 'ল্য মিত্ দ্য সিজফ্'-এ কামু মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, জীবনটা অ্যাবসার্ড—এই উপলব্ধি জীবনের সমাপ্তি নয়, প্রারম্ভ। মানুষের প্রয়োজন এবং পৃথিবীর অযৌক্তিক নৈঃশব্দ্যের সংঘাতেই অ্যাবসার্ডের উদ্ভব। ধর্ম ও দর্শন সেভাবে জগৎটাকে ব্যাখ্যা করেছে, মানুষ

সেভাবেই তাকে বোধগম্য করতে চায়। এই বোধগম্যতার মধ্যে মানুষ নিজের প্রয়োজনমাফিক একটা সম্পূর্ণতা খোঁজে। কিন্তু কামু'র মতে জগৎ কিংবা মানব-অস্তিত্ব কোনওটাই অ্যাবসার্ড নয়। বরং জগৎটা মানুষের বোধগম্যতাকে প্রতিহত করে বলেই অ্যাবসার্ড উদ্‌গত হয়। আমরা চাই জগৎটা কোনও একটা অর্থ প্রকাশ করুক, কিন্তু তা সে করে না। এই দ্বন্দ্বটাকে দেখার অর্থই হলো অ্যাবসার্ডকে দেখা। কামু বলেন, সত্যি যদি কোনও অ্যাবসার্ড থাকে, তবে তা আছে মানুষের ব্যক্তিক জগতে। অ্যাবসার্ডের সঙ্গে ব্যক্তির যে দ্বৈরথ তা থেকে মানুষের নৈতিক সচেতনতা জেগে ওঠে। জগতের কাছে মানুষের প্রত্যাশা এবং মানুষের প্রতি জগতের নিস্পৃহতা এই সম্পর্কসূত্রেও অ্যাবসার্ড জন্ম নিতে পারে। কামু কিন্তু জগতের এই নৈঃশব্দ্যকে সমর্থনই করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে জগৎটাকে প্রাঞ্জলতা ও পরিচয়তার মধ্যে নিয়ে আসার মানুষের ঐকান্তিক প্রয়াস আসলেই জগৎটাকে মানুষের মাপে নামিয়ে আনার সামিল। এর চাইতে জগৎকে নিজের ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা ভালো। তিনি বলেন, আমার হৃদয়কে অনুভব করতে পারি বলেই বলি যে, তা আছে। একইভাবে যেহেতু পৃথিবীটাকে স্পর্শ করতে পারি, তাই সেটাও আছে। এটুকুই জ্ঞান, বাকিটা নির্মাণ। কামু জোর দিয়েই বলেন যে, তাঁর ব্যক্তি-অস্তিত্ব এবং বস্তুজগৎটির বাইরের (বিজ্ঞান, যুক্তিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র বা মনোবিজ্ঞানে যে সমস্ত আবিষ্কার ও অনুমান আছে) জ্ঞানগুলো তাঁর আয়ত্বের মধ্যে নেই। কামুর এই মনোভঙ্গি অবশ্যই নিহিলিজমের কোনও প্রস্তাবনা নয়, প্রচলিত মূল্যবোধের কোনও প্রতিবাদও নয়। কামু বরং এখানে দেকার্তের 'প্রণালিবদ্ধ সংশয় (systematic doubt)'-এর সঙ্গে নিজের কিছুটা সাযুজ্য লক্ষ্য করেছেন। তিনি আমাদের বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি পথই খুঁজেছেন, মত নয়। অবলম্বন করেছেন সংশয়কে। সুতরাং সত্তাতাত্ত্বিক (ontological) জিজ্ঞাসায় প্রাথমিকভাবে কামু জ্ঞানতত্ত্বের (epistemology) উপযোগিতাকেই চিহ্নিত করেছেন, যে জ্ঞান বাহ্য জগৎ থেকেই অর্জিত হতে পারে। এই অবস্থান থেকে কামু ধীরে ধীরে সর্বাতিশায়ী সত্য ও মূল্যবোধগুলির কথা বলেছেন। 'নিষ্ঠুর গণিত'কে এড়িয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন।

*ল্য মিত্ দ্য সিজিফ্*-এ প্রাথমিকভাবে কামু অ্যাবসার্ড সম্পর্কে অন্য দার্শনিকদের মতামতের পর্যালোচনাও করেছেন। তাঁরা যে অ্যাবসার্ডকে কাটিয়ে উঠতে চেয়েছেন, কামু সেটাকে সমর্থন করেন নি। কিয়ের্কেগার্দ যে পৃথিবীটাকে মানুষের বাসনা অনুযায়ী সাদৃশ্য ও প্রাঞ্জলতার মধ্যে সীমিত করতে চাইছেন, তা-ও তাঁর পছন্দ হয় নি। কিয়ের্কেগার্দ অ্যাবসার্ডকে ভিত্তি করে অন্য একটা জগতের মানদণ্ড খুঁজে নেন, কিন্তু কামু'র কাছে এই পৃথিবীর অভিজ্ঞতার তলানি ছাড়া অ্যাবসার্ড ভিন্ন কিছু নয়। কিয়ের্কেগার্দকে অ্যাবসার্ড আলোকিত করে, ঈশ্বর ছাড়া তাঁর কাছেই সবই শূন্য এবং উদ্বেগের বিষয়। পক্ষান্তরে, কামু মানবিক উদ্বেগকে গোপন করেন। তাঁর কাছে

অ্যাবসার্ড সচেতন মানুষের অধিবিদ্যক অবস্থা মাত্র। একইভাবে হুসের্লের 'অভিপ্রায়কিতার তত্ত্বকে (concept of intentionality)' স্বীকার করলেও তাঁর 'অতীন্দ্রিয়তা'র ভাবনাকে মানেন নি কামু। কামু'র অভিনবত্ব এই যে, তিনি অ্যাবসার্ডকে জাগিয়ে রাখতে চেয়েছেন, তাকে মোকাবিলা করতে চেয়েছেন। দার্শনিক আত্মহত্যার মাধ্যমে অ্যাবসার্ডকে যেমন চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেন নি, তেমনই দৈহিক আত্মহত্যার মাধ্যমে অ্যাবসার্ডকে ধ্বংস করতেও চান নি।

### উপসংহার

বস্তুত *ল্য মিত্ দ্য সিজিফ্*-এর কামু'র অজ্ঞেয়তাবাদের সঙ্গে শুধু ধর্ম, ঈশ্বর এবং দর্শন সম্পৃক্ত হয় নি, প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে তাঁর রাজনৈতিক চেতনাও। ফলে, তাঁর অ্যাবসার্ড-ভাবনা এক দশক অতিক্রম করার আগেই রাজনৈতিক বিদ্রোহের দিকে মোড় নিয়েছে। কামু'র 'L'HOMME RÉVOLTÉ (*লোম রেভোলতে বা বিদ্রোহী মানুষ*) তারই ফলশ্রুতি (*ল্য মিত্ দ্য সিজিফ্* প্রকাশিত হয় ১৯৪২-এ আর *লোম রেভোলতে* ১৯৫১'য়)। ডেভিড ক্যারোল যথার্থই বলেছেন যে, একচ্ছত্রবাদের (totalitarianism) বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধের নান্দনিক-দার্শনিক ভিত্তিভূমি রচনার ক্ষেত্রে *ল্য মিত্ দ্য সিজিফ্*-এর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। কামু'র যুদ্ধ-সাংবাদিকতা ও যুদ্ধোত্তর কালে লেখা প্রবন্ধগুলির অনেক ভাবনার বীজই এই বইটির মধ্যে রয়েছে।[৩]

একালে *ল্য মিত্ দ্য সিজিফ্*-কে উত্তর মার্কসবাদী বই হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যদিও বইটিতে কোথাও মার্কসবাদ বা কম্যুনিজমের উল্লেখ নেই। কিন্তু বইয়ের তত্ত্বের মধ্যে তার প্রভাব আছে বলেই মনে করেছেন রোল্যাণ্ড আরোনসন।[৪] আসলে সিসিফাসের লড়াইটা একেবারেই ব্যক্তিগত এবং ট্র্যাজিক বা মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। তবে কিছুটা সাদৃশ্য তো আছেও। কামু লিখেছেন, "একালের

---

৩. "*Le Mythe de Sisyphe* could be considered to lay the aesthetic-philosophical ground work for the most explicitly political resistance to totalitarianism which will characterise Camu's war journalism and post-war essays."—Carroll. David, Rethinking the Absurd *Le Mythe de Sisyphe* p. 63.

৪. দ্রষ্টব্য "Marxism's claims. Camus's absurdism replied that none of our labors can solve the tragedy of death or give sense to the world. There is no direct mention of Marxism or Communism in *The Myth of Sisyphus*, but the critique is everywhere implied...(The text) was therefore...post-Marxist"—Roland Aronson, *Camus and Sartre* (Chicago and London, University of Chicago Press, 2004), p. 73

শ্রমিকরাও প্রতিদিন একই কাজ করে এবং তাদের জীবনও কম অ্যাবসার্ড নয়। কিন্তু তা কদাচিৎ ট্র্যাজিক হয়ে ওঠে, যখন তারা সচেতন হয়ে ওঠে। দেবতাকুলের সর্বহারা সিসিফাস ক্ষমতাহীন এবং বিদ্রোহী।"(১২৯) প্রায় মার্কসের ভঙ্গিতেই বলেছেন কামুও—"এমন কোনও নিয়তির অস্তিত্ব নেই, যাকে অবজ্ঞার দ্বারা জয় করা যায় না।"(১২৯)

অতএব *ল্য মিত্ দ্য সিজিফ্*-এর দর্শন যাই হোক (অ্যাবসার্ড অথবা মার্কসীয় তথা উত্তর মার্কসীয়), বইটির অভিমুখ যে খুবই সদর্থক তাতে সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে মূল বইয়ের শেষ পংক্তি দুটি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য—"শুধুমাত্র শৃঙ্গাভিলাষী লড়াইটি-ই মানুষের অন্তরকে ভরিয়ে তুলতে যথেষ্ট। সিসিফাসকে সুখী বলেই গণ্য করতে হবে।"(১৩০)

১লা জানুয়ারি, ২০১৮ — উদয়শংকর বর্মা

সায়ন্তিকা আবাসন, কলকাতা-৩০

ল্য মিত্ দ্য সিজিফ্-এর প্রথম ইংরেজি সংস্করণ উপলক্ষে

# আলবের কামু রচিত ভূমিকা

আমার কাছে 'ল্য মিত্ দ্য সিজিফ্' সেই ভাবনাটির সূচক-বিন্দু, যে ভাবনাটিকে আমাকে পরবর্তী 'দ্য রেবেল্' গ্রন্থ অব্দি অনুবর্তন করতে হয়েছিল। এই বইয়ে আমার লক্ষ্য আত্মহত্যার সমস্যাটির নির্ধারণ, আর 'দ্য রেবেল্'-এ ছিল খুনের সমস্যাটির নিষ্পত্তি। সাময়িকভাবে সমকালীন ইউরোপে যে বাহ্যিক মূল্যবোধগুলিকে অনুপস্থিত বা বিকৃত লক্ষ্য করা গেছে, প্রাগুক্ত প্রসঙ্গ দুটির কোনোটিতেই তাদের সাহায্য নেওয়া হয় নি। 'ল্য মিত্ দ্য সিজিফ্'-এর মূল বিষয়টি এরকম জীবনের কোনও মানে আছে কি না, তা নিয়ে উৎসুকতা স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয়; সুতরাং, আত্মহত্যার সমস্যাটির সরাসরি সমাধানই (মোকাবিলা) যুক্তিসঙ্গত। সমাধানটি নিহিত রয়েছে একটি কূটাভাসের (Paradoxe) অভ্যন্তরে এবং তার বহিরঙ্গে। সেটা এরকম যদি কেউ ঈশ্বরে না-ও বিশ্বাস করে, তথাপি আত্মহত্যা অযৌক্তিক। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৪০-এ, ফ্রান্স ও ইউরোপের বিপর্যয়কালে রচিত আমার এ বই স্পষ্ট করে দেয় যে, নিহিলিজমের ভেতরে থেকেও নিহিলিজমকে কাটিয়ে ওঠার পথ খোঁজা যেতে পারে। এতকাল আমি যত বই লিখেছি, এই লক্ষ্য সামনে রেখেই এগিয়েছি। 'ল্য মিত্ দ্য সিজিফ্' নৈতিক সমস্যার উপস্থাপক হলেও আমার কাছে তা মূলত মরুভূমির বুকেও বেঁচে থাকা ও সৃজনশীলতার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার একটি প্রাঞ্জল আমন্ত্রণ বিশেষ।

সুতরাং, যে ধরনের লেখা থেকে নিজেকে কখনই সংবৃত করিনি এবং আমার অন্যান্য বইয়ে যাদের স্থান কিছুটা প্রান্তিক, সেরকম বেশ কিছু প্রবন্ধের সঙ্গে এই দার্শনিক যুক্তিগুলিকে জুড়ে দেওয়া যায় বলেই আমার মনে হয়েছে। অনেক বেশি কাব্যিকভাবে এই যুক্তিগুলি সম্মতি থেকে প্রত্যাখ্যানের যাবতীয় মৌলিক অবস্থান্তরগুলিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছে। আমার ধারণা, এই যুক্তিগুলি একইভাবে শিল্পী ও তার কঠিন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির তাৎপর্য নির্ধারণ করেছে। এ বইয়ের সামঞ্জস্য আমার কাছে যতটা স্পষ্ট, আমার অ্যামেরিকান পাঠকদের কাছেও তাকে ঠিক ততটাই স্পষ্ট করতে চাই। কোনও শিল্পী তার জীবনধারণ করতে ও সৃষ্টিকর্মের প্রেরণা লাভের জন্য যথাক্রমে শীতল ও নিরাবেগ যে ভাবনার মধ্যে ডুবে থাকতে

পছন্দ করে, সেই ভাবনার মধ্যেই এই সামঞ্জস্য রয়েছে। এখানে যে সমস্ত মতবাদের সন্নিবেশ ঘটেছে, পনেরো বছর পরে এখন তাদের অনেকগুলিকেই আমি কাটিয়ে এসেছি; কিন্তু আমার মনে হয়েছে, যে জরুরি বাধ্যবাধকতার অনুভূতি থেকে আমি সেই অবস্থানগুলো নিয়েছিলুম, সেই অনুভূতির প্রতি আমি বিশ্বস্তই থেকেছি। তাই, অ্যামেরিকায় প্রকাশিত আমার সমস্ত বইয়ের মধ্যে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে এ বইটি অপেক্ষাকৃত ব্যক্তিগত। সুতরাং, পাঠকদের কাছে আমার বাকি বইগুলির তুলনায় এ বইটির অবশ্যই অনেক বেশি আনুকূল্য ও সহমর্মিতার প্রয়োজন রয়েছে।

প্যারিস<br>
মার্চ, ১৯৫৫

আলবের কামু

# সূচিপত্র

গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রের পরে কামু লিখিত মুখবন্ধ
(গ্রন্থটি কামু তাঁর বন্ধু পাস্‌কাল পিয়াকে উৎসর্গ করেছিলেন)

UN RAISONNEMENT ABSURDE ২৯
অ্যাবসার্ড যুক্তিবিচার পদ্ধতি

অ্যাবসার্ড এবং আত্মহত্যা (L'absurde et le suicide) ৩১
অ্যাবসার্ড পাঁচিলগুলো (Les murs absurdes) ৩৭
দার্শনিক আত্মহত্যা (Le suicide philophique) ৫১
অ্যাবসার্ড স্বাধীনতা (La Liberté Absurde) ৬৮

L'HOMME ABSURDE ৭৯
অ্যাবসার্ড মানুষ

ডন জুয়ানবাদ (Le don juanisme)
নাটক (La comédie) ৯১
জয় (La conquête) ৯৭

LA CRÉATION ABSURDE ১০৩
অ্যাবসার্ড সৃষ্টি

দর্শন এবং উপন্যাস (Philosophie et roman) ১০৫
কিরিলভ (Kirilov) ১১৪
ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি (বা যে সৃষ্টি আগামীতে থাকবে না) ১২১
(La création sans lendeman)

LE MYTHE DE SISYPHE ১২৫
সিসিফাসের কিংবদন্তী

APPENDICE ১৩১
পরিশিষ্ট
কাফকার রচনায় আশা ও অ্যাবসার্ড
(L'ESPOIR ET L'ABSURDE DANS L'ŒUVRE DE FRANZ KAFKA)
টীকা-নির্দেশিকা ১৪৩

পাস্‌কাল পিয়া-কে

## মূল ফরাসি বইয়ের মুখবন্ধ

*O mon âme, n'aspire à la vie*
*immortelle, mais épuisé le*
*champ du possible.*
*PINDARE*
*3ᵉ Pythique*

*হে আমার আত্মা, অনন্ত জীবনের*
*আশা কোরো না, বরং ভেঙে*
*ফেলো সম্ভবের সীমানা।*
*পিণ্ডার*
*পিথিয়ান ৩*

পরের পৃষ্ঠাগুলোয় যে অ্যাবসার্ড চেতনা আলোচিত হয়েছে, তা একালে বহুধাবিস্তৃত। সত্যি বলতে কি, আমাদের যুগের অজানা কোনও অ্যাবসার্ড দর্শন এখানে আলোচিত হয় নি। সুতরাং কোনও কোনও সমকালীন দার্শনিকদের কাছে এই পৃষ্ঠাগুলোর কী ঋণ আছে, তা বইয়ের শুরুতেই পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়াটা কর্তব্য। এই ঋণগুলোকে চেপে যাওয়া আমার এতটাই অনিচ্ছের যে, এই লেখাগুলোর নানা অংশেই সেগুলোর টীকা ও ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও খেয়াল রাখলে সুবিধে হবে যে, অ্যাবসার্ড—যাকে এতদিন উপসংহার হিসেবে মান্য করা হয়েছে, আমার প্রবন্ধে তা-ই সূচনা হিসেবে গৃহীত। সেদিক থেকে অনেকেই বলতে পারেন যে, আমার বিশ্লেষণের মধ্যে কিছু শর্ত রয়েছে। এই শর্ত হলো : বক্তব্য না শুনেই আগে থেকেই আমার লেখার অবস্থানকে বিচার করা চলবে না। এখানে মূলত বৌদ্ধিক বিকারের বর্ণনাই মিলবে। এই মুহূর্তে কোনও অধিবিদ্যা বা বিশ্বাস এখানে যুক্ত হচ্ছে না। এই বইয়ের এগুলোই সীমাবদ্ধতা এবং একমাত্র পক্ষপাত। কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমাকে এই বক্তব্যগুলোকে স্পষ্টতা দান করতে উদ্‌বুদ্ধ করেছে।

# UN RAISONNEMENT ABSURDE

# অ্যাবসার্ড যুক্তিবিচার পদ্ধতি

# L' ABSURDE ET LE SUICIDE

# অ্যাবসার্ড এবং আত্মহত্যা

নিদেনপক্ষে সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আছে একটাই আর তা হলো আত্মহত্যা। জীবনটা বেঁচে থাকবার উপযুক্ত কিনা—তা দর্শনশাস্ত্রের মৌলিক প্রশ্নটিরই সমতুল। বাকি ব্যাপারগুলো যেমন, পৃথিবীটা ত্রিমাত্রিক কিনা, মনের ন'টা না কি বারোটা বর্গ আছে—এগুলো ক্রমান্বয়ে আসতে থাকে। এগুলোই হচ্ছে কৌশল—প্রথমেই যেগুলির উত্তর বার করে ফেলতে হবে। আমাদের কাছে সম্মানীয় হওয়ার জন্যে একজন দার্শনিককে জ্ঞানের উপদেশ বিতরণ করতে হবে—নীৎশের[১] এ দাবি যদি সত্যি হয়, তবে আপনি ওই উত্তরের গুরুত্বটি যথার্থভাবে অনুধাবন করতে পারবেন। কারণ, নির্দিষ্ট কাজটির অব্যবহিত পূর্বে উত্তরটিও চলে আসবে। এই প্রমাণগুলি মনের কাছে সংবেদ্য, কিন্তু বুদ্ধির কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠার জন্যে তারা গভীর অনুশীলন দাবি করে।

নিজেকেই এ প্রশ্নটা করা চলে যে, এই প্রশ্নটি যে অন্যটির চেয়ে বেশি জরুরি তা কীভাবে নির্ণেয়? আমার উত্তর হলো, প্রাথমিক কার্যকারণ সূত্র দিয়েই মানুষ জজিয়তি করে। আমি কাউকে কখনই অস্তিত্বের যুক্তি খাড়া করে মরতে দেখি নি। গ্যালিলিও, যিনি একটি মহৎ গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্যের পোষক ছিলেন অত্যন্ত সহজেই সেটিকে শপথপূর্বক পরিত্যাগ করেছিলেন, যে মুহূর্তে তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছিল। একদিক থেকে তিনি ঠিকই করেছিলেন।[২] ওই বৈজ্ঞানিক সত্যটি তাঁর জীবনের বাজি ধরার উপযুক্ত ছিল না। পৃথিবী বা সূর্য কে কার চারপাশে ঘোরে—এ প্রসঙ্গটি এক প্রগাঢ় নির্লিপ্ততার বিষয়। সত্যি বলতে কি এটা একটা নিরর্থক প্রসঙ্গ। উল্টোদিকে আমি দেখেছি অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করে এ জন্যে যে, তাদের জীবনটা বেঁচে থাকবার উপযুক্ত নয়। বাকিদের দেখেছি স্ববিরোধিতায় প্রাণ বিসর্জন দিতে। কোনও একটি আদর্শ বা মায়াবী বিশ্বাসে তারা প্রাণ দিয়েছে, আসলে যা ছিল বেঁচে থাকারই একটি ভিন্ন ধরন। বেঁচে থাকার পক্ষে যাকে যুক্তি বলা হতো, সেটাই আবার মরবার জন্যেও একটা চমৎকার যুক্তি। তাই আমি এ সিদ্ধান্তে এসেছি যে, জীবনের তাৎপর্যনির্ণয় খুবই জরুরি একটা প্রসঙ্গ। কীভাবে এর উত্তর দেওয়া যায়? যেকোনও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাই সম্ভবত দু'টির বেশি চিন্তা-প্রণালী-নির্ভর (সেগুলিকেই আমি বুঝিয়েছি যেগুলি মৃত্যুর দিকে যাওয়ার

ঝুঁকি নেয় অথবা যেগুলি বাঁচবার উদ্দীপনাকে গভীর করে তোলে) নয়। যা বলছিলাম, মাত্রই দুটি চিন্তা-প্রণালী। তাদের একটি পালিসের[৩] এবং অন্যটি দন কিহেতোর[৪]। প্রমাণ এবং ভাবাবেগ—এ দু'য়ের ভারসাম্য আমাদের ভাবাবেগ ও বিচক্ষণতা অর্জনের ক্ষেত্রে একসঙ্গে পূর্ণ সম্মতি জানাতে পারে। সকলেই লক্ষ্য করবেন যে, যুগপৎ অকিঞ্চিৎকর এবং করুণ ভাবাবেগমিশ্রিত বিষয়ে কোনও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও ধ্রুপদী সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ নিশ্চিতভাবেই অপেক্ষাকৃত বিনম্র একটি মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে জায়গা ছেড়ে দেয়, যা একাধারে ঐকমত্য, প্রচলিত ধারণা ও বোধবুদ্ধি থেকে আহৃত হয়।

আত্মহত্যাকে সামাজিক বিষয় ছাড়া কখনই অন্যভাবে দেখা হয় নি। পক্ষান্তরে আমরা শুরু থেকেই ব্যক্তিক চিন্তা ও আত্মহত্যা এ দুয়ের সম্পর্ক নিয়ে ভাবিত হয়েছি। আত্মহত্যার মতো কোনও পরিকল্পনার সূত্রপাত হয় অন্তরের নৈঃশব্দ্যের মধ্যে যেন তা একটা মহৎ শিল্পকর্ম। অথচ সেই মানুষটি আগে থেকে এ ব্যাপারে জানে না কিছুই। অকস্মাৎ এক সন্ধেয় সে নিজের শরীরের দিকে তাক্ করে আগ্নেয়াস্ত্রের ট্রিগার টেপে বা উঁচু থেকে নিচের দিকে ঝাঁপ দেয়। নিজেকে শেষ করে দিয়েছিলেন এরকম একজন অ্যাপার্টমেন্ট-ম্যানেজার সম্পর্কে শুনেছিলুম যে, বছর পাঁচেক আগে নিজের মেয়েকে হারিয়েছিলেন তিনি। সেই ঘটনার পর থেকে তিনি ভীষণভাবে পাল্‌টে গিয়েছিলেন এবং ওই অভিজ্ঞতা তাকে "অন্তঃক্ষয়ী (miné/mined)" করে তুলেছিল। "অন্তঃক্ষয়ী" ছাড়া আর কোনও যুৎসই শব্দ কল্পনাই করা যায় না এখানে। এ ধরনের চিন্তার শুরুই হলো "অন্তঃক্ষয়ী" হবার সূচনা। এ ধরনের সূচনার সঙ্গে সমাজের যোগাযোগ খুবই অল্প। আসলে, মানুষের হৃদয়েই রয়েছে সেই কীটটি। সেখানেই তাকে খুঁজতে হবে। মানুষকে এই মারাত্মক খেলাটিকে অনুধাবন ও উপলব্ধি করতে হবে। এই খেলাটি হলো অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে সুবোধ্যতা থেকে পালিয়ে যাওয়া। পালিয়ে যাওয়া আলো থেকে অন্ধকারের দিকে।

আত্মহত্যার পেছনে অনেক কারণ আছে। সেগুলির মধ্যে সাধারণত যেটি স্পষ্টতর, সেটিই যে সবচেয়ে জোরদার, তা নয়। ভাবনা-চিন্তা করে আত্মহত্যা ঘটে খুবই কম। এই সংকটের ইন্ধনকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চিহ্নিত করা যায় না। (অনুমিতিগুলোকে বাদ দেওয়া যাবে না যদিও)। খবরের কাগজগুলো কখনও "ব্যক্তিগত দুঃখ", কখনওবা "দুরারোগ্য ব্যাধি"র কথা লেখে। এই ব্যাখ্যাগুলো আপাতগ্রাহ্য। কিন্তু এটাও তো জানতে হবে যে, ওই দুর্ঘটনার দিন মরীয়া মানুষটিকে তার কোনও বন্ধু উপেক্ষাসূচক কিছু বলে-টলেছিল কিনা। তেমনটা হলে দ্বিতীয় লোকটাই দায়ী হবে। এই দৃষ্টান্তটিই আমাদের অনুমানকে দৃঢ় করবার জন্যে যথেষ্ট যে, যাবতীয় তিক্ততা বা একঘেয়েমিই আত্মহত্যার কারণ—এই সহজ সমাধানটি আজও আমাদের কাছে নিঃসংশয়িত নয়।[৫]

মর্মান্তিক ঘটনাটির নির্দিষ্ট মুহূর্তটির নির্ধারণ যদি কঠিন হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে

আত্মহত্যা-উন্মুখ মানুষটি মরার জন্যে যে নির্দিষ্ট সময়টি বেছে নিয়েছিল, সে পরিমণ্ডল থেকেই মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ অনেক সহজ হবে। এক অর্থে নিজেকে হত্যা করার ব্যাপারটি কার্যত স্বীকারোক্তির অতিনাটকীয় তত্ত্বটিকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। এটা মানতেই হবে যে, জীবনটা আপনার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল বা আপনি তাকে বুঝে উঠতে পারছিলেন না। যাক গে, এ জাতীয় তুলনার ভেতরে আর ঢুকছি না বরং প্রচলিত শব্দ-প্রয়োগেই ফিরে আসি। এখানে কেবল একটা কথাই মেনে নিতে হবে যে, ওই জীবনটা বেঁচে থাকার "যোগ্য ছিল না"। বেঁচে থাকা, সাধারণত, কখনই সহজ নয়। অস্তিত্বের মর্জিতে আপনি যে অনেক বছর ধরে বেঁচে থাকার ভঙ্গিটা চালিয়ে যান, তার অনেকগুলি কারণ আছে। সেই কারণগুলির প্রথমটি হচ্ছে অভ্যেস। স্বেচ্ছামৃত্যু এ ইঙ্গিতই দেয় যে, অভ্যেসের হাস্যকর বৈশিষ্ট্য, বেঁচে থাকবার জন্যে পর্যাপ্ত কোনও যুক্তির অভাব, দৈনন্দিন ক্ষুব্ধতার বাতুলতা এবং যন্ত্রণাভোগের নিরর্থকতাকে আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে হলেও আবিষ্কার করেছিলেন।

তাহলে কী সেই অসংখ্য অনুভূতি, যা জীবনের জন্য আবশ্যক ঘুম থেকেও বঞ্চিত করে আমাদের? মন বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং দৃশ্যমান পৃথিবীটাকে কুযুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে থাকে। অন্যদিকে এই জগতের মায়া এবং আলো থেকে সহসা বিচ্যুত মানুষ নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও অপরিচিত বোধ করে। যেহেতু হারিয়ে যাওয়া বাড়ির স্মৃতি কিংবা প্রতিশ্রুত দেশের আশা থেকে মানুষ স্খলিত, তাই নির্বাসন থেকে কোনও রেহাই নেই তার। মানুষের ও তার জীবনের এবং অভিনেতা ও মঞ্চের মাঝখানের দৃশ্যপটের পারস্পরিক এই বিচ্ছেদই হলো যথার্থভাবে অ্যাবসার্ডের অনুভূতি। খুব বেশি বিশ্লেষণ না করেও এটা অনুধাবন করা যায় যে, কোনও সুস্থ মানুষ যখন তার আত্মহত্যার কথা ভাবে, তখন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা ও এই অ্যাবসার্ড অনুভূতিটির মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে যায়।

সংক্ষেপে, অ্যাবসার্ড এবং আত্মহত্যার প্রকৃত সম্পর্ক ও তার সঠিক মাত্রানির্ণয়ই হলো এই প্রবন্ধের উপজীব্য। এখানে আত্মহত্যা অ্যাবসার্ডের একটা সমাধান। মূল তত্ত্বটাকে এভাবে দাঁড় করানো যায় এখানে যে মানুষ নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে তঞ্চকতা করে না, সে অবশ্যই নিজের সিদ্ধান্ত-মাফিক কাজই করে। অস্তিত্বের অ্যাবসার্ডিটিতে বিশ্বাস নিশ্চয়ই একসময় তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। কৃত্রিম কারুণ্যের আবহ ছাড়াই স্পষ্টত এই ঔৎসুক্য স্বাভাবিক যে, এরকম মারাত্মক একটা সিদ্ধান্তকে এতো দ্রুত একটা দুর্বোধ্য পরিস্থিতিকে পরিত্যাগ করবার প্রয়োজন পড়ে কিনা! এখানে আমি তাদের কথাই বলছি, যারা নিজেদের ভাবাবেগ দ্বারা চালিত।

সমস্যাটিকে সরল কিংবা অমীমাংসেয় উভয়ই মনে হতে পারে। ইতিমধ্যেই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এই যুক্তিটিও ভ্রান্ত যে, সহজ প্রশ্নের উত্তরগুলি

ততটা সহজ নয় এবং একটা দৃষ্টান্ত আর একটা দৃষ্টান্তের উপস্থাপক। উপযুক্ত ব্যাখ্যা ছাড়াই সমস্যাটিকে উল্টো করে দেখা হয়। ভাবা হয় যে, কারুর আত্মহত্যা করা বা না করার ক্ষেত্রে মাত্র দুটো সমাধানই রয়েছে—হয় "হ্যাঁ" কিংবা "না"। এ ভাবনা খানিকটা অতি-সরলীকরণের উদাহরণ। তাদের জন্যেও তো কিছু জায়গা ছাড়তে হবে, যারা কোনও মতামত দেয় না এবং অবিরত শুধু প্রশ্নই করে যায়। এখানে খানিকটা ব্যাজোক্তিকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। সেদিকেই পাল্লাটা ভারী। আমি এও লক্ষ্য করেছি যে, যারা "না" বলে তাদের আচরণও "হ্যাঁ" বলা মানুষদেরই মতো। বাস্তবতার দিক থেকে যদি নীৎশীয় মূল্যমানকে গ্রহণ করি, তাহলে কোনওনা কোনওভাবে তা "হ্যাঁ" বাচক। অন্যদিকে এমনটাও প্রায়ই হয় যে, যারা আত্মহত্যা করে তারা জীবনের মানেটা পেয়ে যায়। এ দুয়ের মধ্যেকার বিরোধের ব্যাপারটা চিরন্তন। এমনকি এটাও বলা যায় যে, তারা এ বিষয়ে কখনই তত উৎসুক হয় নি, যাতে যুক্তিকে বরং অনেক বেশি বাঞ্ছিত মনে হতে পারত। দার্শনিক তত্ত্ব এবং সে তত্ত্বের প্রবক্তাদের ব্যবহারিক জীবনের তুলনা করাটা একটা প্রচলিত রীতি। কিন্তু এখানে তাঁদের কথা অবশ্যই বলতে হবে, যাঁরা জীবনের গূঢ় অর্থকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁরা আর কেউ নন্ তাঁরা হলেন সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত কিরিলভ, কিংবদন্তীর সন্তান পেগ্রোগ্রিনেস[৬] এবং অনুমিতির সঙ্গে যুক্ত জ্যুল ল্যক্যুয়ে,[৭] যিনি জীবনের ওই প্রত্যাখ্যানের স্বপক্ষে যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। অট্টহাস্যের উপযোগী বিষয় হিসেবে শোপেনহাওয়ারের কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে। কারণ, অসংখ্য লোকের সমাবেশে তিনি আত্মহত্যার স্তুতি করেছিলেন। এটা মস্করার বিষয় নয়। কারণ, ওই মর্মান্তিক ব্যাপারটিকে গভীরভাবে না নেবার ওই পদ্ধতিটি তত মারাত্মক না হলেও, কোনও মানুষকে বিচার করার পক্ষে যথেষ্টই উপযোগী।

এই ধরনের অসঙ্গতি ও অস্পষ্টতাগুলির ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব যে, জীবন সম্পর্কে কারুর ধারণা ও এই জীবনকে পরিত্যাগ করার অংশগ্রহণে কোনও পারস্পরিক যোগাযোগ নেই। আমরা যেন নিজেদের ভাবনাকে এখানে অতিরঞ্জিত করে না ফেলি। কোনও মানুষের জীবনাসক্তিতে পৃথিবীর সমস্ত ধরনের অশুভের চেয়ে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী কিছু ব্যাপার রয়েছে। শরীরের বিচারপদ্ধতি মনের বিচারপদ্ধতির মতই এবং নির্মূলীকরণের প্রভাবে শরীর হারিয়ে যায়। চিন্তার অভ্যেস অর্জনের আগেই আমরা বাঁচবার প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠি। বাঁচার দৌড় প্রতিদিন আমাদের মৃত্যুর দিকে দ্রুত ঠেলে দেয়, শরীর তার অপূরণীয় যাপনকে বাঁচিয়ে চলে। সংক্ষেপে, ওই অসঙ্গতিগুলির সারবস্তু যাকে আমি "ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়া" বলি, তার মধ্যে রয়ে যায়। কারণ, পাসকালের ধারণা অনুযায়ী এটি একই সঙ্গে ঘুরপথের চেয়ে সংক্ষিপ্ত আবার দীর্ঘ। "ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়া" হলো একটি পরিবর্তনহীন খেলা। ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার এই বিশেষ কাজ, এই প্রাণঘাতী পলায়ন— এ

প্রবন্ধের যে তৃতীয় থিমটিকে গঠন করে, তা আশা। এই অন্য জীবনের আশা অবশ্যই একজন মানুষের "প্রাপ্য"। কিছু মানুষ একটা ছলনা নিয়ে বাঁচে। এই ছলনা জীবনের জন্যে নয়, কতকগুলি মহৎ ধারণাকে রূপ দেবার জন্যে। এই ধারণাগুলি জীবনকে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা বলে, জীবনকে পরিশুদ্ধ করার কথা বলে এবং জীবনের সঙ্গে প্রতারণা করে এভাবে।

এভাবে সবকিছুই সংশয় ছড়াতে সাহায্য করে। এত কাল ধরে সে চেষ্টাটা নিষ্ফল হয় নি। জনগণ কথার খেলা চালিয়ে যাচ্ছে আর এই বিশ্বাসের ভাণ করছে যে, জীবনের অর্থ মেনে না নেওয়া মানে আবশ্যিকভাবে এ ঘোষণাকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যে, জীবনটা বাঁচবার উপযুক্ত নয়। বাস্তবে এ দুটি সিদ্ধান্তের কোনো সাধারণ মানদণ্ড নেই। পূর্বোক্ত সংশয়, বিচ্ছেদ, অসংলগ্নতা ইত্যাদি দ্বারা বিপথে চালিত হওয়ার সময় কারুর পক্ষে যা একমাত্র করণীয়, তা হলো প্রত্যাখ্যান। একজন না একজনকে অবশ্যই বাকি বিষয়গুলিকে আমল না দিয়ে সরাসরি মূল সত্যের দিকে এগোতে হবে। অনেকেই আত্মহত্যা করে। কারণ, তার পক্ষে জীবনটা বাঁচবার উপযুক্ত নয়। এটা অবশ্যই একটা সত্য—যদিও একটি নিষ্ফল সত্য, যেহেতু এমনিতেই মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু জীবনকে সটান বাতিল করে দিয়ে অস্তিত্বকে বাতিল করার যে ব্যাপারটা, তা কি এই বাস্তবতা থেকে এসেছে যে, অস্তিত্বের কোনও মানে নেই। জীবনের অ্যাবসার্ডিটির জন্যে কি কাউকে আশা এবং আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে বাস্তবতা থেকে রেহাই পেতে হবে। বাকি সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করা, অনুধাবন করা এবং প্রাঞ্জল করা অবশ্যকর্তব্য। অ্যাবসার্ড কি মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আসে? মোটের উপর, সমস্ত চিন্তাধারা এবং সমস্ত নিরাসক্ত মনের অভ্যেসের বাইরে এই সমস্যাটিকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে। অর্থের আলোছায়া, অসঙ্গতি, মনস্তত্ত্ব— যেগুলির সঙ্গে বস্তুবাদী মন সবসময় যাবতীয় সঙ্কটগুলোর পরিচিত ঘটায়—এই অন্বেষণে এবং ভাবাবেগে সেগুলির কোনও জায়গা নেই। অন্যভাবে বলা যায়, এটা একটা অসঙ্গত যুক্তি দিয়ে গঠিত ভাবনার দাবিদার। সেটা সহজ নয়। যুক্তিবাদী হওয়াটা সর্বদাই সোজা হলেও সাধ্যমতো শেষ পর্যন্ত যুক্তিবাদী থাকাটা প্রায় অসম্ভব। যারা আত্মহত্যা করে, ঘটনাক্রমে তারা ভাবাবেগের দিক থেকে সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছোয়। আমার জিজ্ঞাসাকে উদ্রিক্ত করতে আত্মহত্যাবিষয়ক চিন্তাধারা একমাত্র এই সমস্যাটি উত্থাপন করবার সুযোগ দেয়—মৃত্যুর ব্যাপারে কি কোনও যুক্তি আছে? অতি ভাবাবেগ বর্জন করে প্রমাণের একমাত্র আলোয় যদি আমি যুক্তিবিচারের প্রক্রিয়ায় (যাকে আমি এখানে উৎস বলছি) সারাক্ষণ নিবিষ্ট না থাকি, তবে আমি সেই যুক্তিটিকে জানতে পারব না। অ্যাবসার্ড যুক্তি বলতে এগুলিকেই বুঝিয়েছি আমি। অনেকেই এ কাজ শুরু করেছেন। আমি এখনও জানি না যে, তাঁরা কাজটা আজও করে যাচ্ছেন কিনা।

পৃথিবীটিকে একটি একক হিসেবে নির্ণয়ের অসম্ভবপরতাকে আবিষ্কার করে কার্ল জাস্‌পার্স[৮] যখন এভাবে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—"এই সীমাবদ্ধতা নিজের কাছেই ফিরিয়ে আনে আমাকে; যেখানে আমি যার প্রতিনিধিত্ব করছি, এরকম কোনও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির আড়ালে নিজেকে সরিয়ে আনতে পারি না, যেখানে আমার নিজের বা অন্যের অস্তিত্ব আর আমার কোনও বিষয় হতে পারে না।" তখন বহুজনের পরে আবারও তিনি সেই সমস্ত শুকনো মরুভূমিকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, যেখানে নিজেরই বলয়ে ভাবনারা হয়েছে বন্দি। তাঁর আগেও অনেকেই এসব কথা বলেছিলেন। অনেকের পরেই এভাবে তিনি বলতে পেরেছিলেন। হ্যাঁ, সত্যিই তাই। অনেকের পরে। কিন্তু তাঁরা নিজেদের থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কী উদ্‌গ্রীবই না ছিলেন! যেখানে চিন্তার অগ্রগতি দ্বিধাগ্রস্ত, পথের সেই অন্তে ইতিমধ্যেই বহু মানুষ পৌঁছে গেছে। এদের মধ্যে অনেকেই অকিঞ্চিৎকর। পরে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের পরম প্রিয় ধন ও প্রাণের স্বত্ব ত্যাগ করেছিল। একইরকমভাবে অন্যেরা, যারা যেন মনের রাজপুত্তুর, তারাও আনুষ্ঠানিকভাবে জীবনের স্বত্ব ত্যাগ করেছিল। কিন্তু তারা চিন্তার শুদ্ধতম বিদ্রোহের মধ্যে আত্মহত্যার সূচনা করেছিল। আসলে চেষ্টাটা ছিল যতোটা সম্ভব সেখানে রয়ে যাওয়ার এবং এবং ওই সব সুদূর এলাকার ঝিমিয়ে পড়া বিষম জীবনটাকে ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করে দেখার। সংসক্তি ও সূক্ষ্মদর্শিতা হলো এই অমানবিক প্রদর্শনীর সুবিধাভোগী দর্শক। এই প্রদর্শনীতে অ্যাবসার্ড এবং মৃত্যু তাদের পারস্পরিক বার্তালাপ চালিয়ে যায়। এর পরে তাণ্ডবের ওই প্রাথমিক ও সূক্ষ্ম রূপগুলিকে উদাহরণ দিয়ে বিশদ করার ও কল্পনায় পুরনো অভিজ্ঞতায় ফিরে যাওয়ার আগে মন সেগুলিকে স্বয়ং বিশ্লেষণ করতে পারে।

————

# LES MURS ABSURDES

# অ্যাবসার্ড পাঁচিলগুলো

মহৎ গ্রন্থগুলোর মতোই গভীর ভাবাবেগগুলোও সব সময় সরাসরি যা বলে, তার থেকে বেশি করে ইশারা। সত্তার গভীরে আবেগের ধারাবাহিকতা বা বিতৃষ্ণা কাজের অভ্যেস বা ভাবনার মুখোমুখি হয় এবং তাদের পরিণামের মধ্যে রূপায়িত হয়, সত্তা স্বয়ং যাদের বিষয়ে থাকে অনবহিত। গভীর অনুভূতিগুলি নিজেদের ভাবজগৎকে সঙ্গী করে, যেগুলি জাঁকালো বা হতদরিদ্র উভয়ই হতে পারে। তাদের আবেগের উত্তাপে একান্ত একটি জগৎকে তারা আলোকিত করে, যেখানে নিজেদের পরিমণ্ডলটিকে তারা চিনে নেয়। একটা জগৎ আছে ঈর্ষার, উচ্চাকাঙ্খার, স্বার্থপরতার অথবা মহত্ত্বেরও। এই জগৎটাকে বলা যায় এক ধরনের অধিবিদ্যা, এক ধরনের মানসিক প্রবণতা। একাধারে অনির্দিষ্ট, সংশয়াত্মক ও "নির্দিষ্ট" এবং দূরের ও "কাছের" যে অনতিস্পষ্ট অনুভূতিগুলি ইতিমধ্যেই কিছুটা বৈশিষ্ট্য অর্জন করে নিয়েছে, তাদের সম্পর্কে সত্যটা হলো এই যে, সেগুলি আরও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে। এগুলি আমাদের সৌন্দর্য দান করেছে, আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে অ্যাবসার্ডিটিকে।

যেকোনও রাস্তার মোড়েই অ্যাবসার্ডিটির অনুভূতি যেকোনোও মানুষের মুখেই চড় হাঁকাতে পারে। কারণ, তার অনাবৃত দুঃখের রূপটা অস্পষ্ট আলোয় ম্লান, ধরাছোঁয়ার বড়ই বাইরে। কিন্তু এই সঙ্কটটিও গভীর চিন্তার দাবি রাখে। সম্ভবত এটাই সত্য যে, মানুষ চিরদিনই আমাদের কাছে অচেনা এবং তার মধ্যে এমন কিছু অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য থাকে, যা আমাদের অনায়ত্ত। কিন্তু *কার্যত* আমি অনেক মানুষকেই তাদের আচরণ, তাদের সামগ্রিক কর্মধারা এবং সামাজিক কাজকর্মে তাদের অংশগ্রহণ—এই সমস্ত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জানতে ও চিনে নিতে পারি। এভাবেই আমি অযৌক্তিক ভাবনাগুলোকেও চিহ্নিত করতে পারি, যেগুলোর কোনও বৈশ্লেষিক মূল্য নেই। বৌদ্ধিক জগতের যাবতীয় ঘটনাবলিকে একত্রিত করে, তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলিকে লিপিবদ্ধ করে এবং তাদের চারপাশের জগতের একটা মানচিত্র নির্ণয় করে *কার্যত* তাদের আমি ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করতে পারি। সাধারণভাবে এটা বলাই যায় যে, একই অভিনেতাকে শত শতবার দেখেছি বলেই তাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে বেশি জানি না। তবে, হ্যাঁ,

যত নায়ক-চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন, তাদের সবাইকে মিলিয়ে যদি বলি, ওই একশটা চরিত্রের মধ্যে তাকে অপেক্ষাকৃত বেশি চিনি, তবে সেটার মধ্যে খানিকটা সত্যতা থাকবে। কারণ, এই আপাতদৃশ্য কূটাভাসটি (paradoxe) একটি রূপকও বটে। এর মধ্যে একটা নৈতিক উপদেশও আছে। এর থেকে এই শিক্ষাটাই পাই যে, মানুষ নিজেই তার চ্যাংড়ামো এবং অকপট অনুভূতিগুলির মাধ্যমে নিজেকে ব্যাখ্যা করে। সুতরাং অনুভূতিগুলির একটি প্রাথমিক চাবিকাঠি আছে, যা হৃদয়ের অনধিগম্য। কিন্তু তাদের প্রাণবন্ত ভূমিকা এবং মনের অনুমাননির্ভর প্রবণতাগুলির সাহায্যে আংশিকভাবে তারা নিজেদের প্রকাশিত করে। স্পষ্টতই এভাবে একটা পদ্ধতিকে আমি ব্যাখ্যা করছি। তবে এও লক্ষণীয়, এটি এক ধরনের বিশ্লেষণ-প্রণালী, কোনও জ্ঞান নয়। কারণ, পদ্ধতিগুলি অধিবিদ্যার নির্দেশক, যেগুলি অজ্ঞাতসারেই নিজেদের সম্পূর্ণতা প্রকাশ করে দেয়। বিষয়গুলি সম্পর্কে অনবহিত হয়েই। এরকমভাবেই বইয়ের শেষ পৃষ্ঠাগুলি প্রথম দিকের পৃষ্ঠাগুলিতেও থাকে। এই যোগসূত্রটা অবশ্যম্ভাবী। এখানে ন্যায়ের যে সূত্রটি ব্যাখ্যাত হলো, তদনুযায়ী এ অনুভূতিটাই মান্যতা পায় যে, কোনও প্রকার প্রকৃত জ্ঞানের অর্জনই সম্ভবপর নয়। কেবলমাত্র জ্ঞানের বাহ্যরূপগুলিকে একাদিক্রমে নির্ণয় করা যেতে পারে। ফলে আমাদের কাছে সমগ্র পরিমণ্ডলটি স্বতস্ফূর্তভাবে অনুভবগম্য হয়ে ওঠে। হয়তো, আমরা বিচিত্র কিন্তু নিবিড়সম্পর্কবিশিষ্ট বৌদ্ধিক জগতের, জীবনশৈলির বা স্বয়ং শৈলির অ্যাবসার্ডিটির এই অপস্রিয়মান অনুভূতিকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারব। অ্যাবসার্ডিটির আবহটা রয়েছে শুরুতেই আর তার শেষটা হচ্ছে সেই অ্যাবসার্ড জগৎ ও মনের এই ভঙ্গিটি (যা জগৎকে তার আসল চেহারায় উদ্ভাসিত করে)—যেটি এই উদ্ভাসনের মাধ্যমে সেই সুবিধাভোগী ও নির্মম মুখটিকে তুলে ধরে, নিজের ভেতরেই যাকে উপলব্ধি করেছে সে।

মহৎ যেকোনও রচনা ও চিন্তার একটা উদ্ভট প্রারম্ভ আছে। অনেক মহৎ রচনা-ই রাস্তার মোড়ে অথবা রেস্তোরাঁর ঘূর্ণ্যমান দরজার সামনে সৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং এখানে অ্যাবসার্ডিটির ব্যাপার আছে। বাকিদের চেয়ে অ্যাবসার্ড জগৎ অনেকটাই তার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে ওই হতভাগ্য উদ্ভব থেকে। কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে কাউকে যখন জিগ্যেস করা হয়, আপনি কী ভাবছেন এবং তিনি উত্তর দেন "কিছুই না", তখন সেটাকে মানুষের একটা ভণ্ডামি বলা যায়। যারা ভালোবাসা পেয়েছে—তারা সবাই এ ব্যাপারটা জানে। কিন্তু ওই উত্তরটা যদি আন্তরিক হয়ে থাকে, যদি সত্তার বিসদৃশ অবস্থাটাকে (যেখানে শূন্যতাও কথায় কথায় ভরে ওঠে, যেখানে রোজকার সৌজন্যগুলি বিনষ্ট, অন্তঃকরণ যেখানে হারানো যোগসূত্রগুলি অর্থহীনভাবে খুঁজে মরে, যেগুলির

সঙ্গে সে আবার যোগসূত্র স্থাপন করবেও) তা প্রতীকিত করে, তবে তা অ্যাবসার্ডিটির প্রথম লক্ষণটির মতোই হয়ে ওঠে।

গোটা পরিমণ্ডলটাই ধসে পড়ে। ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা, রাস্তার গাড়ি, কারখানা বা অফিসে অতিবাহিত চারটি ঘণ্টা, আহার, রাস্তার গাড়ি, চার ঘণ্টা ধরে কাজ, আহার, ঘুম এবং সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনিবার একই গতিছন্দ বজায় রেখে চলার এই রুটিনটাই বেশিরভাগ সময় সহজভাবে মেনে চলা হয়। কিন্তু একদিন "*কেন*" প্রশ্নটা জেগে ওঠে এবং ওই বিস্ময়মিশ্রিত ক্লান্তির মধ্যে সব কিছু শুরু হয়। "শুরু হয়"—ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। যান্ত্রিক জীবনের কাজকর্মের শেষে ক্লান্তি আসে কিন্তু একই সঙ্গে অন্তঃপ্রেরণাগুলিকেও উস্‌কে দেয়। আমাদের চৈতন্যের জাগরণ ঘটায় এবং তার সংবেদনের পরের স্তরগুলিকে প্রণোদিত করে। এই স্তরগুলি হলো ধারাবাহিক নিয়মানুবর্তিতার ক্রমিক প্রত্যাবর্তন বা চূড়ান্ত সুপ্তিভঙ্গ। সুপ্তিভঙ্গের পরে, যথাসময়ে আসে, সেই ঘটনা আত্মহত্যা বা পুনর্বাসন। ক্লান্তির ভিতরেই আছে এমন কিছু উপাদান, যা ক্লান্ত মানুষটিকে ধ্বস্ত করে। এখানে আমি অবশ্যই বলব যে, এটা ভালোই। কারণ, সবেরই সূত্রপাত হয় চৈতন্যের মাধ্যমে এবং তার মাধ্যমে হয় না, এমন কোনও কিছুরই মূল্য নেই। এই ভাবনাগুলোর মধ্যে কোনও মৌলিক্‌কতা নেই। কিন্তু তারা স্বতঃসিদ্ধ; অ্যাবসার্ডের মূল রূপের প্রাথমিক অনুসন্ধানের সময়ে এটুকুই যথেষ্ট। নিছক "উদ্বেগ"-ই সবের মূলে।

এভাবেই প্রতিদিনের ধূসরতার মধ্যে দিয়ে সময় আমাদের টেনে নিয়ে চলে। কিন্তু একদিন সেই সময়টা আসেই, যখন আমাদেরই সময়কে বইতে হয়। কিন্তু আমরা বাঁচি ভবিষ্যতের উপরে ভর করে। "আগামীকাল", "পরে", "যখন তুমি পথ খুঁজে পাবে", "যখন অনেকটা বয়স হবে, তখন তুমি বুঝতে পারবে"—এরকম কিছু ভাবনাকে আঁকড়ে। এই অবান্তর কথাগুলি বিস্ময়কর। কারণ, এই কথাগুলির সঙ্গে মৃত্যু জড়িয়ে আছে। যদিও একদিন সে সময়টা আসে, যখন লোকে খেয়াল করে বা বলে যে, এবার তার বয়স ত্রিশে পড়েছে। এভাবে সে দৃঢ়ভাবে নিজের যৌবনের ঘোষণা করে। কিন্তু একইভাবে সময়ের সঙ্গেও নিজেকে জুড়ে নেয় সে, সময়ের মাঝখানে নিজেকে স্থাপন করে। সে মেনে নেয় যে, তার যাত্রাপথের শেষ পর্যন্ত পৌঁছনোর কালে একটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। সে হয়ে পড়েছে সময়েরই একটা অংশ এবং সে এমনই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে যে, সবচেয়ে দুর্বল শত্রুটিকেও চিহ্নিত করে ফেলেছে। অনাগতের জন্যে সে ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে, যাতে তার মনের এই আতঙ্কগুলিকে সে একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারে। রক্তমাংসের এই বিদ্রোহটাই অ্যাবসার্ড[৬]।

এক ধাপ নিচে যেখানে অস্বাভাবিকতা গুঁড়ি মেরে এগোয়, সেখানে সে লক্ষ্য করে যে, পৃথিবীটা "স্থূল"। সে বুঝতে পারে যে, আমাদের কাছে একটা পাথর কতটা পর্যন্ত

অপরিচিত ও অদ্রুসণীয় এবং কত প্রবলভাবে এই প্রকৃতি ও ভূখণ্ড আমাদের অগ্রাহ্য করতে পারে। সব সৌন্দর্যেরই কেন্দ্রে অমানবিক একটা কিছু থাকে এবং এই পাহাড়গুলো, আকাশের এই কোমলতা, এই বনরাজীনীলা অমানবিকতার এই বিশেষ মুহূর্তে তাদের সেই ব্যঞ্জনা হারিয়ে ফেলে, যা তাদের উপরে আমরা আরোপ করেছি। ফলে তারা লুপ্ত স্বর্গের চেয়েও দূরের হয়ে পড়ে। পৃথিবীর আদিম বৈরিতা শত শত যুগ পেরিয়ে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়। ক্ষণিকের জন্যে আমরা হয়ে পড়ি বোধশক্তিরহিত। কারণ, শত শত বছর ধরে তার মধ্যে আমরা সেই সমস্ত ছবি ও ধাঁচ ছাড়া অন্য কিছুকেই উপলব্ধি করি নি, যেগুলিকে আগে থেকেই ওই বৈরিতার উপরে ন্যস্ত করেছিলুম। ফলে তখন থেকে ওই কৌশল-প্রয়োগের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। পৃথিবীটা আমাদের থেকে দূরে সরে গেছে। কারণ, সে ফিরে গেছে তার নিজেরই কাছে। অভ্যেসের মুখোশ পরা এই দৃশ্যগুলো ফিরে গেছে তাদের পূর্বতন রূপে। আমাদের থেকে রচনা করেছে একটা দূরত্ব। যেন ঠিক সেই দিনগুলো ফিরে এসেছে, যখন কোনও নারীর পরিচিত মুখশ্রীর মধ্যে কোনও অপরিচিতাকে দেখেছিলুম, কত বছর, কত মাস আগে যে ভালোবেসেছিলুম তাকে। আমাদের একলা ফেলে একদিন সে চলে গেছে, হয়ত তাকেই ফের আমরা কামনা করব। কিন্তু সে-সময় আসে নি এখনও। ব্যাপার তো একটাই    পৃথিবীর নিবিড়তা এবং অস্বাভাবিকতাই অ্যাবসার্ড।

মানুষও নিজের ভিতরে অমানুষকে লুকিয়ে রাখে। যে মুহূর্তে মানুষকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, কিংবা তাদের ভাবভঙ্গির মধ্যে এক ধরনের যান্ত্রিকতা ফুটে ওঠে, সে মুহূর্তেই তাদের অর্থহীন পুতুলপনা তাদের চারপাশের পরিবেশটাকে বোকা বোকা করে ফেলে। কাচের দেয়ালের আড়াল থেকে যখন কোনও মানুষ টেলিফোনে কথা বলে, তখন আপনি তার কথা শুনতে পান না, কিন্তু তার বল্গাহীন মৌন প্রদর্শনীটি দেখতে পান; আপনি বিস্মিত হন তার জীবন সম্পর্কে। মানুষের অমানুষীপনার সামনে যে অস্বস্তি, আমাদের প্রকৃত রূপের সামনে যে অকথ্য চেঁচামেচি, এই "গা গুলোনো" ব্যাপারগুলোকেই আজকের যুগের লেখকেরা অ্যাবসার্ড বলে থাকেন। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র আয়নায় যাকে আমরা দেখি, সেই অপরিচিতকে এবং আমাদের নিজেদের ফোটোগ্রাফের মধ্যে যে পরিচিত কিন্তু সন্দেহজনক ভাইটিকে আমরা দেখতে পাই, উভয়ই অ্যাবসার্ড।

এর পরে আসছি মৃত্যুর প্রসঙ্গে এবং মৃত্যু নিয়ে আমাদের অনুভূতিতে। এ নিয়ে সবই বলা হয়ে গেছে। তাই এর [illegible]স্পর্শিতা নিয়ে সংযত থাকাই এখন শোভন হবে। যদিও কেউই খুব আশ্চর্য হবেন না যে, "না জানার" ভান করেই বেঁচে থাকে সবাই। এর কারণ, বাস্তবে মৃত্যুর কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় না। সঠিকভাবে বলতে গেলে, কোনও অভিজ্ঞতা অর্জন হয়নি ঠিকই, কিন্তু বেশ সতর্কভাবে জীবনটা কাটানো গেছে।

অন্যের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা দিয়েই এখানে বড় জোর কথা বলা সম্ভব। এটা একটা বিকল্প, বিভ্রম আর তাই কখনই আমাদের যথার্থ বিশ্বাস উৎপাদন করে না। ওই বিষাদের ঐতিহ্যকে চলতে দেওয়া যায় না। ঘটনাটার গাণিতিক দিক থেকেই বাস্তবে আতঙ্কটির সৃষ্টি। সময় যে আমাদের ভয় দেখায়, তার কারণ সে সমস্যাটির বিশ্লেষণ করে তার সমাধান বার করে। আত্মাবিষয়ক যাবতীয় সুন্দর কথাগুলোর বিরুদ্ধ-মতও আছে। সেগুলিও যথেষ্টই দৃঢ়মূল, অন্তত কিছুকালের জন্যে। এই নিশ্চল দেহ (যেখানে একটা চড় দাগ রেখে যেতে পারে না কোনও) থেকে আত্মা অন্তর্হিত হয়েছে। অ্যাডভেঞ্চারের এই মৌল এবং সুনির্দিষ্ট রূপগুলো অ্যাবসার্ড আবেগকে গঠন করে। নিয়তির ওই মারক উত্তাসে তার অসারতা প্রকট হয়ে ওঠে। যে নির্মম গণিত আমাদের চারপাশের উপরে হুকুমদারী করে, তার সামনে কোনও নৈতিক বিধি বা প্রযত্ন *স্বতঃসিদ্ধরূপে* যুক্তিসম্মত নয়।

আবারও বলি যে, এ সব কথা আগেও একাধিকবার বলেছি। এবার এই বিষয়গুলোকে দ্রুত সাজিয়ে নিয়ে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করছি। সবধরনের সাহিত্য এবং দর্শনেই এগুলো প্রবহমান। মানুষের দৈনন্দিন কথোপকথন এদের থেকেই রসদ সংগ্রহ করে। তাদের আর নতুন করে আবিষ্কারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পরবর্তী কালে মৌলিক প্রসঙ্গগুলি নিয়ে নিজেকে যাতে যাচাই করতে পারি, সেজন্যে এই প্রমাণগুলির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। আমি আবারও পুনরাবৃত্তি করতে চাই যে, আমাকে যা আগ্রহী করে, তা অ্যাবসার্ড আবিষ্কারমালা নয়, তার পরিণামসমূহ। এই প্রমাণগুলোর ব্যাপারেই যদি কেউ নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন আর কী সিদ্ধান্ত নেবে সে? কোনও কিছুকে পাশ না কাটানোর জন্যে তাকে কত দূরই বা যেতে হবে আর? তাকে কি আত্মঘাতী হতে হবে, না কি সবকিছু সত্ত্বেও তাকে আস্থা রাখতে হবে জীবনে? এ ব্যাপারে বেশ আগে থেকেই চটজলদি ও অভিনব কোনও বুদ্ধিসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণীয়।

কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা ভুল-সে সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই মনের প্রথম কাজ? আসলে, চিন্তাভাবনার প্রারম্ভেই সবাই আবিষ্কার করে যে, একটা বৈপরীত্য রয়েছে। এ নিয়ে জোরালো কোনও যুক্তি পাড়বার কারণ দেখি না। গত কয়েক শ বছরের মধ্যে এ প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলের চেয়ে স্পষ্ট এবং মর্যাদাপূর্ণ নির্দেশ আর কেউ দিতে পারেন নি—"এই মতবাদগুলির স্বাভাবিক হাস্যকর পরিণতি হলো এই যে, তারা নিজেরাই নিজেদের অবলুপ্তি ঘটায়। সব কিছু সত্য—এ মতটিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করে আমরা বিরুদ্ধ মতের জোরটাকেই প্রতিষ্ঠিত করে ফেলি এবং এভাবে নিজেদের তত্ত্বটিকেই মিথ্যা

প্রতিপন্ন করি। কেননা, বিরুদ্ধ মতের জোর সেটাকে সত্য বলে স্বীকার করে না। আর যদি কেউ বলে যে, সব কিছুই মিথ্যে, তাহলে, তার সেই দাবিটাও মিথ্যে। যদি আমরা ঘোষণা করি যে, আমাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধ দাবিটা মিথ্যে, তাহলে অবশ্যই আমরা অন্তহীন সত্য বা মিথ্যে রায়গুলোকে মেনে নিতে বাধ্য হয়ে পড়ব। কারণ, অন্য একজনও যখন তার জোরালো দাবিটিকে একইসঙ্গে সত্য বলে ঘোষণা করবে, সেটাও সত্য হয়ে উঠবে,—*অন্তহীন সত্যের* রূপ হয়ে উঠবে।"

এই পঙ্কিল বৃত্তটাই সেই ধারাবাহিক অধ্যায়টির প্রথম পর্ব, যেখানে মন আত্মসমীক্ষা করতে গিয়ে শিরঃপীড়াগ্রস্ত হয়। একটা বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে হারিয়ে যায়। এই কূটাভাসগুলোর (paradoxes) স্পষ্টতাই তাদের অদ্রুসণীয় করে তোলে। শব্দের মধ্যে অর্থের যে খেলা বা যুক্তির মারপ্যাঁচই থাকুক না কেন, সেগুলিকে বোধগম্য করার মানে হলো তাদের এক করে ফেলা। মনের সুগভীর বাসনা, এমনকি তার বহুমুখী প্রসারণও মানুষের নির্জ্ঞান অনুভূতিকে জগতের কাজে সমান্তরলতা দান করে। এ হলো সুপরিচিতের প্রতি মিনতি, স্পষ্টতার জন্যে তীব্রতা। জগৎকে হৃদয়ঙ্গম করা মানে, তাকে মানুষের ছাঁচে নামিয়ে আনা, তাতে মানুষের শিলমোহর দেগে দেওয়া। বেড়ালের পৃথিবীটা উইয়ের ঢিবির জগৎ নয়। "সমস্ত চিন্তাই নরত্বারোপ (anthropomorphique/ anthropomorphic)"—এই প্রচলিত কথাটির আলাদা কোনও মানে নেই। অর্থাৎ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে চায় যে মন, সে চিন্তনীয় বিষয়ের মাপেই নিজেকে হ্রস্ব করে ফেলে। মানুষ যদি বুঝেই যায় যে, জগৎটা তারই মতো ভালবাসতে পারে এবং কষ্ট পেতে পারে, তাহলে একধরনের সান্ত্বনা লাভ করবে সে-ও। যদি ভাবনাগুলো অবভাসের পরিবর্তনশীল দর্পণে আবিষ্কৃত হয়, চিরন্তন সম্পর্কগুলো তাদের একটি ঐক্যসূত্রে বিধৃত করতে পারে, তাহলে একটা বৌদ্ধিক আনন্দের দেখা মিলবে এবং তার প্রসাদপুষ্ট কিংবদন্তীটি এক হাস্যকর অনুকৃতি ছাড়া কিছুই হবে না। ঐক্যের জন্যে এই নস্ট্যালজিয়া, চূড়ান্তের জন্যে ওই ক্ষুধা মানবনাট্যের আবশ্যিক অনুভূতিগুলিকে সম্প্রসারিত করে। কিন্তু নস্ট্যালজিয়ার ওই বাস্তবতা এ কথার ইঙ্গিত দেয় না যে, অবিলম্বে সেটার তৃপ্তিসাধন ঘটবে। কেননা বাসনা ও তার চরিতার্থতার মধ্যেকার দূরত্বের সেতুরচনার মধ্য দিয়ে যদি আমরা পারমেনিডেজ্-এর মতো *এক*-এর বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠিত করি (সেটা যাই হোক না কেন), সেক্ষেত্রে আমরা মনের একটা হাস্যকর বৈপরীত্যের মধ্যে পড়ি, যা সামগ্রিক ঐক্যটাকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। এর মধ্যে দিয়ে তা নিজের স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য প্রমাণ করে, যার সংকল্প সে গ্রহণ করেছিল বলে দাবি তার। এই অন্য পঙ্কিল বৃত্তটা আমাদের আশাগুলিকে শ্বাসরুদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট।

আবারও সেই সমস্ত প্রমাণের সমাহার। এবারও আমি বলব যে, এগুলি নিজেরা আকর্ষণীয় না হলেও তাদের থেকে উদ্ভূত ঘটনাক্রমের মধ্যে নিশ্চয় চিত্তাকর্ষক। আমি

আরও একটা প্রমাণের কথা জানি, যা আমায় বলে যে, মানুষ মরণশীল। কোনও মানুষ নিঃসন্দেহে সেই মনগুলিকে হিসেবের ভেতরে রাখতে পারে, যারা এখান থেকেই তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। আমাদের জ্ঞাত বিষয়ে অবাস্তব কল্পনা ও আমাদের যথার্থ জানার মধ্যে এবং বাস্তব সম্মতি ও কৃত্রিম অজ্ঞতার মধ্যে যে ফাঁক রয়েছে, সেটিকে এই প্রবন্ধে একটি স্থায়ী তথ্যসূত্র হিসেবে গণ্য করা খুবই জরুরি। জাঁকালো অজ্ঞতা আমাদের কিছু বিশিষ্ট ধারণা নিয়ে বাঁচতে সাহায্য করে। যদি এই ধারণাগুলিকে বাজিয়ে দেখতুম, তবে আমাদের জীবনকে তারা বিপর্যস্ত করে ফেলত। মনের এই অলঙ্ঘ্য বৈপরীত্যের সামনে আমরা সেই বিচ্ছেদটাকে আঁকড়ে ধরব, নিজেদের সৃষ্টিসম্ভার থেকেই যা আমাদের বিচ্ছিন্ন করেছে। আশার অচঞ্চল জগতে যতক্ষণ পর্যন্ত মন নিজেকে শান্ত রাখে, ততক্ষণ পর্যন্ত নস্ট্যালজিয়ার ঐক্যে সবকিছুই বিম্বিত ও বিন্যস্ত হয়। যে-ই পৃথিবীটা চলতে শুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে তাতে ফাটল ধরে, হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে। তার অসংখ্য জ্বলন্ত টুকরো জ্ঞানের কাছে উৎসর্গিত হয়। চেনা জগতের উপরিতলের পুনর্নির্মাণ কখনই সমাপ্ত করতে না পারায় অবশ্যই আমরা হতাশা হয়ে পড়ি, কিন্তু তা আমাদের মানসিক শান্তি প্রদান করে। বহু শতাব্দীর গবেষণায়, চিন্তানায়কদের অসংখ্যবার হাল ছেড়ে দেবার পরে আমরা সতর্ক হয়েছি যে, আমাদের সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রেই এটা সত্য। আজকের দিনে কতিপয় পেশাদারী যুক্তিবাদী ছাড়া আমজনতা প্রকৃত জ্ঞান সম্পর্কে হতাশ। যদি মানুষের চিন্তার গূঢ় ইতিহাসটুকুই শুধু কখনও লেখা হতো, তবে তা মানুষের অনবচ্ছিন্ন অনুশোচনা ও তার বন্ধ্যাত্বের ইতিহাস হয়ে উঠত।

আসলে, এ প্রসঙ্গে আমি কেবল এটুকুই বলতে পারি "আমি তা জানতুম।" আমার ভেতরেই আছে আমার মনটা, তাকে আমি অনুভব করি আর বিচার করে বুঝি যে, সে আছে। এই পৃথিবীটাকে আমি স্পর্শ করি এবং একইভাবে বিচার করি যে, এটা আছে। আমার জ্ঞানের সীমা ওই পর্যন্তই, বাকিটা তৈরি করা। কারণ, যাকে আমি নিঃসন্দিগ্ধভাবে অনুসরণ করি, সেই আমি (moi)-কে যদি ধরার চেষ্টা করি, বর্ণনা করার চেষ্টা করি, সারাংশিত করার চেষ্টা করি, তবে ব্যাপারটা হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল গলে পড়ার চেয়ে বাড়তি কিছু হবে না। তার যতগুলি রূপ থাকতে পারে, একে একে সেগুলির সব নক্‌শাই আমি এঁকে ফেলতে পারি। আঁকতে পারি সেগুলিকেও যেগুলি তাকে উৎসর্গীত। আঁকতে পারি সেই তালিম, সেই আদিরূপ, সেই উগ্রতা বা নৈঃশব্দ্য, সেই মহত্ত্ব বা নীচতাগুলিকেও। কিন্তু নতুন কোনও রূপের সংযুক্তি ঘটাতে পারি না। যে হৃদয় শুধুই আমার, তা চিরদিনই আমার কাছে বর্ণনাতীত রয়ে যাবে। আমার অস্তিত্ব বিষয়ে যে নিশ্চয়তা এবং সেই নিশ্চিত দাবির সপক্ষে আমি যে প্রমাণ দাখিল করি—এ দুয়ের ফাঁকটা ভরাট হবে না কখনই। নিজের কাছে চিরদিনই এক অপরিচিতের মতো রয়ে যাব আমি। যুক্তিবিদ্যার মতো মনোবিজ্ঞানেও অনেক সত্য আছে, কিন্তু একমাত্র

সত্য বলে কিছু নেই। সক্রেটিসের "নিজেকে জানো" কথাটি আমাদের পাদ্রীদের "সদ্‌গুণসম্বলিত হও" কথাটির মতো। এগুলি একই সঙ্গে নস্ট্যালজিয়া এবং অজ্ঞতার প্রকাশক। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অর্থহীন চর্চা এগুলো। এগুলো বৈধ। কারণ, এক কথায় এরা মাঝারি।

অনেক গাছ আছে এখানে, আমি জানি তাদের গুঁড়িটা এবরোখেবরো; এখানে আছে জল, তার স্বাদ গ্রহণ করি আমি। ঘাসের এই ঘ্রাণ, রাতের নক্ষত্রমালা, সেই সব সন্ধেবেলা যখন চিত্ত পায় বিশ্রাম—কী করে নাকচ করি এই পৃথিবীকে, যার শক্তি ও গতি অনুভব করি আমি? তবুও পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান আমাকে কোনই আশ্বাস দিতে পারবে না যে, এই পৃথিবীটা আমার। আপনারা আমার কাছে এই পৃথিবীটার বর্ণনা দেন, তার বর্গীকরণ করতে শেখান। এর নিয়মগুলিকে আওড়ান এবং জ্ঞানতৃষ্ণাবশত আমি সত্য বলে সেগুলিকে স্বীকার করে নিই। আপনারা আমাকে শেখান যে, এই আশ্চর্য ও বহুবর্ণ জগৎটা একটি অণুর মধ্যে সংহত হতে পারে এবং সেই অণুটা স্বয়ং ইলেক্‌ট্রনে সংহত হতে পারে। এগুলো বেশ চমৎকার এবং আমি সাগ্রহে আপনার আরও কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। কিন্তু আপনি আমাকে এক অদৃশ্য উপগ্রহীয় আবর্ত-মণ্ডলীর কথা শোনান, যেখানে একটি নিউক্লিয়াসের চারপাশে ইলেকট্রনেরা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে আবর্তিত হয়। আমাকে এই পৃথিবীটাকে একটা ছবির সাহায্যে বোঝান আপনি। তখন আমি বুঝতে পারি যে, একটি কবিতায় রূপান্তরিত হয়েছেন আপনি যেটিকে কখনই আমি বুঝতে পারব না। রাগে ঘেন্নায় যে পিত্তি জ্বলে যাবে, সে সময়ও কি আছে আমার? ইতিমধ্যেই আপনার তত্ত্বগুলিকে পালটে ফেলেছেন আপনি। সুতরাং যে বিজ্ঞানের আমাকে শিক্ষিত করার কথা, তা নিজেই একটা অনুমিতির মধ্যে শেষ হয়ে গেছে, প্রাঞ্জলতার স্থপতি নিজেই রূপক-এ জুড়ে গেছে; তার অনিশ্চয়তা রূপান্তরিত হয়েছে একটি শিল্পকর্মে। তাহলে আমারই বা এত চেষ্টার কী ছিল? বরং এই সমস্ত কোমল পর্বতরেখা, আমার বিধ্বস্ত হৃদয়ের উপরে সন্ধের স্নিগ্ধ করস্পর্শ আমাকে বহু কিছু জানায়। হ্যাঁ, একেবারে আদিতে ফিরেছি আমি, বুঝতে পারছি যে, বিজ্ঞানের সহায়তায় এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলিকেও যদিও বা আমি অধিকার করতে সক্ষম হই, তাদের মাত্রা নির্ণয় করতে পারি, তবু সেই জোরেই পৃথিবীটাকে অধিগম্য করতে পারি না। তাহলে কি আমার উচিত ছিল পৃথিবীর পুরো নক্‌শাটিকে এই আঙুলগুলি দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া? কী জানি! এখনও নিশ্চিত নই। দুটো বিবৃতির কোনও একটিকে বেছে নিতে বলেছিলেন আপনি, যার একটি ছিল স্পষ্ট। কিন্তু তা থেকে আমার কিছু শিক্ষণীয় ছিল না। অন্যটিতে যে অনুমিতিগুলি ছিল, সেগুলি শিক্ষণীয় বলে নিজেদের দাবি করলেও সেখানে স্পষ্টতা ছিল না। নিজের এবং পৃথিবীর কাছে অপরিচিত আমি, সুরক্ষিত এমন একটি চিন্তা দিয়ে, যা নিজেকে প্রতিপন্ন করবার সময়েই নিজেকে বাতিল

করে। সুতরাং কী সেই পরিস্থিতি যেখানে জ্ঞান এবং জীবনকে প্রত্যাখ্যান করেই কেবল আমি শান্তি পেতে পারি, যেখানে জয়ের স্পৃহা আক্রমণ-প্রতিহতকারী দেয়ালে ধাক্কা খায়? ইচ্ছা প্রকাশ করা মানে হলো কূটাভাসগুলিকে মন্থন করা। সমস্ত কিছুই এমনভাবে বিন্যস্ত, যেন চিন্তাশূন্যতার বিষাক্ত শান্তিকে, হৃদয়হীনতাকে, কিংবা ভয়াবহ কৃচ্ছ্রসাধনগুলিকে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে।

সুতরাং আমার বুদ্ধিও আমাকে বোঝায় যে, পৃথিবীটা অ্যাবসার্ড। এর উল্টো দিকে অন্ধ যুক্তিগুলোও এমন চমৎকার ভান করে, যেন সব কিছুই স্পষ্ট। আমি তো নিজেও প্রমাণের জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম এবং চাইছিলুম এটাই ঘটুক। কিন্তু শত শত বছরের সূক্ষ্ম কৌশল এবং অসংখ্য বাগ্মী ও প্রেরণাদাতৃ মানুষের মেধাকেও অগ্রাহ্য করে আমি বলব যে, এগুলো মিথ্যে। এ পৃথিবীতে আমি নিজেই যদি না শান্তির খোঁজ পাই, তবে তা আসলেই নেই। বাস্তবসম্মত বা নৈতিক সার্বজনিক যুক্তি, দৃঢ় সংকল্প—এই বিভিন্ন বিভাগগুলি সমস্ত কিছুকেই ব্যাখ্যা করে—এই ধারণাটি যেকোনও মার্জিত ব্যক্তির কৌতুক-উদ্রেকের পক্ষেই যথেষ্ট। মনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই এদের। গভীর সত্যটিকে এরা নাকচ করে। অথচ সেটিকে শৃঙ্খলিত করাই হতো সঙ্গত। এই দুর্বোধ্য এবং গণ্ডিবদ্ধ বিশ্বে মানুষের নিয়তি এর পরে নিজের ভবিষ্যৎ পন্থাটিকে ঠিক করে নেয়। এক পাল যুক্তিহীন লোক গজিয়ে উঠেছে এবং তারা মানুষকে তার চরম পরিণতি পর্যন্ত ঘিরে রাখছে। মানুষের এই নবার্জিত ও বর্তমানের সমন্বিত আলোকদৃষ্টির (clairvoyance) মধ্যে অ্যাবসার্ডের অনুভূতিটি ক্রমশ প্রত্যক্ষ এবং সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠছে। আমি খুব তাড়াহুড়ো করেই বলেছিলুম যে, পৃথিবীটা অ্যাবসার্ড। পৃথিবীটা নিজে যুক্তিবদ্ধ নয়, এ কথাটা বলাই ভালো। কিন্তু অ্যাবসার্ড হচ্ছে এই যুক্তিহীনতা এবং সুবোধ্যতার জন্যে মানুষের আদিম আকাঙ্ক্ষার একটা পারস্পরিক সংঘাত, যার আহ্বান তার হৃদয়ে অনুরণিত হয়। মানুষের উপরে অ্যাবসার্ড ততোটাই নির্ভরশীল, যতোটা নির্ভরশীল পৃথিবীর উপরে। এই মুহূর্তে একই সুতোয় বাঁধা তারা। ঘৃণা যেভাবে দুটো প্রাণীকে পরস্পর জুড়ে দেয়, সেভাবেই এই সুতোটিও তাদের উভয়কে বেঁধে দিয়েছে। অপরিমেয় এই বিশ্বে যেখানে, আমার অভিযানগুলো সক্রিয়, সেখানে স্পষ্টভাবে এটুকুই আমি উপলব্ধি করতে পারি। একটু বিরতি নেওয়া যাক। যে অ্যাবসার্ডিটি জীবনের সঙ্গে আমার নানা সম্পর্ক রচনা করে, সেটিকে যদি সত্যি বলে আমি ধরে নিই, যে অনুভূতি আমাকে পৃথিবীর নানা ঘটনাবলির সামনে আচ্ছন্ন করে, যদি আমি নিমজ্জিত হই তাতে, বৈজ্ঞানিক অভীক্ষাগুলো যদি ওই স্পষ্টগোচরতাকে আমার উপরে চাপিয়ে দেয়, তাহলে অবশ্যই ওই দৃঢ় প্রত্যয়গুলোর কাছে আমার সর্বস্ব বিসর্জন দেব এবং তাদের রক্ষার্থে যেকোনও ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করব। সর্বোপরি অবশ্যই তাদের শৃঙ্খলায় আমার আচরণগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করব। মানিয়ে নেব তাদের সঙ্গে। তাদের পরবর্তী

পরিস্থিতি অনুযায়ী চলব। এটাই সৌজন্য এবং সে কথাই বলছি আমি। কিন্তু ওই মরুভূমিগুলোয় কোনও চিন্তা জীবিত থাকে কি না, তা জানতে হবে আগেই।

হ্যাঁ, আমার জানা হয়ে গেছে যে, চিন্তাটা ওই মরুভূমিগুলিতে প্রবেশ করেছে। সেখানেই সে রসদ পাবে তার। সেখানেই সে উপলব্ধি করে যে, এতদিন সে অপচ্ছায়াদের (phantom) উপরে নির্ভর করে টিকে ছিল। মানুষের চিন্তার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ থিমকে এটি মান্যতা দেয়।

যে মুহূর্ত থেকে অ্যাবসার্ডিটি স্বীকৃতি পেয়েছে, তা হয়ে উঠেছে তীব্র আবেগ, যা কিনা সব থেকে যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু কেউ নিজের তীব্র আবেগ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে কিনা, সেই আবেগের নিয়মকে মেনে নিতে পারে কি না (নিয়মটা এই যে, যে আবেগ হৃদয়কে উদ্বেলিত করে, যুগপৎ তা তাকে দগ্ধও করতে থাকে) সেটাই হলো মূল প্রশ্ন। যদিও এমন নয় যে, এখন শুধু এই প্রশ্নটাই করব আমরা? এই অভিজ্ঞতার একেবারে কেন্দ্রস্থলে এটি অপেক্ষমান। সময়মতো আমরা ওর কাছে যাব। এখন বরং মরুজাত থিম ও অনুভূতিগুলোকে চিহ্নিত করি। এদের হিসেব নেওয়াটাই যথেষ্ট হবে। এখন তারা সর্বজনবিদিত। যুক্তিহীনের অধিকাররক্ষকেরা সারাক্ষণই ছিল সেখানে। যাকে লাঞ্ছিত চিন্তার ঐতিহ্য বলা চলে, নিজের অস্তিত্বের বিলোপ কখনই সেটি ঘটায় নি। যুক্তিহীনতার সমালোচনা এতবার হয়েছে যে, ফের সে প্রসঙ্গ তোলা অনর্থক। যাই হোক, আমাদের যুগটা স্ববিরোধী এই নীতিগুলিকে ফের রচিত হতে দেখেছে। এরা সর্বতোভাবে বিচারবুদ্ধির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চায়, যেন সত্যি সত্যি তাকে পেছনে ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা যতোটা আশার জলজ্যান্ততার নিদর্শন, ততোটা যুক্তির কার্যকারিতার প্রমাণ নয়। ইতিহাসের চোখে দু'টি ধারার এরকম স্থায়িত্ব মানুষের মৌলিক ভাবাবেগকেই বিশদ করে; তা মানুষের দ্বৈত আকুতির টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হয়। এই আকুতির একটি অভিমুখ ঐক্যের দিকে, অন্যটির অভিমুখ স্পষ্টগোচরতার দিকে। আকুতিটি লোকটিকে চার দেয়ালের সীমায় বন্দি করে ফেলতে পারে।

কিন্তু যুক্তির উপরে এত বেশি হিংস্র আক্রমণ সম্ভবত আমাদের যুগের আগে কখনই ঘটে নি। জরাথুস্টের এই দৃপ্ত ঘোষণা "ঘটনাক্রমে এটাই পৃথিবীর প্রাচীন মহনীয়তা। যখনই আমি ঘোষণা করেছি যে, জগতের উপরে কোনও শাশ্বত ইচ্ছে চাপানো হয় নি, সে মুহূর্তেই তাকে আমি সর্বত্র স্থাপন করেছি" এবং কিয়ের্কেগার্দের[১০] মারাত্মক অসুস্থতা ("যে ব্যাধি মানুষকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যার পরে আর থাকে না কিছুই।") থেকে অ্যাবসার্ড তত্ত্বের নিগূঢ় এবং দুর্বিষহ থিমগুলো পরস্পর

একে অন্যকে অনুসরণ করে চলেছে। অন্ততপক্ষে যুক্তিহীন এবং ধর্মীয় চিন্তার কড়ারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাস্‌পার্স থেকে হাইডেগার, কিয়ের্কেগার্দ থেকে চেস্তভ[১১], অবভাসবাদীদের থেকে স্কেলার[১২] পর্যন্ত যৌক্তিক এবং নৈতিক দৃষ্টিতে সম-মানসিকতার এই দার্শনিকেরা নস্ট্যালজিয়ার সঙ্গে অন্বিত হয়েছেন। কিন্তু নিজেদের চিন্তাপদ্ধতি ও অভিমুখ দিয়ে বিরোধী যুক্তির রাজকীয় পথটিকে রুদ্ধ করে দিয়েছেন, সত্যের প্রত্যক্ষ পথটির পুনরুদ্ধারে বাঁধা সৃষ্টি করেছেন। এখানে আমি ধরে নিচ্ছি যে, এই চিন্তাগুলি জীবন্ত এবং এঁদের সকলেরই পরিচিত। এঁদের লক্ষ্য অতীত কিংবা বর্তমানে যাই হোক না কেন, এঁরা সবাই যাত্রারম্ভ করেছেন সেই বর্ণনাতীত জগৎ থেকে, যেখানে বৈপরীত্য, অন্তর্বিরোধ, উদ্বেগ বা বন্ধ্যাত্ব রাজত্ব করে। এগুলির মধ্যে সমরূপ থিম কোন্‌গুলি নির্দিষ্টভাবে সে আলোচনাই এযাবৎ করা হয়েছে। এঁদের জন্যে এ কথাও বলতে হবে যে, সর্বোপরি, ওই আবিষ্ক্রিয়াগুলি থেকে ওঁরা কোন্ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করতে পেরেছেন, তাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। তা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সিদ্ধান্তগুলি অবশ্যই আলাদাভাবে বিচার্য। তবে এই মুহূর্তে ওঁদের আবিষ্কার ও প্রাথমিক পরীক্ষানিরীক্ষাগুলিই হবে আমাদের একমাত্র মনোযোগের বিষয়। ওঁদের মতৈক্যগুলিকেই প্রধানত চিহ্নিত করতে উদ্যোগ নেব। কেননা, ওঁদের দর্শনের সমালোচনার চেষ্টাটা দুঃসাহসিক হয়ে যাবে। বরং ওঁদের সবার সাধারণ ভাবধারাটিকে অনুভব করা সহজ হবে এবং সেটাই যথেষ্ট।

মানবীয়-পরিস্থিতিগুলিকে বেশ নিরুত্তাপভাবে বিশ্লেষণ করেছেন হাইডেগার[১৩] এবং তাকে *অপমানজনক* ঘোষণা করেছেন। অস্তিত্বের সমস্ত পর্যায়ে পরিব্যাপ্ত একমাত্র বাস্তবতা হলো—"উৎকণ্ঠা" (souci/anxiety)। পৃথিবীর লুপ্ত মানুষ এবং পৃথিবীর নানা রূপের মধ্যে *উৎকণ্ঠা* অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও দ্রুতগামী একটি "উদ্বেগ" (angoisse/anguish)। কিন্তু এই উৎকণ্ঠা যদি স্বয়ং নিজের কার্যকারিতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, তবে তা সেই সহজবোধ্য মানুষটির পক্ষে একটানা গম্ভীর পরিবেশপূর্ণ উদ্বেগে পরিণত হয়, "যার মধ্যে অস্তিত্ব সংহত হয়েছে"। দর্শনের এই অধ্যাপক অবিচলিতভাবে পৃথিবীর চূড়ান্ত বিমূর্ত ভাষায় লিখেছেন যে, "মানব-অস্তিত্বের সসীম এবং পরিমিত বৈশিষ্ট্য মানুষের নিজের থেকেও অনেক বেশি "আদিম"। কান্টের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ শুধু কান্টের "বিশুদ্ধ যুক্তি"র বৈশিষ্ট্য পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। তাঁর বিশ্লেষণের শেষাংশের সঙ্গে এ ব্যাপারটির সমাপতন ঘটানো যেতে পারে—"আর এ পৃথিবী উদ্বিগ্ন মানুষকে কিছু দিতে সক্ষম নয়।" পৃথিবী সম্পর্কে তাঁর যাবতীয় ভাবনার চাইতে এই বিষয়টি নিয়েই তাঁর উদ্বেগ সম্ভবত সব থেকে বেশি এবং তাই কেবল এ নিয়েই কথা বলেন তিনি। এর নানা দিকগুলিকে চিহ্নিত করেন একঘেয়েমি: যখন সাধারণ মানুষ নিজের ভেতরে একে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায়, নিস্তেজ করে ফেলতে চায়। আতঙ্ক, মৃত্যু নিয়ে যখন মানুষ ভাবতে থাকে, তখন সে অ্যাবসার্ড থেকে চৈতন্যকে পৃথক করে না।

মৃত্যুর চৈতন্যই হল উদ্বেগের আহ্বান এবং "অস্তিত্ব্ এর পরে চৈতন্যের মধ্যস্থায় এত্তেলা পাঠায় তার।" এ কণ্ঠ উদ্বেগেরই এবং অস্তিত্বকে অনুরোধ করে "নিজের ক্ষতি থেকে তাকে অজ্ঞাতনামা নক্ষত্রের দিকে ফিরে যেতে"। তাঁর মতে ঘুমিয়ে না পড়ে মানুষকে শেষ অবধি জেগে থাকতে হবে। এই অ্যাবসার্ড জগতে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন এবং এর বায়বীয় বৈশিষ্ট্যটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভগ্নস্তূপগুলির ভেতর দিয়েই নিজের পথ খুঁজে চলেন তিনি।

জাস্‌পার্স যাবতীয় জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology) সম্পর্কেই হতাশ। কারণ, তাঁর মতে আমরা সবাই নিজেদের "নবীনত্ব" হারিয়ে ফেলেছি। তিনি জানেন যে, আমরা এমন কিছু অর্জন করতে পারব না, যা অবভাসের মারাত্মক খেলায় জয় হাসিল করতে পারবে। তিনি জানেন, মনের পরিণতি ব্যর্থতায়। ইতিহাসের আধ্যাত্মিক অভিযানগুলিকে তিনি অত্যন্ত ঝামেলায় ফেলেন এবং প্রতিটি প্রকরণ-পদ্ধতিকে নির্দয়ভাবে প্রকাশ করে দেন, আবেশের যে ঘোর সব কিছুকে আড়াল করত, যে উপদেশমালা গোপন করত না কিছুই। এই রুক্ষ্ম পৃথিবীতে, যেখানে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত, চিরস্থায়ী শূন্যতা যেখানে একমাত্র বাস্তবতা এবং শুশ্রূষাহীন হতাশা একমাত্র মনোভঙ্গি, সেখানে তিনি আরিয়ানের[১৪] পরম্পরাকে আবারও ফিরিয়ে আনতে চান, যা দিব্য রহস্যের দিকে চালিত করে মানুষকে।

চেস্তভ তাঁর দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর কিন্তু প্রশংসনীয় একটি গ্রন্থে অবিরতভাবে একই সত্যে উপনীত হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। অক্লান্তভাবে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, সুকঠোর পদ্ধতি, শ্রেষ্ঠ সার্বজনিক যুক্তিবাদ চিরকালই মানুষের চিন্তার যুক্তিহীনতার কাছে বাধা পায়। যুক্তির হানি ঘটায় এমন কোনও ব্যঙ্গাত্মক ঘটনা বা হাস্যকর অসঙ্গতি নেই, যা তাঁর সমালোচনা থেকে রেহাই পেয়েছে। তাঁর আগ্রহ জাগানোর ব্যতিক্রমী জায়গা একটাই—হৃদয় বা বুদ্ধির কাহিনি। অভিশপ্ত মানুষের দস্তেয়ভস্কীয় অভিজ্ঞতার পথ ধরে নীৎশীয় মনের ক্ষিপ্ত অভিযান, হ্যামলেটের অমঙ্গলকামনা, কিংবা ইবসেনের তিক্ত অভিজাততন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি পথ খুঁজেই চলেন, আমাদের দীপিত করেন এবং শুশ্রূষাহীনতার বিরুদ্ধে মানবীয় বিদ্রোহকে বড় করে দেখান। যুক্তির জন্যে যুক্তিকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং কতিপয় সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে এক বিবর্ণ মরুপ্রান্তর ধরে এগিয়ে যান, যেখানে সমস্ত ধ্রুব সত্য প্রস্তরীভূত হয়েছে।

সবার মধ্যে সম্ভবত কিয়ের্কেগার্দ-ই আকর্ষণীয়। কারণ, অ্যাবসার্ডকে আবিষ্কার না করেই জীবনের অনেকটা সময় তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "*কঠোরতম নীরবতা মুখ বন্ধ রাখা নয়, কথা বলে যাওয়া।*" এ কথায় শুরুতেই প্রতিপন্ন হয়ে যায় যে, কোনও সত্যই ধ্রুব নয় এবং কোনও সত্যই আমাদের অস্তিত্বকে আনন্দদায়ক করে

তুলতে পারে না। কারণ, অসম্ভবপরতার বৈশিষ্ট্যটি অস্তিত্বের মধ্যেই বিদ্যমান। জ্ঞান-জগতের ডন জুয়ান তিনি, কতই না ছদ্মনাম তিনি গ্রহণ করেছেন, সৃষ্টি করেছেন কতই না স্ববিরোধিতার, লিখেছেন *দিসক্যুর এদিফিওত (উপদেশমূলক প্রবন্ধ)* নামে বই, একই সঙ্গে লিখেছেন অসূয়ক (cynique/cynic) আধ্যাত্মিকতার নির্দেশগ্রন্থ *ল্য জুর্নাল দ্য সেদুক্ত্যর* (এক প্রলোভকের জার্নাল), আর প্রত্যাখ্যান করেছেন সান্ত্বনা, নৈতিকতা এবং সমস্ত প্রশান্তির নীতিগুলিকে। কন্টকবিদ্ধ হয়েছেন হৃদয়ে কিন্তু তার যন্ত্রণার উপশমে যত্নবান হন নি। বরং, হতাশাভরা আনন্দের মধ্যে অস্তিত্বের ক্রুশবিদ্ধ হবার তৃপ্তিটিকে জাগিয়ে তুলেছেন। অস্তিত্বের নির্মাণ করেছেন পর্বে পর্বে—প্রাঞ্জলতা, প্রত্যাখ্যান এবং হালকা রসিকতার মধ্য দিয়ে। এই প্রতিটি পর্ব যেন এক একটি আসুরিক বর্গ। তাঁর মুখটি একাধারে কোমল ও বিদ্রূপদীপ্ত। হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত আর্তনাদের অনুগামী এই ঘূর্ণি নাচগুলি। এগুলোই অ্যাবসার্ড আবেগ। অ্যাবসার্ড আবেগ সেই বাস্তবতাকেই গ্রহণ করে, যা সেকেলে। আর সেই আধ্যাত্মিক অভিযান, যা কিয়ের্কেগার্দকে তাঁর মহার্ঘ কলঙ্কগুলোর দিকে চালিত করেছিল, তাঁর স্বীয় বৃত্তেরই অভিজ্ঞতার গ্রন্থিলতা থেকে শুরু হয়ে নির্বাসিত হয়েছিল এর আদি অসম্বদ্ধতায়।

সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ক্ষেত্রে, প্রণালীগত দিক থেকে, হুর্সেল[১৫] এবং অবভাসবাদীরা আতিশয্যবশত পৃথিবীটিকে তার স্বকীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে পুনর্বহাল করেছেন এবং যুক্তির উত্তরণ ক্ষমতাকে অস্বীকার করেছেন। আধ্যাত্মিক জগৎটি তাঁদের মাধ্যমে যারপরনাই ঋদ্ধ হয়েছে। গোলাপের পাপড়ি, পাথরের মাইল-ফলক কিংবা মানুষের করপল্লব প্রেম, বাসনা বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মতোই গুরুত্বপূর্ণ। মুখ্য বিধিনিয়মের ছদ্মবেশে বুদ্ধি পরিচিতের সঙ্গে ঐক্য বা সাদৃশ্যবন্ধন স্থগিত করে দেয়। বুদ্ধি মানে হচ্ছে বার বার কোনও বিষয়কে লক্ষ্য করা, একাগ্র হওয়া, চৈতন্যে কূটস্থ হওয়া। এ হচ্ছে প্রুস্তীয় রীতিতে প্রতিটি ধ্যানধারণা ও প্রতিটি দৃশ্যের সময়ানুগ রূপান্তর ঘটানো। পরম চৈতন্যই ভাবনাকে যাথার্থ্য দান করে। যদিও কিয়ের্কেগার্দ বা চেস্তভের থেকে হুসের্ল তাঁর ভাবনাচিন্তায় অনেক বেশি সদর্থক, কিন্তু যুক্তির ধ্রুপদী পদ্ধতিকে তিনি নাকচ করেছেন, আশাকে নিরস্ত করেছেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলির পূর্ণ বহুপ্রসূতাকে (যার ঐশ্বর্যের মধ্যে কিছু অমানবিক উপাদানও রয়েছে) অন্তর্দৃষ্টি এবং হৃদয়ের সামনে খুলে দিয়েছেন। এই পথগুলো হয় বিভিন্ন বিজ্ঞানের দিকে গেছে, নতুবা কোথাও যায় নি। মোট কথা এই যে, এখানে গন্তব্যের চেয়ে পথটাই বড়। এখানে যা প্রাসঙ্গিক, তা হলো "বোঝার মানসিকতা" এবং কোনও সান্ত্বনা নয়। আবারও বলছি, নিদেন পক্ষে, শুরুতেই।

এঁদের মনের মৌলিক আন্তঃসম্পর্কগুলিকে কীভাবে কেউ অনুভব না করে পারবে! কীভাবে কেউ খেয়াল করতে অপারগ হবে যে, এঁরা সম্মিলিত হয়েছিলেন এমন একটি বিশেষ অনুকূল ও তিক্ততার আবহে, যেখানে আশার কোনও অবকাশই ছিল না আর?

হয় সবেরই ব্যাখ্যা চাই, নইলে একটিরও নয়। হৃদয়ের কান্নার সামনে যুক্তি অসহায়। এই সব জরুরি তলবে মন জেগে ওঠে। কিন্তু কিছু অসঙ্গতি এবং আজগুবি কাণ্ড ছাড়া কিছুই তার চোখে পড়ে না। আমি যা বুঝিনা, তা আজগুবি। পৃথিবীটা এই সব যুক্তিহীনতা দিয়ে ভরা। যে পৃথিবীটার কোনও অর্থই আমার কাছে স্পষ্ট হয় না, সে পৃথিবী স্বয়ং একটি বিপুল যুক্তিহীনতা ছাড়া কিছু নয়। কেউ যদি একবারও বলতেন—"এ ব্যাপারটা অন্তত পরিষ্কার", তাহলেই সব রক্ষে পেত। কিন্তু এঁরা পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন এ ঘোষণা করতে যে, কোনও কিছুই স্পষ্ট নয়, সব কিছুই বিশৃঙ্খল। চার দেয়ালে বন্দি হয়ে সবাই আছেন নিজেদের বোধবুদ্ধি এবং বাঁধাধরা ধ্যানধারণা নিয়ে।

এই অভিজ্ঞতাগুলো একই সুরে বাঁধা এবং একে অন্যের অনুগামী। মন যখন তার গণ্ডিটাকে পেরিয়ে যায়, তখন অবশ্যই নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে এবং যা সিদ্ধান্ত নেবার নিয়ে নেয়। এটাই আত্মহত্যার ক্ষেত্র, এখানেই সে তার প্রতিক্রিয়াটি জানায়। কিন্তু আমি আমার গবেষণাটিকে উল্টো দিক থেকে শুরু করতে চাই। বৌদ্ধিক অভিযান দিয়ে শুরু করে আমার যাত্রাটিকে শেষ করতে চাই আমাদের প্রতিদিনের ভূমিকাগুলির মধ্যে। এখন যে অভিজ্ঞতাগুলিকে মনে পড়ছে, সেগুলি সবই উষর-ভূমির, কিছুতেই তাদের বর্জন করা যাচ্ছে না। সুতরাং তাদের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত, সেটুকু তো জানতেই হবে। আর সেটা জানতে গিয়েই মানুষ যুক্তিহীনতার সামনে পড়ে। নিজের মধ্যে সে সুখ এবং যুক্তিবোধের টান অনুভব করে। মানুষের এই চাহিদা এবং পৃথিবীর যুক্তিহীন নৈঃশব্দ্যের এই পারস্পরিক সংঘাত হতেই অ্যাবসার্ড উদ্ভূত হয়। এই অ্যাবসার্ডকে ভুললে চলবে না। অ্যাবসার্ডকে আঁকড়ে ধরতে হবে, কারণ, জীবনের যা কিছু সবই অ্যাবসার্ডের উপরে নির্ভরশীল। যুক্তিহীনতা, মানবিক নস্ট্যালজিয়া এবং এ দুয়ের সঙ্ঘর্ষজাত অ্যাবসার্ড—নাটকের তিনটি চরিত্র এরাই এবং নাটকটির যবনিকা পতন হবে সেই যুক্তিগুলির মধ্যে দিয়ে, যেগুলি অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

— — — —

## LE SUICIDE PHILOSOPHIQUE

# দার্শনিক আত্মহত্যা

অ্যাবসার্ডের অনুভূতি সেভাবে অ্যাবসার্ডের ধারণার সঙ্গে অভিন্ন নয়, তা অ্যাবসার্ডের ধারণাকে একটা ভিত্তি দান করে; ব্যস, ঐটুকুই। জগৎসংসার নিয়ে অনুভূতিটি যখন কোনও রায় দেয়, সেই সংক্ষিপ্ত মূহূর্তটি ছাড়া বাকি সময়ে অ্যাবসার্ডের অনুভূতি অ্যাবসার্ডের ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অতঃপর এই অনুভূতিটির আরও বিস্তৃত হওয়ায় সম্ভাবনা থাকে। এই অনুভূতিটি জীবন্ত। তার মানে হলো, এই অনুভূতিটি হয় লুপ্ত হবে অথবা প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে। এখানে আমাদের জড়ো করা থিমগুলির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে। কিন্তু এর বাইরেও এখানে আমাকে যা টানে, তা কাজ, মন বা সেই সমালোচনা নয়, যা অন্য কোনও অবস্থান ও আঙ্গিককে দাবি করে। বরং আমাকে টানে ঐক্যের সেই উদ্ভাবনটি, যা ওই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে রয়েছে। আমাদের মনের ভেতরে এতটা ভিন্নতার সঞ্চার হয়তবা কখনই ঘটে নি। আর এর পরেও যে আধ্যাত্মিক স্তরগুলির মধ্যে আমাদের মনগুলো নিজেদের হারিয়ে ফেলে, আমরা তাদের অভিন্ন মনে করি। জ্ঞানের এলাকাগুলি এরকম বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাদের যে চিৎকার পরিক্রমাটি সাঙ্গ করে ফেলে, তা এ পথে একইভাবে অনুরণিত হতে থাকে। এইমাত্র যে চিন্তাবিদদের কথা আমরা বললুম, অবশ্যই তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা সমতা আছে। বলা যায়, সেই দৃষ্টিভঙ্গিটি বিপজ্জনক এবং তার পর্যালোচনা শব্দের খেলাতেই শেষ হয়ে যায় না। ওই দমবন্ধ করা আকাশের নিচেই কাউকে না কাউকে বাস করতে হয়, নয়ত স্থানটিকে ত্যাগ করে বিদায় নিতে হয়। সুতরাং এ মুহূর্তে এ অনুসন্ধানটি চালানো গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রথমত, কীভাবে মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় এবং দ্বিতীয়ত, কেন কিছু মানুষ পৃথিবীতেই থেকে যায়। আত্মহত্যার সমস্যা এবং অস্তিত্ববাদী দর্শনের সিদ্ধান্তসম্পর্কিত সম্ভাব্য ঔৎসুক্যটিকে আমি এভাবেই সংজ্ঞায়িত করি।

কিন্তু প্রথমেই সিধে রাস্তায় না গিয়ে, আমি একটু ঘুরপথ ধরতে চাই। এত দিন আমরা অ্যাবসার্ডকে বাইরের দিক থেকে পাঁচিল দিয়ে রেখেছিলুম। অবশ্যই অনেকে অবাক হতে পারে যে, এতে অ্যাবসার্ড ধারণাটা কতটা পরিষ্কার হবে। তাই বিষয়টিকে

সরাসরি বিশ্লেষণ করে তারা একদিকে এর মানে খোঁজার চেষ্টা করতে পারে, অন্যদিকে এর সঙ্গে জড়িত ফলাফলগুলোকে।

নির্দোষ কাউকে যদি কোনও উৎকট কুকর্মের দায়ে অভিযুক্ত করি, যদি কোনও সজ্জন সম্পর্কে বলি যে, সে তার সহোদরার প্রতি প্রলুব্ধ, তাহলে সেই লোকটি বলবে যে, সেটা অ্যাবসার্ড। লোকটির যুক্তিসঙ্গত ক্ষোভের, ভর্ৎসনার একটা কৌতুককর দিক থাকবে। কিন্তু এর পেছনে একটা মৌলিক যুক্তিও কাজ করবে। নিজের যুক্তির মাধ্যমে সৎ লোকটি দুটি প্রসঙ্গের পারস্পরিক বৈপরীত্যকে প্রকাশ করবে। প্রসঙ্গ দুটির একটি হলো গিয়ে আমার করা অভিযোগটি এবং অন্যটি হচ্ছে ওই লোকটির জীবন থেকে পাওয়া নৈতিকতাটি। "এটা অ্যাবসার্ড" অর্থাৎ "এটা অসম্ভব"। কিন্তু "এটা পরস্পরবিরোধীও" বটে। যদি দেখি যে, একটিমাত্র তরবারি দিয়েই অনেকগুলি মেশিনগানের গুলিকে কেউ প্রতিহত করার চেষ্টা করছে, তবে তার ওই আচরণকে আমি অ্যাবসার্ডই বিবেচনা করব। কিন্তু এটা একান্তভাবেই তার লক্ষ্য এবং বাস্তবতার অসমঞ্জসতা। তার সত্যকারের ক্ষমতা এবং নিজের লক্ষ্যের একটা বিরুদ্ধতা হিসেবেই একে দেখব আমি। এক্ষেত্রে আমরাও একটি রায়কে অ্যাবসার্ড বিবেচনা করব, যখন আপাতদৃষ্টিতে ঘোষিত কোনও একটি রায়কে আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিস্থাপন করব। আর এভাবেই অ্যাবসার্ডের নির্দেশ পাই আমরা, যখন কেউ যৌক্তিক বাস্তবতার সাহায্যে এভাবে একগুচ্ছ যুক্তিকে তুলনার মধ্যে নিয়ে আসে। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই, সরলতম থেকে জটিলতমে অ্যাবসার্ডিটির বিশালতা উক্ত দুই প্রতিমানের মধ্যে সমমাত্রিক দূরত্বে বিন্যস্ত হবে। বিয়ে, চ্যালেঞ্জ, তিক্ততা, নীরবতা, যুদ্ধ এমনকি শান্তি-চুক্তিও অ্যাবসার্ড হয়ে থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পারস্পরিক তুলনা থেকে অ্যাবসার্ডিটি উদ্ভূত হয়। তাই আমি নিজের যুক্তির সমর্থনে বলতে চাই যে, অ্যাবসার্ডিটির অনুভূতি কোনও ঘটনা বা ধারণার সাধারণ নিরীক্ষা হতে উদ্ভূত হয় না। তা উদ্ভূত হয় একটি বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ ধরনের বাস্তবতার তুলনা থেকে। উদ্ভূত হয় একটা ক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়াকে ছাপিয়ে যায় যে পৃথিবী এ দুয়ের মধ্যবর্তিতা থেকে। অ্যাবসার্ড হলো মূলত এক বিচ্ছেদ। উক্ত তুলনামূলক উপাদানগুলির কোনওটিতেই তা থাকে না, উৎপন্ন হয় তাদের সঙ্ঘর্ষ থেকে।

অতএব, এই বৌদ্ধিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমি বলতে পারি যে, অ্যাবসার্ড না থাকে মানুষের (এ উপমাটির আদৌ যদি কোনও মানে থেকে থাকে) মধ্যে, না জগতের মধ্যে; থাকে এ দুয়ের যৌথ উপস্থিতিতে। সাময়িকভাবে এটাই একমাত্র বন্ধন, যা তাদের অন্বিত করে। যখন প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নিজের মতটিকে স্থাপন করতে চাই, তখন ঠিকই জানি, মানুষ কী চায়। জগৎটা তাকে কী দেয় তাও জানি। কী দিয়ে তাদের সম্পর্ক রচিত হয়, সেটাই বলছি এখন। এ নিয়ে গভীর অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন।

একটি মাত্র সত্যই একজন অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে যথেষ্ট। পরের ধাপগুলিকে সেখান থেকেই অতি সহজে সে বার করে নিতে পারবে।

এর ঠিক পরের পরিণামটিও একটি পদ্ধতি স্বরূপ (regle de methode/rule of method)। এভাবে যে অদ্ভুত ত্রিত্বটিকে দৃষ্টিগোচর করা হয়, তা অবশ্যই একটি চমকপ্রদ উদ্ভাবন নয়। কিন্তু তা অভিজ্ঞতার উপাদানগুলিকে অনুকরণ করে। তার মধ্যে অন্তহীন সরলতা এবং অন্তহীন জটিলতা নিহিত রয়েছে। এর প্রথম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যই হলো এই যে, তা অবিভাজ্য। এর একটি সম্পর্ককে ধ্বংস করার অর্থ তার পুরোটাকেই ধ্বংস করা। মানবনিরপেক্ষ কোনও অ্যাবসার্ড থাকতে পারে না। অতএব আর সব কিছুর মতোই মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই অ্যাবসার্ডের সমাপ্তি। কিন্তু একইভাবে এই পৃথিবীর বাইরেও কোনও অ্যাবসার্ড থাকতে পারে না। এই প্রাথমিক মানদণ্ডেই অ্যাবসার্ডের তত্ত্বটিকে আমি প্রয়োজনীয় মনে করি এবং আমার সত্যের প্রাথমিক রূপ হিসেবে তা পরিগণিত হয়। আগে যে পদ্ধতিটির কথা বলছি, তা এখানেও লক্ষ্য করা যায়। যাকে নিজেই সত্য বলে মানি, তাকে তো আমাকেই রক্ষা করতে হবে। কোনও সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হলে, অন্তত পক্ষে নিজের সমাধানসূত্রেই সমস্যাটির কোনও একটি অংশকে উড়িয়ে দেব। আমার কাছে অ্যাবসার্ডই হলো একমাত্র উপাত্ত (donnée/datum)। মোট কথা, আমার অনুসন্ধানের প্রথম এবং একমাত্র শর্ত হলো, যে বিষয়গুলি আমাকে বিধ্বস্ত করে সেগুলিকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং তারপরে তার ভেতরে যেটাকে প্রয়োজনীয় মনে করি সেগুলিকে সম্মান দেখাতে হবে। একটু আগেই একে আমি সংঘাত এবং বিরতিহীন সংগ্রাম হিসেবে বর্ণনা করেছি।

এই অ্যাবসার্ড যুক্তিকে উপসংহার পর্যন্ত প্রসারিত করে, আমাকে মেনে নিতেই হবে যে, ওই সংগ্রাম পরিপূর্ণ এক আশাহীনতার (এর সঙ্গে হতাশার কোনও সম্পর্ক নেই), এক অনবচ্ছিন্ন প্রত্যাখ্যানের (এর সঙ্গে কৃচ্ছ্রসাধনকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না), এক অতন্দ্র অপরিতৃপ্তির (একে অপরিণত বিক্ষোভের সঙ্গে তুলনা করা সঙ্গত হবে না) ইঙ্গিত করে। যা কিছু ধ্বংসাত্মক, চাতুর্যপূর্ণ, কিংবা এই জরুরি পরিস্থিতিগুলোর বিতাড়ক, তা অ্যাবসার্ডকে বিনষ্ট করে দেয় এবং সম্ভাব্য নতুন কোনও প্রস্তাবের মূল্য কমিয়ে দেয়। বস্তুত, স্বীকৃতি অর্জন না করা পর্যন্ত অ্যাবসার্ড অর্থপূর্ণ।

স্পষ্টতই প্রতীয়মান একটা তথ্য রয়েছে, যাকে সম্পূর্ণভাবেই নৈতিক বলে মনে হয়। আর তা হলো এই যে, মানুষ সব সময়ই তার নিজের সত্যের শিকার। একবার সত্যগুলিকে মেনে নিলে সে কখনই আর তাদের নিগড়মুক্ত হতে পারে না। সত্যের মূল্য চোকাতেই হয়। যে মানুষ অ্যাবসার্ড সম্পর্কে সচেতন, সে চিরদিনের মতো তাতে

বন্দি হয়ে গেছে। যে মানুষ সম্পূর্ণভাবে আশাহত এবং নিজের আশাহীনতার ব্যাপারে সচেতন, তার ভবিষ্যৎ থাকে না। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সেটা এতটাই স্বাভাবিক যে, তার উচিত, সে যে জগতের স্রষ্টা, সেই জগৎ থেকে তার নিজের বেরিয়ে আসার চেষ্টা করা। এর আগে যা ঘটেছে, তা এই কূটাভাসের (paradoxe) কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ। যুক্তিবাদের সমালোচক থেকে শুরু করে অনেক মানুষই অ্যাবসার্ড পরিবেশকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে তারা যেভাবে তাদের ফলাফল ব্যাখ্যা করেছেন, সেই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের থেকে বেশি শিক্ষামূলক আর কিছু হতে পারে না।

অস্তিত্ত্ববাদী দর্শনের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে আমি দেখেছি যে, সবাই পালিয়ে যাওয়ার কথাই বলে। অ্যাবসার্ড থেকে যাত্রা শুরু করে ন্যায়ের ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে কিছু উদ্ভট যুক্তিবিচারের মাধ্যমে মানববৃত্তের একটি আবদ্ধ জগতে যারা তাদের ধ্বংস করে, তাদেরই উপরে দেবত্ব আরোপ করে তারা এবং যা তাদের নিঃস্ব করে দেয়, সেখানে আশার কারণ খুঁজে পায়। চাপিয়ে দেওয়া এই আশার ব্যাপারটা পুরোপুরি ধর্মীয়। এটিকে বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিচার করা দরকার।

চেস্তভ এবং কিয়েৰ্কেগার্দের কিছু প্রিয় বিষয়কে দৃষ্টান্ত হিসেবে একটুখানি বিশ্লেষণ করব এখানে। কিন্তু আমাদের সামনে জাস্‌পার্স সমাগত হবেন কেরিক্যাচারের ভঙ্গিতে, যা তাঁর বিশিষ্ট প্রবণতার একটি উদাহরণ। ফলে, তার বাকি দিকগুলিও স্পষ্টতর হবে। তিনি ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছেন অতীন্দ্রিয়কে উপলব্ধি করতে গিয়ে, অসমর্থ হয়ে পড়েছেন অভিজ্ঞতার গভীরে খনন করতে গিয়ে এবং সচেতন হয়ে উঠেছেন ব্যর্থতার দ্বারা বিস্রস্ত জগৎ বিষয়ে। তিনি কি আরও এগোবেন, না কি এই ব্যর্থতা থেকেই কোনও একটা সিদ্ধান্ত টানবেন? নতুন কোনও কথা তিনি বলেন নি। অভিজ্ঞতার মধ্যে নতুন কিছুই তিনি খুঁজে পান নি। তবে নিজের বন্ধ্যাত্বের স্বীকারোক্তি আছে এবং সেখানে এমন কোনও জায়গা নেই, যেখান হতে কোনও সন্তোষজনক সূত্র মেলে। যদিও তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে, যুক্তিহীনের মতো আচমকা দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি অতীন্দ্রিয়ের কথা বলেছেন এবং জীবনের অতিমানবিক তাৎপর্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই কথাগুলোই তার প্রমাণ, "সম্ভাব্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণগুলি ছাড়িয়ে ব্যর্থতা কি অতীন্দ্রিয়ের অনুপস্থিতির চেয়ে তার অস্তিত্বকেই প্রকাশ করে না?" ওই অস্তিত্ব মানুষের অন্ধবিশ্বাসের আনুষ্ঠানিক আচারের ভিতর দিয়ে সব কিছুর ব্যাখ্যা দেয়, "সাধারণ এবং বিশেষের অচিন্ত্যনীয় ঐক্যের" বিশ্লেষণ করে। অ্যাবসার্ড এভাবে হয়ে ওঠে ঈশ্বর (সম্প্রচারের ভাষা মোতাবেক) এবং হৃদয়ঙ্গম করবার এই অক্ষমতাই হয়ে ওঠে অস্তিত্ব, যা সমস্ত কিছুকেই আলোকিত করে তোলে। এ সিদ্ধান্তটি যুক্তিপরম্পরা-বাহিত নয়। এটাকে আমি বলতে পারি "অতীন্দ্রিয়তা (transcendance)"। জাসপার্সের স্ববিরোধী গোঁ হিসেবেও একে গণ্য করা যেতে পারে, গণ্য করা যেতে পারে ধারণাতীত

অতীন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা অর্জনার্থে নিবেদিত তাঁর অসীম ধৈর্য হিসেবে। কারণ, অনুমান যত ক্ষণস্থায়ী হবে, তার সংজ্ঞাও সম্ভবত ততবেশি শূন্যগর্ভ হবে। ফলে জাস্‌পার্সের কাছে অতীন্দ্রিয়ও অত্যন্ত বাস্তব হয়ে ওঠে। অতীন্দ্রিয়কে প্রতিপন্ন করতে যে আবেগ তিনি প্রয়োগ করেছেন, সেটি একটি আনুপাতিক বৈসাদৃশ্যের ভিতরে অবস্থান করছে। বিশ্লেষণের ক্ষমতা এবং পৃথিবীর যুক্তিহীনতা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে এই আনুপাতিক বৈসাদৃশ্যটি বিরাজ করছে। এ থেকেই প্রতিভাত হচ্ছে যে, জাস্‌পার্স যুক্তির প্রচলিত রূপগুলিকে যত বেশি তিক্ততার সঙ্গে বাতিল করার চেষ্টা করছেন, ততই চরমভাবে তিনি পৃথিবীটাকে বিশ্লেষণ করবেন। এই বিনম্র চিন্তার উদ্‌গাতা তাঁর চিন্তার অন্তিমে পৌঁছে লক্ষ্য করবেন যে, তাঁর পুনরুজ্জীবনের ধারণাটি তত্ত্বের অন্তর্নিহিত গভীরতাতেই আঁটকে গেছে।

অতীন্দ্রিয় ভাবনা এই প্রকৌশলগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছে। মনের আর পাঁচটা প্রবণতার মতোই তারা যুক্তিসম্মত। কিন্তু এই মুহূর্তে এমন একটা ভাব করছি, যেন বিশেষ কোনও সমস্যা নিয়ে আমি গভীর ভাবিত। এই প্রবণতাটির সাধারণ বা শিক্ষাগত মূল্য আগে থেকেই বিচার না করে আমি সরলভাবে এটা বিবেচনা করতে চাই যে, আমি যে অবস্থার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করেছি তার সমাধান এখানে মিলবে কি না, অথবা যে দ্বন্দ্বগুলি আমাকে পীড়িত করে সেগুলির যোগ্য সমাধান এরা করে উঠতে পারবে কিনা। সুতরাং আমি চেস্তভের কাছেই ফিরছি। তাঁর একটি আকর্ষণীয় উক্তির কথা পেড়েছেন এক ভাষ্যকার

তিনি (চেস্তভ) বলেছিলেন, "নিখুঁত সমাধান একমাত্র সেখানেই মেলে, যেখানে মানুষের বিচারবুদ্ধি কোনও মীমাংসায় পৌঁছতে পারে না। নইলে আমাদের কী প্রয়োজন হতো ঈশ্বরের? অসম্ভবকে লাভ করার জন্যেই আমরা কেবল ঈশ্বরকে খুঁজি। যা সম্ভবপর তার জন্যে মানুষ নিজেই যথেষ্ট।" যদি চেস্তোভিয়ান দর্শন বলে কোনও কিছু থাকে, তাহলে আমি বলব যে, এভাবেই সেটা সারাংশিত হয়েছে। কারণ, চেস্তভ তাঁর আবেগভরা সিদ্ধান্তের মধ্যে সব ধরনের অস্তিত্বের মৌলিক অ্যাবসার্ডিটিকে আবিষ্কার করেছেন। তিনি বলেন নি—"এটা অ্যাবসার্ড", বরং বলেছেন "এটা ঈশ্বর আমাদের কোনই যুক্তিবাদী ধ্যানধারণার সঙ্গে তাঁর যোগ না থাকলেও তাঁর উপরে আস্থা নিশ্চয়ই রাখব আমরা।" যাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ না ঘটে, তাই এই রুশ দার্শনিক এমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে, এই ঈশ্বর হয়ত বিদ্বেষে ভরা এবং হিংসুক, দুর্বোধ্য ও স্ববিরোধী। তবে ঈশ্বরের মুখে যত বেশি ঘৃণার বাড়াবাড়ি ততবেশি তাঁর ক্ষমতার প্রকাশ। তাঁর অসংলগ্নতাতেই তাঁর মহত্ত্ব। অমানবিকতাতেই তাঁর প্রমাণ। মানুষ তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং এই লম্ফনের মাধ্যমে যৌক্তিক বিভ্রম থেকে মুক্ত করবে নিজেকে। সুতরাং অ্যাবসার্ডকে স্বীকার করার ব্যাপারটা চেস্তভের কাছে যুগপৎ অ্যাবসার্ড-ই। এ নিয়ে

সচেতন হওয়া মানে, একে মেনে নেওয়া। আর চেস্তভের চিন্তার সার্বিক যুক্তিধৃত প্রয়াসই হলো অ্যাবসার্ডকে বাইরে বার করে আনা, যাতে তৎসংশ্লিষ্ট বিপুল আশারও বহির্প্রকাশ ঘটতে পারে। আমি আবারও বলতে চাই যে, এটি একটি সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু এখানে আমাকে বিশেষ একটি সমস্যা ও তার নানা ফলাফল নিয়ে কথা বলতেই হবে। কোনও একটা ভাবনার আবেগ বা বিশ্বাসের দৃষ্টান্তকে পরীক্ষা করার মতো উপাদান আমার কাছে কিছু নেই। সে কাজের জন্যে আমার গোটা জীবনটাই পড়ে আছে। আমি জানি যে, যুক্তিবাদী মানুষ চেস্তভের ভাবগতিকে বিরক্তবোধ করেন। কিন্তু আমি এও বুঝি যে, চেস্তভ একজন যুক্তিবাদীর চেয়েও খাঁটি, এবং আমি শুধু এইটুকুই জানতে চাই যে, অ্যাবসার্ডের অনুশাসনের প্রতি এখনও তিনি বিশ্বস্ত রয়েছেন কিনা।

এবারে, অ্যাবসার্ডকে যদি আশার বিপ্রতীপ রূপে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে, চেস্তভের ক্ষেত্রে অস্তিত্ববাদী ভাবনা পূর্বনির্ধারিত। কিন্তু নিজের দায় এড়াতেই বিষয়টিকে তিনি প্রমাণ করে দেখান। ভাবনার এরকম সূক্ষ্মতা ম্যাজিকের আবেগে-ভরা ভেলকির মতো। অন্যত্র চেস্তভ যখন প্রচলিত নীতিবোধ এবং যুক্তির বিপ্রতীপে অ্যাবসার্ডকে স্থাপন করেন, তখন সেটাকে তিনি সত্য এবং মোক্ষলাভ রূপে অভিহিত করেন। সুতরাং অ্যাবসার্ডের এই ধারণায় একটা প্রাথমিক স্বীকৃতি আছে, যা চেস্তভ মঞ্জুর করেছেন। যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, এই ধারণার যাবতীয় শক্তিগুলো আমাদের প্রাথমিক আশাআকাঙ্ক্ষার উল্টো যাত্রাপথে বিরাজ করছে, যদি অনুভূত হয় যে, টিকে থাকার জন্যে অ্যাবসার্ডকে সম্মতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তাহলে এটা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যাবে যে, সে তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্যটিকে হারিয়ে ফেলেছে, হারিয়ে ফেলেছে তার মানবিক ও আপেক্ষিক চরিত্রটিও। আর সে তা হারিয়েছে, কারণ, এক নিত্যতার ভেতরে প্রকাশ করতে চাইছে সে, যা একইসঙ্গে ধারণাতীত ও তৃপ্তিকর। যদি অ্যাবসার্ড থাকে, তা মানুষের নিজের জগতেই রয়েছে। যে মুহূর্তে ধারণাটি নিত্যকার স্প্রিংবোর্ডে নিজের রূপান্তর ঘটায়, তখন তা মানবিক স্পষ্টতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। সম্মতি ছাড়াই যে প্রমাণগুলিকে মানুষ গোচরে আনে, সেগুলি আর এখন অ্যাবসার্ড নয়। লড়াইটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মানুষ অ্যাবসার্ডকে এখন একাত্ম করে নিচ্ছে, এবং এই একীভবনে অ্যাবসার্ডের মূল বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ বিরুদ্ধতা, মর্মপীড়া, বিচ্ছেদ ইত্যাদি সবই যাচ্ছে হারিয়ে। এই উৎক্রমণটাই (leap) অব্যাহত। চেস্তভ যিনি হ্যামলেটের এই উক্তিটির উল্লেখ করতে এতো ভালোবাসেন—*The time is out of it*, তিনি এক ধরনের বুনো আশা নিয়েই তা আবৃত্তি করেন, যাতে মনে হয় কথাটা বিশেষ করে তাঁর নিজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শেক্সপীয়র যে অর্থে লিখেছিলেন বা হ্যামলেট যে তাৎপর্যে কথাটা বলেছিলেন, সে অর্থে নয়। যুক্তিবোধহীনতার মত্ততা বা উল্লাসের পেশা সহজ মনকে অ্যাবসার্ড থেকে ঘুরিয়ে দেয়। চেস্তভের কাছে যুক্তি

নিরর্থক, কিন্তু যুক্তির বাইরেও কিছু আছে। অ্যাবসার্ড মনের কাছে যুক্তি নিরর্থক কিন্তু যুক্তির ওপারেও কিছু নেই। এই উৎক্রমণটাই অন্ততপক্ষে অ্যাবসার্ডের যথার্থ প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের অল্পবিস্তর আলোকিত করতে পারে। আমরা জানি যে, প্রতিকূলতার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রচনা ছাড়া এটা মূল্যহীন। শুধু শুধু প্রতিতুলনা করবার জন্যেই এর কোনও মূল্য নেই। কিন্তু চেস্তভ সমস্ত জোরটা নির্দিষ্ট একটা প্রসঙ্গের (term) উপরেই দেন এবং ভারসাম্যটা নষ্ট করে ফেলেন। উপলব্ধির জন্যে আমাদের তৃষ্ণা, পরমের জন্যে আমাদের নস্ট্যালজিয়া তখনই ভাষ্য দেওয়ার উপযুক্ত হবে, যখন বিভিন্ন জিনিসকে আমরা যথাযথভাবে বুঝতে ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবো। যুক্তিকে অহেতুক নস্যাৎ করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, তার নিজস্ব একটা শৃঙ্খলা আছে, যেখানে তা খুবই কার্যকর। এটি যথার্থই মানবীয় অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ। আমরা সবেতেই স্পষ্টতা চেয়েছিলুম, তাই যদি আমরা তা না করতে পারি, অ্যাবসার্ড যদি উক্ত মুহূর্তে জাত হয়ে থাকে, তাহলে তা একেবারেই সেই সময়ে জন্মেছে যখন পুনরুত্থিত অযৌক্তিকতার সঙ্গে সীমিত কিন্তু ফলপ্রদ যুক্তির একটা সন্ধিলগ্ন উপস্থিত হচ্ছে। ফের চেস্তভ যখন হেগেলের প্রতিপাদ্যের বিরুদ্ধতা করছেন, যেমন, "সৌরজগতের গতি পরিচালিত হচ্ছে অপ্রশম্য কিছু নিয়মবাহিত হয়ে এবং যে নিয়মগুলির যৌক্তিকতাও আছে", যখন তিনি তাঁর সমস্ত আবেগ দিয়ে স্পিনোজার যুক্তিবাদকে তছনছ করে দিচ্ছেন, এবং এভাবে যাবতীয় যুক্তিবত্তার গরিমার পক্ষে সিদ্ধান্ত টানছেন। তখন কিনা স্বাভাবিক এবং অবৈধের প্রতিবর্তনে (retour/reversal) যুক্তিহীনতার প্রাধান্যলাভ ঘটেছে।[১৬] কিন্তু এই পরিবর্তন মানুষের চোখে পড়ে না। কারণ, এখানে মাত্রা এবং স্তরের ধারণাটা নাক গলাতে পারে। কিছুদূর পর্যন্ত প্রকৃতির নিয়মগুলি কার্যকর হতে পারে, কিন্তু, তার পরেই তারা অ্যাবসার্ডের জন্ম দেবার জন্যে নিজেদের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করবে কিংবা বর্ণনার স্তরে নিজেদের পক্ষে যুক্তি দেবে। তবে বিশ্লেষণটিকে সম্পূর্ণতা দানের জন্যে ওই যুক্তির মতো সত্য হয়ে উঠবে না। যুক্তিহীনতার কাছে সবই বিসর্জিত হয়েছে এখানে। প্রাঞ্জলতার দাবিকে সুকৌশলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিজের একটা উপমান সঙ্গে নিয়ে অ্যাবসার্ড অদৃশ্য হয়েছে। উল্টোদিকে, অ্যাবসার্ড মানুষ এজাতীয় কোনও সমতাবিধানের দায়িত্ব নেয় না। বরং লড়াইটাকে মেনে নেয়, যুক্তিকে পুরোপুরি ভর্ৎসনা করে না এবং যুক্তিহীনতাকেও স্বীকার করে। এভাবে সে ফের তার একক দৃষ্টিতে অভিজ্ঞতার সমস্ত উপাত্তগুলিকে (données/data) আলিঙ্গন করে এবং বিষয়টিকে উপলব্ধি করার আগেই উৎক্রমণের দিকে ঝোঁকে। খুব সহজেই সে বুঝে যায় যে, উক্ত নিদিধ্যাসনে (conscience attentive/alert awareness) আশার জন্যে এক বিন্দু ভূমি পড়ে নেই।

লিও চেস্তভের কাছে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিয়ের্কেগার্দের কাছেও তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তবে মাত্রাটা আরও বেশি। অবশ্যই কোনও বিচারবাক্যের[১৭] (proposition) সুনির্দিষ্ট রূপরেখা

রচনা করা কঠিন। লেখকদের ক্ষেত্রে বিচারবাক্যগুলি বড়ই ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে। তবে বিরুদ্ধবাদী রচনাগুলির উপস্থিতি সত্ত্বেও ছদ্মনাম, কৌশল এবং স্মিতহাস্যগুলিকে অগ্রাহ্য করেও উক্ত রচনার মধ্যে সত্যের ওকালতনামাটিকে (একইভাবে এটিকে পূর্বানুমানও বলা যায়) অনুভব করা যায়, যা কিয়েৰ্কেগার্দের শেষ গ্রন্থটিতে উন্মোচিত হয়েছে। কিয়ের্কেগার্দ এভাবেই "উৎক্রমণ (leap)" ঘটান। খ্রিস্টীয় ধ্যানধারণার দ্বারা তাঁর শৈশবটা এতই ত্রস্ত ছিল যে, শেষ পর্যন্ত তিনি ওই ধর্মের কর্কশতম দিকটিতে ফিরে গিয়েছিলেন। এবং তাঁর কাছে বিরোধাভাস (antinomie) এবং কূটাভাস (paradoxe) হয়ে উঠেছিল ধর্মীয় মানদণ্ড। ফলে, যা এই জীবনের অর্থ এবং গভীরতাকে হতাশার দিকে ঠেলে দিয়েছিল, তা-ই এখন জীবনকে তার সত্য এবং স্পষ্টতায় ফিরিয়ে দিচ্ছে। ক্রিশ্চিয়ানিটি হচ্ছে একটা কলঙ্ক এবং কিয়ের্কেগার্দ সোজাসাপ্টা যা বলেন, সেই তৃতীয় আত্মবির্সজনকে ইগ্নাটিয়াস লোয়ালার (Ignace de Loyola)[১৮] প্রয়োজন। আর এই "বুদ্ধির আত্মবিসর্জনে"—ই ঈশ্বর অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন। "উৎক্রমণ"-এর এই প্রভাবটা উদ্ভট, কিন্তু তা আর অবশ্যই আমাদের মনে বিস্ময় উৎপাদন করবে না। কিয়ের্কেগার্দ অ্যাবসার্ডকে অন্য এক জগতের একটা মানদণ্ড করে তোলেন। যদিও সে জগৎটা মূলত এই জগতেরই অভিজ্ঞতাগুলির তলানি দিয়ে গঠিত বৈ কিছু নয়। কিয়ের্কেগার্দ বলেন "একজন বিশ্বাসী মানুষ নিজের ব্যর্থতার মধ্যেই তার জয় খুঁজে পায়।"

আমার মনে এটি বিন্দুমাত্র কৌতূহল জাগায় না যে, কোন্ উদ্দীপক, উপদেশমূলক ভাষণের সঙ্গে এই মনোভাবটি জড়িত। তবে হ্যাঁ, আমি অবশ্যই কৌতূহলী হব, যদি অ্যাবসার্ডের প্রকাশ এবং তার যথার্থ প্রকৃতি যুক্তিসিদ্ধ হয়। আমি জানি যে, এখানে ব্যাপারটা আসলে তেমন নয়। অ্যাবসার্ডের বিষয়বস্তুকে নতুন করে খতিয়ে দেখার পরে সবাই স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে যে, কিয়ের্কেগার্দকে কোন্ পদ্ধতিটি অনুপ্রাণিত করেছিল। পৃথিবীর যুক্তিহীনতা এবং অ্যাবসার্ডের বিদ্রোহী নস্ট্যালজিয়ার ভিতরে তিনি কোনও ভারসাম্য রক্ষা করেন নি। সত্যি করে বললে অ্যাবসার্ড অনুভূতির সংগঠক সূত্রগুলিকে তিনি সম্মান করেন নি। যুক্তিহীনতাকে এড়িয়ে যেতে পারবেন না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই তিনি অন্তত এই বিমর্ষ নস্ট্যালজিয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চান, যাকে তাঁর মনে হয় বন্ধ্যা এবং তাৎপর্যহীন। কিন্তু এ বিষয়ে নিজের অভিমতে যদি তিনি অভ্রান্তও হন, নেতিবাচক হতে পারেন না কোনওভাবেই। যদি তিনি বিদ্রোহের আবাহনের পরিবর্তে কোনও উন্মত্ত নিয়মানুবর্তিতাকে আঁকড়ে ধরেন, তবে সেখানে অ্যাবসার্ড তাঁকে অন্ধত্বের দিকে চালিত করে, যে অ্যাবসার্ড এতদিন পর্যন্ত তাঁকে আলোকিত করেছিল। তিনি মহিমায়িত করেন এর পর থেকে তাঁর কাছে একমাত্র যা নিশ্চিত, সেই যুক্তিহীনতাকে। আব্ গালিয়ানি[১৯] যেভাবে মাদাম দেপিনেকে[২০]

বলেছিলেন—সেরে ওঠাটা নয়, বরং নিজের অসুখকে সঙ্গে নিয়ে বাঁচতে শেখাটাই গুরুত্বপূর্ণ। কিয়ের্কেগার্দ অবশ্য আরোগ্যই চান। সেরে ওঠাটা তাঁর কাছে উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁর সমগ্র জার্নালে সেটাই বিবৃত হয়েছে। তাঁর সর্বাত্মক বৌদ্ধিক প্রযত্নটাই হচ্ছে মানবিক সঙ্কটের বিরোধাভাস থেকে মুক্তির অন্বেষণ করা। যেহেতু নিজের কথা বলবার সময় মাঝেমধ্যেই নিজের অহংকেই তিনি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, তাই, অনেক বেশি মরিয়া-ভাব থাকে তাঁর মধ্যে। তিনি এমন একটা ভাব দেখান যে, না ঈশ্বরের ভয়, না করুণা তাঁর মনে শান্তি আনতে পারবে। ফলে, এভাবে এক-টানা ফিকিরের মধ্য দিয়ে যুক্তিহীনতাকে সাবয়ব করেন এবং ঈশ্বরকে অ্যাবসার্ড, অসঙ্গত, অসংলগ্ন এবং দুরূহ বলে অভিহিত করেন। মানব-হৃদয়ের অন্তর্লীন চাহিদাকে স্তব্ধ করে দিতে তাঁর ভিতরে বুদ্ধি নিজের সঙ্গেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। কোনও কিছুই যেহেতু প্রমাণিত নয়, তাই সবকিছুই প্রমাণিত হওয়ার যোগ্য।

বাস্তবিকই, কিয়ের্কেগার্দ, তাঁর অনুসৃত পথটিকে আমাদের সামনে স্বয়ং তুলে ধরেন। এখানে আমি কোনও পরামর্শ দিতে চাইছি না। কিন্তু কীভাবে তাঁর বইয়ে আত্মার প্রায় উদ্দেশ্যপূর্ণ অঙ্গচ্ছেদনের চিহ্নগুলো কারুর চোখ এড়িয়ে যাবে, যেগুলির সঙ্গে অ্যাবসার্ডের পক্ষে সম্মতিসূচক অঙ্গচ্ছেদনগুলোর ভারসাম্য রক্ষার একটা চেষ্টা এখানে হয়েছে। কিয়ের্কেগার্দের *জার্নালের* ধুয়োটা এরকম—"আমার মধ্যে অভাব ছিল একটা পশুর, যা *আবার* জড়িত মানুষের নিয়তির সঙ্গে—বেশ এবার তাহলে আমাকে একটা শরীর দিন।" এর পরে আছে—"ওঃ বিশেষত, আমার প্রথম যৌবনে একজন মানুষ হিসেবে আমাকে কি তা দেওয়া উচিত ছিল না, অন্তত ছ' মাসের জন্য—মূলত যা আমার ছিল না—তা এই শরীর, সত্তার পূর্ণাবয়ব।" অন্যদিকে ওই মানুষই অপার আশার আহ্বানে সাড়া দেয়। এই আশা শত শত বছর ধরে মানুষের মধ্যে প্রবাহিত। একমাত্র ওই অ্যাবসার্ড মানুষ ছাড়া বাকি সব মানুষের হৃদয়কে তা বেগবান করেছে। "কিন্তু খ্রিস্টীয় ধারণায় মৃত্যুই সব কিছুর পরিসমাপ্তি নয় এবং জীবন যত আশার আভাস দেয়, তার থেকেও বেশি আশার কথা বলে, এমনকি স্বাস্থ্য এবং উদ্দীপনার তুঙ্গ মুহূর্তের চেয়েও।" কলঙ্কের মধ্যে দিয়ে যে পুনর্মিলন, তা এখনও পুনর্মিলনই। লক্ষণীয় যে, হয়ত বা আশাকে চয়ন করা হয় মৃত্যু থেকেই, যা রয়েছে জীবনের উল্টো দিকে। এদিকে যদি সহানুভূতির ঝোঁকটা পড়ে, তাহলে বলতেই হবে যে, অতিরঞ্জন দিয়ে কিছুকেই প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। আমরা বলি, তা (অতিরঞ্জন) মানবীয় মাপকাঠিকে ছাপিয়ে যায়। তাই তা অবশ্যম্ভাবীরূপে অতিমানবীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু এই "তাই" কথাটাও অতিরঞ্জিত। এরও কোনও যুক্তিসম্মত অভ্রান্ততা নেই। পরীক্ষামূলক সম্ভবপরতাও নেই কোনও। আসলে, এখানে আমি কেবল এটুকুই বলতে পারি যে, এই ব্যাপারটা আমার মাপকাঠিকে ছাপিয়ে যায়। এখানে যদি আমি কোনও নেতিবাচকতা

না খুঁজে পাই, তা হলে বুঝতে হবে যে, আমি অনধিগম্যকে নিয়ে এতটুকু উৎসুক নই। আমি এখানে জানতে চাই যে, আমার জ্ঞাত অংশটুকু নিয়েই কেবল আমি বাঁচতে পারি কি না। আমি এও জেনেছি যে, বুদ্ধি অবশ্যই অহং এবং যুক্তিকে নমিত করবে। যুক্তির গণ্ডিটিকে যখন আমি মেনে নিই, তখন তো যুক্তিকে নাকচ করি না, তার আপেক্ষিক শক্তিকে স্বীকারই করে নিই বরং। কেবলই আমি মধ্যপন্থাটি অবলম্বন করতে চাই, বুদ্ধি যেখানে স্বচ্ছ থাকতে পারে। এটা দেমাকের ব্যাপার হলেও, তাকে ত্যাগ করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি দেখি না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কিয়ের্কেগার্দের ভাবনার চেয়ে গভীর আর কিছু নেই। তাঁর ভাবনায় হতাশা কোনও সত্য নয়, তা একটা ধাপ মাত্র, পাপের একটা ধাপ। আর পাপই মানুষকে ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে। অ্যাবসার্ড, যা সচেতন মানুষের অধিবিদ্যক অবস্থা, তা কি মানুষকে ঈশ্বরের অভিমুখে পরিচালিত করে না।[২১] হয়তবা আমার এ ধারণাটি আরও স্পষ্ট হবে, যদি আমি এই মর্মান্তিক মন্তব্যটি করি—ঈশ্বরবিহীন অ্যাবসার্ড পাপ। অ্যাবসার্ডের ওই পরিমণ্ডলে বাস করার ফলেই আমি জানি, তা কীসের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই মন এবং এই জগৎ একে অন্যকে আলিঙ্গন করতে না পেরে কেবলই নিজেদের মধ্যে টানাটানি করছে। এই টানাপোড়েনের উপরেই তা প্রতিষ্ঠিত। জীবনের ওই পর্যায়ের নিয়মটা কী, তা আমি জানতে চাই আর তার বদলে আমি যা পাই, তা প্রশ্নটির মূল ভিত্তিটিকেই অগ্রাহ্য করে, আমার বেদনার্ত বিরোধিতার একটা অন্যতম প্রসঙ্গকে নাকচ করে, আমার অপসারণ দাবি করে। নিজের বলে যে অবস্থাটিকে চিনতে পারছি, তার সঙ্গে কি জড়িত আমি, সেটা জানতে চাই। এও জানি সেখান থেকে আমি অস্পষ্টতা এবং অজ্ঞতাই লাভ করি। আমি নিশ্চিত যে, এই অজ্ঞতাই সব কিছুকে ব্যাখ্যা করে এবং তার এই অন্ধকারই আমার আলোক শিখা। কিন্তু এখানে আমার জিজ্ঞাসার কোনও উত্তর নেই এবং এই উদ্দীপক গীতিকাব্যিকতা আমার দিক থেকে কোনও কূটাভাসকে এড়াতে পারে না। সুতরাং মুখ ঘুরিয়ে নেবেন অনেকেই। কিয়ের্কেগার্দ হয়ত চেঁচিয়ে সতর্ক করে দেবেন—"মানুষের যদি কোনও শাশ্বত চৈতন্য না থাকে, সব কিছুরই মূলে যদি কেবলই বন্য, টগবগে শক্তি অন্ধ আবেগের কালবৈশাখীর মধ্যে সমস্ত কিছু বৃহৎ বা তুচ্ছের সৃষ্টি করে চলে, যদি অতল শূন্য সমস্ত কিছুর অন্তস্তলে কিছুই না অনুভব করে, তাহলে জীবনটা নৈরাশ্য ছাড়া আর কীইবা হতে পারে?" এই চিৎকার সম্ভবত অ্যাবসার্ড মানুষকে বিরত করতে পারবে না। সত্যের অন্বেষণ, ঔচিত্যের অন্বেষণ নয়। "জীবনটা কেমন হবে?"—এই উদ্বিগ্ন প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে গাধার মতো অনেকেই গোলাপের মোহে বেঁচে থাকে। কিন্তু তারপরেই অ্যাবসার্ড মনটি মিথ্যের কাছে আত্মসমর্পণ না করে নির্ভীকচিত্তে কিয়ের্কেগার্দের "নৈরাশ্য" নামক উত্তরটিকেই আপন করে নেওয়া পছন্দ করে। সমস্ত

দিক বিবেচনা করলে বোঝা যায়, কৃতসঙ্কল্প মনটি যেকোনও পরিস্থিতিকে সামলে নেবে।

অস্তিত্ববাদী ঝোঁকটিকে দার্শনিক আত্মহত্যা নামে অভিহিত করার ক্ষেত্রে আমি কিছুটা স্বাধীনতা নিচ্ছি। তবে তার মানে এ নয় যে, তা একটা রায়। এ হচ্ছে সুবিধেমতো একটা আন্দোলনকে নির্দেশিত করা, যার মাধ্যমে তত্ত্বটি নিজেকে নাকচ করে এবং সেই নাকচের মধ্য দিয়ে নিজেকে ছাপিয়ে যেতে চায়। অস্তিত্ববাদীদের কাছে এই নাকচের ব্যাপারটা দেবতাসদৃশ। সঠিকভাবে বলল, মানবীয় যুক্তি[২২] নাকচের মাধ্যমেই দেবতাকে তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু আত্মহত্যার ঘটনাগুলির মতো দেবতারাও মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের পাল্‌টে চলছেন। উৎক্রমণের বহু উপায় আছে। তবে মূলত উৎক্রমণটাই ছিল জরুরি। বন্দিদশামুক্ত ওই নাকচগুলো, ওই চূড়ান্ত স্ববিরোধগুলো যে বাধাগুলোকে অগ্রাহ্য করে, সেই বাধাগুলোকে এখনও আমরা উৎক্রমণ করি নি। সেগুলি অবশ্যই উদ্ভূত হতে পারে কিছু ধর্মীয় অনুপ্রেরণা থেকে, কিংবা কিছু যুক্তি-ক্রম থেকেও। যুক্তিগুলো এই কূটাভাসকেই নিশানা করে। যাই হোক, তারা সর্বদা শাশ্বতের দাবি জানায় এবং একমাত্র এখানেই তারা উৎক্রমণ ঘটায়।

আবার বলতে হচ্ছে, এ প্রবন্ধে যে যুক্তির বিবর্তন ঘটেছে, তা মোটের উপর আলোকপ্রাপ্তির যুগের একটি বহুধাবিস্তৃত আধ্যাত্মিক প্রবণতাকে ছাড় দিয়েছে যেটির ভিত্তি ছিল এই যে, সমস্ত যুক্তিরই লক্ষ্য হচ্ছে জগৎটাকে ব্যাখ্যা করা। পৃথিবীটার যে অবশ্যই সবকিছু সুস্পষ্ট হওয়া দরকার— এ ধারণাটা মেনে নিয়েই পৃথিবীটা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার ব্যাপারটা স্বাভাবিক। এটা যেন ন্যায়সঙ্গত ব্যাপার। কিন্তু এখানে আমরা যে যুক্তিক্রম অনুসরণ করেছি, তার সঙ্গে এটি সম্পর্কিত নয়। আসলে, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে মনের সেই গতির উপরে আলো ফেলা, যা শুরু করে পৃথিবীর অর্থহীনতার দর্শন দিয়ে এবং পরে তার মধ্যে একটা অর্থ এবং গভীরতার সন্ধান পেয়ে সমাপ্তি টানে। তার ওই গতির করুণতম দিকটি এই যে, তা মূলত ধর্মীয় যুক্তিহীনতার থিমে নিজেকে সে বিশদীকৃত করে। কিন্তু সবচেয়ে স্ববিরোধী ও তাৎপর্যপূর্ণ অবশ্যই সেটি, যা পৃথিবীর যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়, যেখানে প্রথমেই ধরে নেওয়া হয় যে, কোনও কিছুরই কোনও পরিচালন-নীতি নেই। নস্ট্যালজিয়ার চেতনার এই নব্য প্রাপ্তির ধারণাটি না দিয়ে সংশ্লিষ্ট ফলাফলগুলিতে পৌঁছনো এমনিতেও আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

হুর্সেল এবং অবভাসবাদীরা (phenomenologues/phenomenologist) "অভিপ্রায়" শীর্ষক যে থিমটিকে ফ্যাশনেবল্ করেছিলেন, সেটিকেই কেবল আমি খতিয়ে দেখব। এ নিয়ে আমি আগে বলেছি। মূলত হুসের্লের চিন্তাধারা যুক্তির ধ্রুপদী

ঐতিহ্যটিকে নাকচ করে দেয়। আরও একবার বলছি যে, মূল নীতিগুলোর আড়ালে চিন্তাধারাগুলো না করে তার স্বরূপের উদ্ঘাটন, না ঘটায় নিজেদের মধ্যে কোনও সমন্বয়। চিন্তা কথাটির অর্থ হলো, আবার নতুন করে দেখার শিক্ষা, কারুর চৈতন্যকে সামনের দিকে চালিত করা, প্রতিটি ইমেজকে সুবিধেজনকভাবে স্থাপিত করা। অন্যভাবে বলা যায়, অবভাসবিদ্যা জগতের ব্যাখ্যানে অসম্মতিজ্ঞাপন করে, শুধুই বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে চায়। স্রেফ সত্য ছাড়া আর কোনও সত্য নেই—এই প্রাথমিক দৃপ্ত ঘোষণার মাধ্যমে তা দৃঢ়ভাবে অ্যাবসার্ডকে প্রতিষ্ঠা করে। আমার কাঁধে রাখা অন্যের হাত ছুঁয়ে যাওয়া মন্দ মধুর হাওয়ার মতো সবকিছুরই নিজস্ব সত্য আছে। তাদের প্রতি মনোযোগী হয়ে চৈতন্য তাদের দীপিত করে। চৈতন্য সত্যোপলব্ধি ঘটায় না, তাকে প্রাধান্য দেয়। এটাই মনোযোগের কাজ এবং বের্গসীঁয় ইমেজ সংগ্রহ করতে গিয়ে তা প্রক্ষেপকেরই অনুকরণ করে, যা সহসাই বিশেষ একটি ইমেজের উপরেই কেন্দ্রীভূত করে নিজেকে। পার্থক্য এখানেই যে, সেখানে কোনও চিত্রনাট্য থাকে না। তবে পরপর কিছু অসংলগ্ন অলঙ্করণ থাকে। ওই ম্যাজিক-লণ্ঠনের সমস্ত দৃশ্য-ই বস্তুত বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত। চৈতন্য তার মনোযোগের উপাদানগুলিকে অভিজ্ঞতার ভিতরে বিলম্বিত করে। অলৌকিক ঘটনার সাহায্যে তাদের সে বিচ্ছিন্ন করে। সুতরাং সমস্ত মতামতের উর্ধ্বে বিরাজ করে তারা। "অভিপ্রায়" বলতে এটাকেই বোঝায় এবং তা চৈতন্যকে বিশিষ্টতা দান করে। কিন্তু "অভিপ্রায়" শব্দটি পরিণতিবাচক নয়, তা "অভিমুখ"-অর্থে গৃহীত হয়ে থাকে। "অভিপ্রায়"-এর একমাত্র মূল্য তার স্বাভাবিক দৃশ্যময়তায়।

এই যুক্তিতে প্রথম দৃষ্টিতে অবশ্যই মনে হতে পারে যে, কোনও কিছুই অ্যাবসার্ড চেতনার বিরোধিতা করে না। ভাবনার এই বাহ্য শালীনতা, যা নিজেকে সংযত রাখে সেখানে, যাকে সে ব্যাখ্যা করতে চায় না, এই অভিপ্রায়িক শৃঙ্খলা (স্ববিরোধী কিন্তু অগাধ ঐশ্বর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার উৎসবিন্দু), এবং প্রগলভতার মধ্যে পৃথিবীর রেনেসাঁসই হচ্ছে অ্যাবসার্ডের চলনভঙ্গি। অন্তত প্রথম দৃষ্টিতে। কারণ, এখানকার মতো অন্যত্রও চিন্তা-প্রণালীর মধ্যে সবসময়ই দুটো দিক ধরে নেওয়া হয়—একটা মনস্তাত্ত্বিক অন্যটা অধিবিদ্যক[২৩]। এভাবে তারা দুটো সত্যকে কেন্দ্রাভিমুখী করে। উদ্দেশ্যমূলকতার থিমটি নিছকই যদি একটি মনস্তাত্ত্বিক ঝোঁককে পরিস্ফুটনের দাবি করে, যাতে বাস্তবতা ব্যাখ্যাত হওয়ার চাইতে ক্ষয়ই হয় বেশি, তাহলে অ্যাবসার্ড ভাবনা থেকে কোনও কিছুই নিজেকে পৃথক করে নেয় না। যাকে সে অতিক্রম করতে পারে না, তাকেই সে হিসেবের মধ্যে রাখতে চায়। সে একান্তভাবেই নিশ্চয়তা দান করে যে, কোনও ঐক্যনির্ণায়ক সূত্র ছাড়াও চিন্তা অভিজ্ঞতার প্রতিটি রূপ.কে বর্ণনা এবং উপলব্ধি করতে সক্ষম। সুতরাং ওই সমস্ত রূপের প্রত্যেকটিতেই সত্য নিহিত। আর সেগুলি মনস্তাত্ত্বিক ধাঁচের। বাস্তবতা যে সমস্ত "আগ্রহের" সঞ্চার ঘটাতে পারে, সহজেই সেগুলিকে

পরীক্ষা করেও দেখতে পারে। ঘুমিয়ে পড়া পৃথিবীটাকে জাগিয়ে তোলার এবং মনের কাছে তাকে জীবন্ত করে তোলার এটা একটা কৌশল। কিন্তু কেউ যখন এই সত্যের ধারণাটির প্রসার ঘটাতে চায় এবং এভাবে প্রতিটি জ্ঞানের মূল (essence)-কে আবিষ্কারের দাবি করে, তখন সেই ব্যক্তিটি অভিজ্ঞতার গভীর অংশটিকে ফের নতুন রূপে উদ্ভাসিত করে। কেননা, অ্যাবসার্ড মনের কাছে তা অনধিগম্য থেকে যায়। অভিপ্রায়িক প্রবণতার মধ্যে অনুভবগম্য বিষয় এবং আশ্বাসের এই ভারসাম্যটি এবং এই দীপ্তোজ্জ্বল অবভাসিক চিন্তাটি এর পরে অ্যাবসার্ড যুক্তিক্রমকে বাকি সবার থেকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে। কারণ, হুসের্লও বলেছেন যে, অভিপ্রায়ের মাধ্যমেই "অতিজাগতিকের মূল (essences extra-temporelles)" প্রকাশের আলোয় আসে। তাঁর এই উক্তিটিকে প্লেটোর কথার মতোই শোনায়। একটা ঘটনা দিয়ে সমস্ত ঘটনা ব্যাখ্যাত হয় না, সমস্ত ঘটনা দিয়েই সমস্ত ঘটনা ব্যাখ্যাত হয়। আমি তো এ দুইয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখি না। প্রতিটি বর্ণনার শেষে চেতনা যাদের "ফলপ্রসূ" করে তোলে, অবশ্যই ওই ভাবনা বা মূলগুলো (essence) তাদের মতো করে এখনও নিখুঁত মডেল হিসেবে গণ্য হয় নি। কিন্তু এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, পর্যবেক্ষণের প্রতিটি তথ্যের সংকলনে তারা বিদ্যমান। একটি ধারণা দিয়েই এখন আর সব কিছুকে ব্যাখ্যা করা যাবে না, বরং অগণন মূল (essence) গণনাতীত বস্তুকে একটা অর্থ দান করছে। পৃথিবীটা নিশ্চলতাপ্রাপ্ত হলেও আলোকবিচ্ছুরণ করছে। প্লেটোনিক বাস্তবতা স্বজ্ঞামূলক হয়ে উঠছে। কিন্তু তা এখনও বাস্তববাদই বটে। কিয়ের্কেগার্দের ঈশ্বর তাঁকে গ্রাস করেছে, পারমেনিডেজ[২৪] তাঁর চিন্তাকে *এক*-এর মধ্যে নিমজ্জিত করে দিয়েছেন। কিন্তু এখানে চিন্তা নিজেকেই বিমূর্ত বহুদেবতাবাদে নিক্ষিপ্ত করেছে। এটাই কিন্তু সব নয়। হ্যালুসিনেশন্ এবং ফিকশনও তো এভাবে "অতিজাগতিক মূল"-এর অংশ হয়ে ওঠে। নতুন ভাববিশ্বে নরঘোটকদের প্রজাতিটি অপেক্ষাকৃত বিনয়ী মেট্রোপোলিটান মানুষের সহযোগী হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীর সমস্ত রূপ-ই কোনও না কোনওভাবে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত—এই খাঁটি মনোবৈজ্ঞানিক অভিমতটিতে অ্যাবসার্ড-মানুষের জন্যে একই সঙ্গে একটি সত্য এবং তিক্ততা রয়েছে। সমস্ত কিছুই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত—কথাটি এই কথাটির অনুরূপ যে, সমস্ত কিছুই সমতুল। কিন্তু এই সত্যের অধিবিদ্যক দিকটি ধরাছোঁয়ার এতোটাই বাইরের যে, প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় সে (অ্যাবসার্ড মানুষটি) হয়ত নিজেকে প্রায় প্লেটোর সমতুল্য মনে করবে। বস্তুত, সে (অ্যাবসার্ড মানুষটি) জানে যে, যেকোনও ইমেজই পাশাপাশি সুবিধাপ্রাপ্ত মূলটিকেও অনুমান করে নেয়। উচ্চক্রমহীন এই আদর্শ পৃথিবীতে যেকোনও সাধারণ সেনাবাহিনী কেবলমাত্র জেনারেলদের নিয়েই গঠিত হয়। নিঃসন্দেহে, অতীন্দ্রিয়তাকে এখানে ছেটে ফেলা হয়েছে। কিন্তু ভাবনার একটা আকস্মিক অবস্থান-বদল

এক ধরনের খণ্ডিত অন্তরশায়িতার জগতে প্রত্যাবর্তন করে, যা তার গভীরতাকে জগতের মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করে।

যে বিষয়টিকে তার স্রষ্টা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সামলেছেন, তাকে আরও খানিকটা সম্প্রসারিত করতে কি আমার ভয় পাওয়া উচিত? আমি শুধু হুসের্লের সেই উক্তিগুলোকেই এখানে পাঠ করব, যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী হলেও নিখুঁতভাবেই যুক্তিপূর্ণ, যদি এই কথাগুলিকে মেনে নেওয়া যায় "যা কিছু সত্য, তা স্বয়ং চূড়ান্ত সত্য; সত্য এক, একটাই রূপ তার—মানব, দানব, দেবতা বা ঈশ্বর ইত্যাদি বিভিন্ন জীব তাকে যত রূপেই দেখুক না কেন।" যুক্তি জয়ী হয় এবং এই কণ্ঠের দ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষিত হয়, যাকে পরে আর আমি অস্বীকার করতে পারি না। অ্যাবসার্ড জগতে হুসের্লের এই উক্তি কী বোঝাতে চায়? কোনও দেবদূত বা ঈশ্বরের মতামতের কোনও মূল্যই আমার কাছে নেই। ওই জ্যামিতিক ক্ষেত্র, যেখানে ঐশী যুক্তি আমাকে স্বীকৃতি দান করে, তা সব সময়ই আমার উপলব্ধির বাইরে। সেখানেও আমি একটি উৎক্রমণ লক্ষ্য করি। ব্যাপারটা বিমূর্তের মধ্যে ঘটলেও মোটের উপরে তা ভুলে যাওয়ার কথাই বলে। যদিও আমি ভুলে যেতে চাই না। এর পরে যখন হুসের্ল চেঁচিয়ে বলেন—"আকর্ষণের সূত্রগুলির মেনে চলা সমস্ত ভরগুলোই (masses) যদি না থাকে, তাহলেও আকর্ষণের মূল সূত্রগুলি নষ্ট হয়ে যাবে না, শুধু তার বাস্তব প্রয়োগের দিকটি থাকবে না।" জানি যে, একটি অধিবিদ্যক সান্ত্বনার সামনে পড়ে গেছি। চিন্তা যেখানে প্রমাণের পথ পরিত্যাগ করেছে, সেই প্রমাণকে যদি আমি খুঁজতে চাই, তাহলে, মানুষের মন নিয়ে হুসের্লের প্রযুক্ত সেই সমান্তরাল যুক্তিগুলিকেই শুধু আর একবার পড়ে নিতে হবে "সাইকিক প্রণালীর সঠিক-সূত্রগুলিকে যদি আমরা স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে পারতুম, তাহলে তত্ত্বপ্রধান প্রকৃতি-বিজ্ঞানের মূল নিয়মাবলির মতোই সেগুলি চিরন্তন এবং অপরিবর্তনীয় হতো। সেক্ষেত্রে কোনও সাইকিক পদ্ধতি না থাকলেও সেগুলি বৈধ হয়ে উঠত।" মন না থাকলেও মনের নিয়মাবলি থাকত! এর পরে হুসের্লের আর একটি মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে লক্ষ্য করছি, যেটিকে তিনি একটি যুক্তিনির্ভর নিয়ম করে তুলতে চান মানবিক যুক্তির ঐক্যনির্ণায়ক শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি যুৎসইভাবে সরাসরি শাশ্বত যুক্তিতে উৎক্রমণ করেন।

হুসের্লের "বস্তু জগৎ"-এর থিমটি আর আমাকে বিস্মিত করবে না, যদি আমি জেনেই যাই যে, মূল (essence) মাত্রই আনুষ্ঠানিক নয়, তাদের কিছু কিছু ঐহিক। অর্থাৎ প্রথমটি যুক্তিবিদ্যার বিষয়, আর দ্বিতীয়টি বিজ্ঞানের। এ হলো, নিছকই একটা সংজ্ঞার প্রসঙ্গ। আমি জানি যে, বিমূর্তের মধ্যে কোনও ক্রম-পরম্পরা নেই, বস্তুজগতের একটা খণ্ডাংশের নির্দেশক তা। তবে এতক্ষণে যে ভারসাম্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তাতে আমি ওই সংশয়গুলির নিরসনে কিছু আলোকপাত করতেই পারি। কারণ, এমনও হতে

পারে যে, আমার আকর্ষণের নির্দিষ্ট বিষয়গুলি (পৃথিবীতে তারা বিচ্ছিন্ন) যথা, আকাশ, আমার কোটের উপরে জলের প্রতিবিম্ব শুধু নিজেরাই বাস্তবের মর্যাদাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। আর এটাকে আমি অস্বীকার করব না। কিন্তু এর অর্থটা এমনও হতে পারে যে, এই কোটটাই চিরন্তন, তার একটা নির্দিষ্ট ও পর্যাপ্ত মূল (essence) আছে, আকারবিশিষ্ট পৃথিবীরই সে অংশ। এর পরে আমি উপলব্ধি করি যে, কেবল শোভাযাত্রার ধারাটাই পালটে গেছে। উচ্চতর জগতে এই পৃথিবী আর প্রতিবিম্বন করছে না, কিন্তু রূপকল্পের স্বর্গটি এই পৃথিবীর চিত্রসমষ্টি দিয়েই রচিত। এই পরিবর্তনগুলোও আমার কাছে কিছু না। এখানে ফের যা আমার চোখে পড়ে, তা সেই মূর্তের জন্যে আগ্রহ, মানবীয় পরিস্থিতির তাৎপর্য ইত্যাদি নয়। বরং এখানে মননশীলতাই গুরুত্বপূর্ণ, যা নিষ্কন্টকভাবে, অপর্যাপ্তভাবে মূর্তের সাধারণীকরণ ঘটাতে পারে।

সেই বাহ্য-কূটাভাসে হতবাক হওয়া নিরর্থক, যা বোকা বানানো যুক্তি এবং জয়োদ্ধত যুক্তির বিরুদ্ধবাদিতায় চিন্তাকে তার স্বীয় নেতিবাচকতার অভিমুখে চালিত করে। হুসের্লের বিমূর্ত ঈশ্বর থেকে কিয়ের্কেগার্দের আলোকিত ঈশ্বর পর্যন্ত যে দূরত্ব, তা খুব বড় কিছু না। যুক্তি এবং অ-যুক্তি একই নৈতিক ভাষণের (prédication/preaching) অভিমুখী হয়। পথটা প্রকৃতপক্ষে এখানে তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, লক্ষ্যে পৌঁছনোর ইচ্ছেটাই গুরুত্বপূর্ণ। বিমূর্তবাদী দার্শনিক এবং ধর্মীয় দার্শনিক উভয়ই চিন্তার একই অবিন্যস্ততা থেকে যাত্রা শুরু করে এবং নিজেদের উদ্বেগের ক্ষেত্রে উভয়ে উভয়কে পারস্পরিক সহযোগও দান করে। কিন্তু মূল যে উপাদান, তা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। নস্ট্যালজিয়া এখানে জ্ঞানের থেকেও বেশি শক্তিশালী। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, যুগভাবনা একদিকে পৃথিবীর তাৎপর্যহীনতার দর্শনে গভীরভাবে প্রোথিত এবং অন্যদিকে তার সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে বহুধাবিভক্ত। তা বাস্তবতার চূড়ান্ত যুক্তাভ্যাস এবং বাস্তবতার চূড়ান্ত অ-যুক্তাভ্যাসের (irrationalisation) মধ্যে অনবরত দোদুল্যমান রয়েছে। যুক্তাভ্যাস (rationalisation) উপযুক্ত যুক্তির সাহায্যে নিজেকে টুকরো টুকরো করে বিচার করছে আর অ-যুক্তাভ্যাস নিজেকে চাইছে দেবত্বে উত্তীর্ণ করতে। কিন্তু এই বিচ্ছেদটা নিছকই আপতিক। বিষয়টা সঙ্গতিবিধানের এবং দুটি ক্ষেত্রেই উৎক্রমণটা ব্যাপক। যুক্তির বিষয়টা একপেশে—এরকম একটা ভুল ধারণা আমরা সবসময়ই পোষণ করি। সত্যি বলতে কি, লক্ষ্যের দিক থেকে ধারণাটি যতোই কঠোর হোক না কেন, সাধারণভাবে তা বাকি ধারণাগুলির মতোই পরিবর্তনশীল। যুক্তির একটা মানবিক মুখ আছে, কিন্তু তা ঐশী অভিমুখীও হতে জানে। যুক্তিকে প্রথম যিনি শাশ্বতের প্রেক্ষিকায় দাঁড় করিয়েছিলেন, সেই প্লটিনাসের[২৫] সময় থেকেই যুক্তি নিজের মূল্যবান নীতিগুলি থেকে সরে দাঁড়াতে শিখেছিল, যে নীতিগুলি

একেবারে অপরিচিতের মধ্যে যোগদানের[২৬] সমস্ত ম্যাজিককে মিলিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা অসঙ্গতি রচনা করেছিল। এটা মূল চিন্তা নয়, তার একটা অংশ মাত্র। সর্বোপরি, মানুষের নস্ট্যালজিয়াই তার চিন্তা।

যুক্তি যেভাবে প্লটিনাসের বিষণ্ণতাকে প্রবোধ জানাতে সমর্থ হয়েছিল, আধুনিক যন্ত্রণাকেও সেভাবেই তা শাশ্বতের একটি সুপরিচিত কাঠামোর মধ্যে দিয়ে প্রশমনের ব্যবস্থা করে। অ্যাবসার্ড মনের সৌভাগ্যের সম্ভাবনা বড়ই অল্প। পৃথিবীটা না বেশি যুক্তিপূর্ণ, না অযৌক্তিক; তা অযৌক্তিক এবং একমাত্র তা-ই। হুসের্লের যুক্তি অনুযায়ী যুক্তির সমাপ্তি ঘটেছে। তার আর কোনও গণ্ডিবদ্ধতার প্রশ্ন ওঠে না। পক্ষান্তরে অ্যাবসার্ড যেহেতু আপন যন্ত্রণার উপশমে সক্ষম নয়, তাই, সে আপনার সীমাবদ্ধতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিয়ের্কেগার্দ স্বাধীনভাবে এ মত প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, যেকোনও একটি সীমাই উক্ত যন্ত্রণাকে নাকচ করতে যথেষ্ট। কিন্তু অ্যাবসার্ডের গতিবিধি বেশি দূর অব্দি নয়। তার সীমারেখা যুক্তির অভিমুখ দিয়েই নির্ধারিত। যুক্তিহীনতার থিমকে অস্তিত্ববাদীরা যেভাবে আত্মস্থ করেছেন, তাতে যুক্তি ক্রমেই দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে এবং নাকচের মধ্যে দিয়ে অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। অ্যাবসার্ড এখন একটি প্রাঞ্জল যুক্তি, যা নিজের গণ্ডিটিকে মেনে নিচ্ছে।

এই বন্ধুর পথের শেষ পর্যন্ত পৌঁছলেই অ্যাবসার্ড-মানুষ নিজের সত্যিকারের লক্ষ্যটিকে চিনতে পারে। নিজের অভ্যন্তরীণ প্রাথমিক চাহিদাগুলোর সঙ্গে সে তার লব্ধ উপাদানগুলির পারস্পরিক তুলনা করে। তখন, হঠাৎ তার মনে হয় যে, সে আবার উজান পথে হাঁটছে। হুসের্লের ভাববিশ্বে জগৎটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর মানুষের হৃদয় পরিচয়তার জন্যে যে কামনা পোষণ করে, তা হয়ে দাঁড়ায় অর্থহীন। যদি বাসনাটি পূর্ণতা লাভ করতে চায়, তবে কিয়ের্কেগার্দের অ্যাপোকালিপ্‌সে স্পষ্টতা লাভের এই বাসনাটিকে পরিত্যাগ করতেই হবে। পাপ ততোটা জ্ঞান নয়, যতোটা তা জ্ঞানার্থী। যদি তা জ্ঞান হতো, তাহলে সবাই নির্দোষ বলে গণ্য হতো। বস্তুত, অ্যাবসার্ড-মানুষের মধ্যে পাপই শুধু এই অনুভূতির সঞ্চার করতে পারে যে, পাপের ভেতরে অপরাধ এবং নির্দোষিতা দুই-ই রয়েছে। অ্যাবসার্ড-মানুষকে যে সমাধানটি দেওয়া হয়েছে, তাতে অতীতের সমস্ত স্ববিরোধিতাগুলো রয়েছে এবং সেগুলি কেবলই বিতর্ক-প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এভাবে অ্যাবসার্ড-মানুষ এগুলিকে অর্জন করে নি। অভিজ্ঞতার সত্যতাকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে, কিন্তু সন্তুষ্টির কোনও অবকাশ না রেখে। অ্যাবসার্ড-মানুষ ধর্মকথা শুনতে চায় না।

আমার যুক্তিবাদ সেই প্রমাণের প্রতিই বিশ্বস্ত হতে চায়, যা তাকে (অ্যাবসার্ড-মানুষটিকে) প্রাণিত করে। অ্যাবসার্ডই সেই প্রমাণ। এটাই সেই বিচ্ছেদ, যা রয়েছে সেই মন এবং পৃথিবীর মধ্যে। যে মন কামনা করে এবং যে পৃথিবী নিরাশ করে,

যেখানে ঐক্যের জন্যে আমার নস্ট্যালজিয়া আছে, আছে এই খণ্ডিত জগৎটিও, তার অসঙ্গতিগুলি সমন্বিত করে। কিয়ের্কেগার্দ আমার নস্ট্যালজিয়াকে দমিত করেন এবং হুসের্ল ওই জগৎটাকে সমাহৃত করেন। এ নয় যে, এদের জন্যে আমি অপেক্ষা করছি। এ হচ্ছে বেঁচে থাকার এবং ওই সমস্ত বিচ্যুতি নিয়ে চিন্তা করার বিষয়, জানার বিষয় যে, কাউকে গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করতে হবে কিনা। প্রমাণ লোপাটের কোনও প্রশ্নই নেই, নেই অ্যাবসার্ডের সমীকরণে কিছু একটা অস্বীকার করে অ্যাবসার্ডকে ধামা চাপা দেওয়ার কোনও চেষ্টাও। এটা অবশ্যই জানা দরকার যে, অ্যাবসার্ডের সঙ্গী হয়ে কেউ কি বেঁচে থাকতে পারে? না কি, যুক্তি অ্যাবসার্ডের কারণেই কাউকে মরবার নির্দেশ দেয়। আমি দার্শনিক আত্মহত্যায় উৎসাহী নই, বরং বিশ্বাসী সাধারণ আত্মহত্যায়। বিশেষভাবে আমি আত্মহত্যার তীব্র আবেগী উপাদানগুলিকে পরিশুদ্ধ করতে চাই, তার যুক্তি, তার সততাকে জানতে চাই। অপস্রিয়মাণ অ্যাবসার্ড-মন এবং তার বিশ্রাম নিয়ে অন্য কোনও অবস্থান অ্যাবসার্ড মনের জন্যে বিলয় এবং তার বিশ্রামের দিকটিকে নির্দেশ করে, যাকে মন নিজেই প্রকাশের আলোয় এনেছে। হুসের্ল দাবি করেন যে, বদ্ধমূল স্বভাব এবং অস্তিত্বের বিশেষ কিছু পরিচিত এবং সুবিধেজনক অবস্থার চিন্তা করার অভ্যাসকে পরিত্যাগ করার বাসনাকে তিনি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু অন্তিম উৎক্রমণটি তাঁর মধ্যে চিরন্তন এবং চিরন্তনের স্বস্তিকে পুনরুদ্ধার করে দিয়েছে। কিয়ের্কেগার্দ যেরকম ভাবতেন, উৎক্রমণটি ঠিক সেরকম চরম বিপদ নয়। এই বিপদটি উৎক্রমণের অব্যবহিত পূর্বের সূক্ষ্ম একটি মুহূর্তের মধ্যে নিহিত থাকে। এই আচ্ছন্ন মুহূর্তের চুড়োয় থাকার ক্ষমতাই সততা আর বাকিটা এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল। আমি এও জানি যে, অসহায়তা কখনই কিয়ের্কেগার্দের মতো করে লক্ষণীয় সঙ্গতিবোধের প্রণোদনা সৃষ্টি করে নি। কিন্তু ইতিহাসের উদাসীন প্রান্তরে যদি অসহায়তার কোনও স্থান থেকে থাকে, যুক্তিবাদিতার মধ্যে তার কিছুই আর এখন পড়ে নেই। অথচ সবাই জানেন, এখন তার প্রয়োজনীয়তাই ছিল সব থেকে বেশি।

—————

# LA LIBERTÉ ABSURDE

## অ্যাবসার্ড স্বাধীনতা

মূল কাজ শেষ। সংগ্রহ করেছি কিছু প্রমাণও। সেগুলির থেকে আলাদা করতে পারছি না নিজেকে। আমি যা জানি, যা নিশ্চিত, যাকে নাকচ করতে পারি না, পারি না প্রত্যাখ্যান করতে—সেসবই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। আমার যে অংশটা আবছা নস্ট্যালজিয়া নিয়ে বেঁচে আছে, সেটিকে পুরোপুরি আমি বাতিল করে দিতে পারি। শুধু বাতিল করতে পারি না, ঐক্যলাভের এই বাসনাকে, সমাধানে পৌঁছনোর এই তাড়নাকে, স্পষ্টতা-অর্জন এবং সঙ্গতিসাধনের এই চাহিদাকে। আমাকে ঘিরে থাকা চারপাশের এই পৃথিবীর যা কিছু আমাকে আহত কিংবা উদ্বেল করে, তাদের সবগুলিকেই আমি নস্যাৎ করতে পারি, কেবল এই বিশৃঙ্খলা, এই অদম্য সম্ভাবনা এবং নৈরাজ্যসঞ্জাত এই পবিত্র সাদৃশ্যটিকে বাদ দিয়ে। আমি জানি না, এই পৃথিবীটার কোনও মানে আছে কি না, যা কিনা নিজেকেও ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু এটুকু বুঝি যে, ওই মানেটা আমি জানি না এবং এখনই আমার পক্ষে তা জানাও সম্ভব নয়। নিজের বৃত্তের বাইরের কোনও একটা মানে-তেই বা কী প্রয়োজন আমার? মানবিক বিষয়গুলির মধ্যেই শুধু তাকে উপলব্ধি করতে পারি আমি। যা কিছু স্পর্শ করি, যা কিছু আমাকে বাধা দেয়—তাদেরই শুধু উপলব্ধি করি আমি। আর আমি জানি যে, পরমের জন্যে এবং ঐক্যের জন্যে আমার খিদে এবং এই পৃথিবীকে একটিমাত্র যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সম্মত নীতিতে সংহত করবার অসম্ভবপরতা—এই দুটি দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যে সঙ্গতিসাধন আমি করতে পারব না। মিথ্যাভাষণ না করে, যে আশা আমার নেই, তাকে টেনে এনে আর কোন সত্যকেই বা মেনে নিতে পারি আমি? এটা কি আমার পারিপার্শ্বিক গণ্ডির মধ্যে নিরর্থকতার সূচনা করে না?

যদি আমি হতাম গাছেদের মধ্যে একটি গাছ, প্রাণীদের মধ্যে একটি বেড়াল, সেক্ষেত্রে নিশ্চয় এ জীবনটার একটা মানে থাকত, সেক্ষেত্রে হয়ত এই সমস্যাটিরই উদ্ভব হতো না। কারণ, তখন আমি হতাম এ পৃথিবীটারই একটা অংশ। আমার উচিত পৃথিবীর একজন হওয়া। আমার সমগ্র চেতনা দিয়েই বর্তমানে এই ধারণাটির বিরোধী আমি এবং এখন আমি আমার আত্মপরিচয়ের উপরেই জোর দিচ্ছি। এই যুক্তিটি হাস্যকর এবং তা আমাকে বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টিসম্ভারের উল্টোদিকে ঠেলে দিয়েছে। কলমের একটি

আঁচড়ে তো আর একে ডিঙিয়ে যেতে পারব না। যা সত্য বলে বিশ্বাস করি, তাকে অবশ্যই রক্ষা করব। যা অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হবে, তা যদি বিপক্ষেও যায়, তবু তাকে সমর্থন করব। আর ওই সংঘর্ষের ভিত তৈরি করে যা, বিশ্ব এবং আমার মনের মধ্যে ভাঙন রচনা করে যা, তা আমার অভ্যন্তরীণ সচেতনতা ছাড়া আর কী? সুতরাং একে যদি আমি টিঁকিয়ে রাখতে চাই, তাহলে সদা সতর্ক, নিত্য নিরবচ্ছিন্ন, নব নবায়মান একটি সচেতনতার মাধ্যমেই তা আমাকে করতে হবে। আপাতত আমি এ কথা মনে রাখব। এই মুহূর্তে অ্যাবসার্ড অত্যন্ত প্রকট এবং জয় করবার পক্ষে খুবই দুর্গম। মানুষের জীবনে অ্যাবসার্ড ফিরে আসছে, সেখানে আশ্রয় নিচ্ছে। তাছাড়া এ মুহূর্তে শীর্ণ ও শুকনো সহজ পন্থাটিকে মন ঝেড়েও ফেলতে পারে। কারণ, তা এখন নিত্যদিনের জীবনে ঢুকে পড়েছে। অজ্ঞাতনামা সর্বনাম "এক"-এর পৃথিবীকে খুঁজে পেয়েছে সে। কিন্তু মানুষও সেখানে বিদ্রোহ আর স্পষ্টতাকে সঙ্গী করে হাজির হয়েছে। সে আশা করতে ভুলে গেছে। বর্তমানের এই নরকই শেষ পর্যন্ত রাজধানী হয়ে উঠেছে তার। যাবতীয় সমস্যাই ফের ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে। রঙ এবং আঙ্গিকের কবিতার পুরোভাগে বিমূর্ত প্রমাণটি বিশ্রাম নিচ্ছে। আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বগুলি মানুষের মনে ফের দুর্গত রূপে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের মধ্যে একধরনের রাজকীয়তাও আছে। স্থায়ী কোনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না তারা। তবে নিজেদের রূপটা পালটে ফেলছে। যে আত্মহত্যা করতে যায়, উৎক্রমণের সাহায্যে পালাতে চায়, সে কি নিজের মানদণ্ডে ভাব ও রূপের নতুন কোনও সৌধ নির্মাণ করে? অথবা কেউ কি অ্যাবসার্ডের উৎচ্ছিন্নতা এবং চমৎকারিত্বের বাজি ধরতে যায়? আসুন, এ নিয়ে চূড়ান্ত কিছু একটা করি এবং যা সিদ্ধান্ত নেবার নিয়ে নিই। তাহলেই এই উন্মত্ত পৃথ্বীতে সবাই শরীর, কোমলতা, সৃষ্টি, কার্যকারণ, মানবিক উদারতা—তাদের এই নিজেদের স্থানগুলি ফিরে পাবে। অন্তত ফিরে পাবে অ্যাবসার্ডের সুরা ও ঔদাসীন্যের রসদ, যা পুষ্ট করবে তার মহত্ত্বকে।

চলুন, অধ্যবসায়ের শৃঙ্খলায় নিবিষ্ট থাকি। চলার পথে কোনও না কোনও সময় অ্যাবসার্ড মানুষ প্রণোদিত হয়ে থাকে। ইতিহাসে কিছুরই অভাব ঘটে নি। না ধর্মের, না প্রফেটের এমনকি দেবতারও। অ্যাবসার্ড মানুষকে উৎক্রমণ করতে বলা হয়। তখন নিজের দিক থেকে সে এটুকুই কেবল বলতে পারে যে, সে বুঝতে পারছে না, সত্যি তাকে উৎক্রমণ করতে হবে কিনা। যা সে পুরোপুরি বুঝতে পারে না, তা সে করতেও চায় না। তাকে আশ্বস্ত করা হয় যে, এ পাপ গর্বের। কিন্তু পাপের তত্ত্বটাই সে বোঝে না; সম্ভবত যে নরক তার পথের শেষে অপেক্ষা করছে, সেই অচেনা ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করার মতো কল্পনাশক্তি নেই তার। যে অমর্ত্য জীবনকে সে হারিয়ে ফেলছে, সেটাকে তার মনে হচ্ছে নিরর্থক। পাপ স্বীকারের একটা সুযোগ তাকে দেওয়া হয়। নিজেকে নিষ্পাপ বলেই সে মনে করে। সত্যি বলতে কি নিজের নিষ্পাপতা ছাড়া অন্য

কিছুই সে বোঝে না, যে নিষ্পাপতা আর সংশোধনযোগ্য নয়। এই নিষ্পাপতা তাকে স্বেচ্ছাচারিতার ছাড়পত্র দেয়। সুতরাং নিজের চেনা গণ্ডির মধ্যেই *নিজের মতো করে* বাঁচতে চায় সে। নিজের সামর্থ্যের ভেতরেই রাখতে চায় নিজেকে, অনিশ্চিতকে টেনে আনতে চায় না কখনও। সে জেনে যায় যে, কিছুই যে নেই, সেটা অন্তত কিছুটা নিশ্চিত। আর তার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে সে  সে জানতে চায়, *আপিল* না করেও বেঁচে থাকা সম্ভব কি না।

এবার আমি আত্মহত্যার তত্ত্বে প্রবেশ করছি। এ ব্যাপারে কী ধরনের সমাধান সম্ভব, তাও ইতিমধ্যে আমরা অনুমান করে নিয়েছি। সমস্যাটা এ মুহূর্তে একেবারেই দিকবদল করেছে। আগে প্রশ্নটা ছিল এই যে, বেঁচে থাকার কোনও অর্থ আছে কি না। অন্যদিকে এটা এখন স্পষ্ট যে, অর্থ না থাকলেই আরও ভালভাবে বেঁচে থাকা যাবে। সেক্ষেত্রে এটা পুরোপুরি মেনে দিতে হবে যে, বেঁচে থাকা একটা অভিজ্ঞতা, একটা নিয়তি। এখন, কেউই এই নিয়তিকে অ্যাবসার্ড জেনে বইতে পারবে না, যতক্ষণ না সে সব কিছুকে সে নিজের সামনে দাখিল করবে, যেগুলি অ্যাবসার্ড চেতনার আলোয় উদ্ভাসিত। নঞর্থকতা একটি প্রতিপক্ষ বিষয়, যা নিয়ে সে বেঁচে থাকে, তা এখন তাকে ছেড়ে যাওয়ার পথে। সচেতন বিদ্রোহকে নিশ্চিহ্ন করা মানে সমস্যাটিকে এড়িয়ে যাওয়া। তাই স্থায়ী বিপ্লবের ধারণাটি এভাবে ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার ভেতরে পরিবাহিত হয়। বেঁচে থাকা মানে অ্যাবসার্ডকে বাঁচিয়ে রাখা। একে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ হলো তাকে নিয়ে ভাবা। ইউরিডাইসের[২৭] মতে, অ্যাবসার্ডের মৃত্যু হয় তখনই, যখন তা থেকে আমরা সরে আসি। সুতরাং দার্শনিক সঙ্গতির একটা দিক হচ্ছে বিদ্রোহ, যা মানুষ এবং তার অস্পষ্টতার মধ্যে সততই একটা সংঘর্ষ বিশেষ। যে স্পষ্টতা অসম্ভব, তাকে নিয়ে এ হচ্ছে একটা নাছোড় চেষ্টা। নব নব উদ্যমে তা প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীটাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। যেভাবে মানুষকে কোনও বিপদ সতর্ক হওয়ার সুযোগ দেয়, সেভাবেই অধিবিদ্যক বিদ্রোহ সমগ্র অভিজ্ঞতার মধ্যে সচেতনতার বিস্তার ঘটায়। এটাকেই মানুষ তার সার্বক্ষণিক উপস্থিতি হিসেবে দেখে। এটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, যেহেতু তাতে কোনও আশা নেই। এই বিদ্রোহটি অবশ্য-ই একটি দুর্ভাগ্য বিশেষ। কিন্তু তার মধ্যে সেই আত্মসমর্পণ নেই, যা থাকা উচিত ছিল তার।

আত্মহত্যা এবং অ্যাবসার্ড অভিজ্ঞতার মধ্যে মাত্রাগত ফারাক কতটা, সেটাই এখানে লক্ষ্য করা হয়। মনে করা হয় যে, আত্মহত্যা বিদ্রোহকে অনুসরণ করে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। কারণ, বিদ্রোহের যৌক্তিক পরিণতি নয় আত্মহত্যা। আত্মহত্যার প্রাক্-অনুমিত সম্মতি দিয়েই বোঝা যায় যে, ব্যাপারটা ঠিক এর উল্টো। উৎক্রমণের মতই আত্মহত্যাও নিজের চূড়ান্ত স্বীকৃতি। সব যখন নিঃশেষিত, তখন মানুষ তার মূল ইতিহাসের কাছে

প্রত্যাবর্তন করে; তার ভবিষ্যৎকে, তার একমাত্র ও ভয়াবহ ভবিষ্যৎকে দেখতে পায়। সেদিকে ধাবিত হয়। আত্মহত্যা নিজের মতো করে অ্যাবসার্ডকে পুনর্বাসন দেয়। ওই মৃত্যুর ভেতরে আত্মহত্যা আপ্যায়ন করে অ্যাবসার্ডকে। কিন্তু আমি জানি, কাউকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে অ্যাবসার্ড কোনও সমাধান হতে পারে না। যে মুহূর্ত পর্যন্ত আত্মহত্যা মৃত্যুকে যুগপৎ প্রত্যাখ্যান করে ও মৃত্যু সম্পর্কে সচেতন থাকে, সে অবধি অ্যাবসার্ডের কাছ থেকে সে নিষ্কৃতি পায়। যাই ঘটুক না কেন, একজন দণ্ডিত মানুষ তার অন্তিম ভাবনার শেষ প্রান্তে পৌঁছে ঝিমুনি-ধরা পতনের মুহূর্তে, সব কিছু সত্ত্বেও কয়েক মিটার দূরে এই জুতোর ফিতেটিকে দেখতে পায়। বস্তুত আত্মহত্যার বিপ্রতীপ হচ্ছে সেই মানুষ, যে মৃত্যুর দ্বারা দণ্ডিত।

এই বিদ্রোহ তার মূল্য জীবনকে অর্পণ করে। অস্তিত্বের সমগ্র অংশ জুড়ে ব্যাপ্ত থেকে তা নিজের ঐশ্বর্য অস্তিত্বকে ফিরিয়ে দেয়। যারা চোখে ঠুলি পড়ে নি, তাদের কাছে সেই বুদ্ধির চেয়ে আর কোনও সূক্ষ্ম দৃষ্টি নেই, যা সর্বতোভাবে সেই অতীন্দ্রিয় বাস্তবতাকে আশ্রয় করে। মানুষের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন যে দৃষ্টি, তা অতুলনীয়। তাচ্ছিল্য এখানে অর্থহীন। মনের নিজের উপর স্ব-আরোপিত এই শৃঙ্খলা, অদৃশ্য কোনও উৎস থেকে জাত এই ইচ্ছে এবং এই মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষের কিছু শক্তি এবং অসাধারণত্ব অবশ্যই রয়েছে। বাস্তবতার যে অমানবিকতা মানুষের রাজসিকতাকে গঠন করে, সেটিকে ক্ষীণ করা মানুষের নিজেকেই ক্ষীণ করার সামিল। ক্রমে আমি বুঝতে পারি যে, কেন এই ধ্যানধারণাগুলি আমাকে সবকিছুরই ব্যাখ্যাও দেয়, আবার দুর্বলও করে। জীবনের চাপ থেকে তারা আমাকে মুক্তি দেয়। যদিও একাই আমি সে চাপ বইব। জীবনের এই বাঁকে এসে আমি বুঝতে পারি না, একটি পলায়নবাদী অধিবিদ্যা কেন সমন্বয়বাদী নৈতিকতার সঙ্গে যুক্ত হবে।

চৈতন্য এবং বিদ্রোহ—এই প্রত্যাখ্যান দুটি পরিবর্জনের বিপরীত। উল্টোদিকে, মানুষের মনের যাবতীয় অদম্য ও আবেগাত্মক শক্তিগুলি চৈতন্য এবং বিদ্রোহকে তার জীবনে চাগিয়ে তোলে। সুতরাং স্বেচ্ছাকৃত নয়, অনির্ণেয় মৃত্যুবরণই শ্রেয়। আত্মহত্যা এক ধরনের অজ্ঞতা। অ্যাবসার্ড মানুষ কেবল নিজেকে সর্বাত্মকভাবে নিঃশেষিত করে দিতে পারে এবং তা-ই দেয়ও। অ্যাবসার্ড তার কাছে চরম উদ্বেগের বিষয়, যাকে সে তার একক প্রযত্নে সারাক্ষণ বাঁচিয়ে রাখে। কারণ, সে জানে, ওই চৈতন্য এবং ওই প্রাত্যহিক বিদ্রোহের মধ্যে একমাত্র যে সত্যটিকে সে রেখে যায়, তার নাম স্পর্ধা। এটি-ই তার প্রথম পরিণতি।

যদি আমি পূর্বনির্ধারিত সেই অবস্থানেই রয়ে যাই, যেখানে নবাবিষ্কৃত ধারণার সঙ্গে

জড়িত সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিকেই (এবং আর কিছু নয়) শুধু নিতে হয়, তাহলে, আমাকে দ্বিতীয় কূটাভাসটির সামনে পড়তে হবে। ওই পদ্ধতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্যে আমাকে অধিবিদ্যক মুক্তির ব্যাপারে কিছুই করতে হবে না। মানুষ স্বাধীন কি স্বাধীন নয়, এই জ্ঞানটির প্রতি আমার কোনও আগ্রহ নেই। আমি আমার নিজের স্বাধীনতাটুকুকেই শুধু উপভোগ করতে পারি। এর জন্যে আমার সাধারণ কোনও ধ্যানধারণা না-ই থাকতে পারে, কিন্তু নেহাতই খানিকটা অর্ন্তদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। "প্রকৃত স্বাধীনতা"—র সমস্যা কথাটির কোনও অর্থ নেই। কারণ, এটি সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ঈশ্বরতত্ত্বীয় সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। মানুষ স্বাধীন কিংবা স্বাধীন নয়—এই জ্ঞাতব্যটি মানুষের একজন প্রভু থাকতে পারে কিনা—এই জ্ঞাতব্যটিকেও পাঠ করিয়ে নেয়। বিশেষত এই সমস্যাটির যে অ্যাবসার্ডিটি, তা সেই ধারণাটি থেকেই আসে, যা স্বাধীনতার সমস্যাটিকেই মূর্ত করে থাকে। তা সব সমস্যাকেই ছিনিয়ে নেয়, তুলে নেয়। কারণ, ঈশ্বরের কাছে শয়তানের চেয়ে স্বাধীনতার সমস্যা ন্যূন। এর বিকল্পটি তো আপনার জানা : হয় আমরা স্বাধীন নই, অথবা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই শয়তানের জন্য দায়ী। অথবা আমরা স্বাধীন এবং আমরাই দায়ী। কিন্তু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নন। কোনও ধরনের সারস্বত তীক্ষ্ণতাই এই কূটাভাসের সূক্ষ্মতার সঙ্গে না কিছু জুড়েছে বা বাদ দিয়েছে।

এ কারণেই উচ্ছ্বাসের তোড়ে কিংবা আমাকে ফাঁকি দেয় এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভাবনাবৃত্তের বাইরে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে—এ জাতীয় কোনও ধারণায় আমি আত্মহারা হয়ে যেতে পারি না। আমি বুঝতেই পারি না, উচ্চতর কোনও সত্তার (ঈশ্বর) কাছে আমার কী ধরনের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি সম্ভব। উচ্চানুক্রমের (hiérarchie) অনুভূতিটি আমি হারিয়ে ফেলেছি। একটাই স্বাধীনতা আমি বুঝি। তা হলো, কারাগার থেকে কোনও বন্দি বা মানুষের মুক্তিলাভ। আমি কেবল চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতার কথাই জানি। এবারে, যদি আমার সীমাহীন স্বাধীনতার সম্ভাবনাগুলিকে অ্যাবসার্ড বাতিল করে দেয়, তাহলে, পক্ষান্তরে তা আমার কর্মের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার ঘটাবে, প্রবল করবে তাকে। আশা ও ভবিষ্যতের এই ঘাটতি মানুষের (মানবতার) জোগানের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি সূচিত করে।

অ্যাবসার্ডের মুখোমুখি হওয়ার আগে সাধারণ মানুষ একটা লক্ষ্য নিয়ে বাঁচে, ন্যায়বিচার বা ভবিষ্যতের সঙ্গে যার যোগ আছে। (কার সঙ্গে এটা যুক্ত বা কী এর সঙ্গে যুক্ত সেটা প্রশ্ন নয়)। নিজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলিকে নিয়ে সে ভাবনাচিন্তা করে। কারণ, শিগ্‌গিরই সে অবসরগ্রহণ করবে। সে তার সন্তানদের কর্মসংস্থানের কথা ভাবে ও হিসেবনিকেশ করে। তার মনে হয় যে, জীবনে এখনও বেশ কিছু কাজ করতে সক্ষম সে। বস্তুত তার হাবভাবে মনে হয়, সে ছিল স্বাধীন। যদিও যুক্তিগুলিকে সে স্বাধীনতার বিপক্ষেই মূলত সাজায়। কিন্তু বাস্তবতার বাইরে সবই বিপর্যস্ত। "আমি আছি (Je

suis)"[২৮]—এই ধারণা এবং এই ধারণার সঙ্গে সবই অর্থসমন্বিত আমার এই আচরণ (যদিও অনেকবারই বলেছি যে, কোনও কিছুরই অর্থ নেই)—এ দুটোই হলো সম্ভাব্য অ্যাবসার্ডিটিজনিত হতবুদ্ধির কারণে সৃষ্ট মিথ্যা। ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা, জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ, পছন্দ অপছন্দের বাছবিচার—এগুলো সবই স্বাধীনতার বিশ্বাসকে আগে থেকেই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান করে (যদি কেউ কখনও জোর দিয়ে এ কথাও বলে যে, সে তা মনে করে না)। কিন্তু এ মুহূর্তে আমি অত্যন্ত সচেতন যে, ওই উচ্চতর স্বাধীনতা যা এককভাবেই কোনও সত্যের ভিত রচনা করে দিতে পারে, আমরা ভালো করেই জানি যে, তার কোনও অস্তিত্ব নেই। সেখানে একমাত্র বাস্তবতা মৃত্যু। মৃত্যুর পরে সব খেলাই শেষ। নিজেকে চিরস্মরণীয় করে তুলেও আমি স্বাধীন নই। বরং একজন ক্রীতদাস। এমন একজন ক্রীতদাস, যে চিরন্তন বিপ্লবের আশা করে না, ঘৃণার শরণ নেয় না। বিপ্লব আর ঘৃণা ছাড়া কে-ই বা ক্রীতদাস হয়ে থাকতে পারে? চিরন্তনের আশ্বাস ছাড়া পূর্ণাঙ্গ অর্থে কোনো স্বাধীনতাও কি থাকতে পারে?

কিন্তু একই সঙ্গে অ্যাবসার্ড মানুষটি বোঝে যে, এতদিন পর্যন্ত স্বাধীনতার যে মৌলিক শর্তগুলির সঙ্গে সে আবদ্ধ ছিল, সেগুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই ইলিউশনের উপরে, যার মধ্যেই সে বাস করছিল। একদিক থেকে সেটা তার ক্ষতি করেছে। জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে যতটা সে কল্পনা করেছিল, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে উদ্দিষ্ট চাহিদাগুলির সঙ্গে ততোটাই সামঞ্জস্যবিধান করে নিয়েছিল সে এবং স্বাধীনতার ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল। একইভাবে আমি পিতার পদাঙ্কের অন্যথা করতে পারি নি। শুধু সেরকমই হওয়ার চেষ্টা করেছি। (হয় ইঞ্জিনিয়ার নয় দেশনেতা কিংবা ডাকঘরের এক সামান্য কেরানি)। অন্য কিছু হওয়ার চেয়ে এরকম কোনও পেশা বেছে নিতে পারি বলেই মনে করি। অবশ্যই অসতর্কভাবে। এরকমই ভাবি আমি। কিন্তু একই সঙ্গে আমার মৌলিক শর্তগুলিকে আমার পারিপার্শ্বিক বিশ্বাসগুলির মাধ্যমে জোরদার করি। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে চারপাশের মানুষজনকে নিয়ে ধারণাগুলো। (বাকিরা নিজেদের এতটাই স্বাধীন মনে করে যে, তাদের উৎফুল্ল ভাবটি ভালোই সংক্রামক হয়ে ওঠে)। নৈতিক বা সামাজিক সমস্ত ধরনের সম্ভাব্য ধারণাগুলি থেকে কেউ যত দূরেই থাকুন না কেন, সেগুলি তাদের অংশত প্রভাবিত করেই। এমনকি তাদের সেরাটির জন্যে মানুষ ওই ধারণাগুলির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়। (আগাম সিদ্ধান্তের ভালোমন্দ দুটি দিকই আছে)। এভাবে অ্যাবসার্ড মানুষ উপলব্ধি করে যে, সে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নয়। স্পষ্ট করে বলতে গেলে, যতোটা আমি আশা করি, সত্য নিয়ে যতোটা আমি উদ্বিগ্ন থাকি, তা আমার কাছে হয়ে উঠতে পারে ব্যক্তিক হয়ে ওঠা বা সৃষ্টি করা—যতদূর পর্যন্ত আমি আমার জীবনকে পরিচালনা করতে পারি আর সেভাবে আমি প্রমাণ করি যে, এ জীবনটাকে আমি মেনে নিচ্ছি এবং তার কারণটা এই যে, তার একটা মানে আছে। নিজের চারপাশে

কিছু পাঁচিল তুলে জীবনটাকে আমি তার ভেতরেই বন্দি করে ফেলি এবং মন ও হৃদয়ের অগণিত আমলাকে বেছে নিই। তারা আমাকে বিরক্তিতে ভরিয়ে তোলে এবং তাদের একমাত্র যে দোষটিকে এখন আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করি তা এই যে, তারা প্রকৃতই আমাদের স্বাধীনতাকে হরণ করে নেয়।

আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই—এই অ্যাবসার্ড দিকটি আমাকে আলোকিত করে। নিজের অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার পক্ষে এবার থেকে এটিই হবে আমার যুক্তি। এখানে আমি দুটো উপমার ব্যবহার করব। শুরু করব সেই মিস্টিকদের দিয়ে, যারা নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে, তাঁর বিধিনিষেধ মেনে নিয়ে এভাবে সঙ্গোপনে তারা স্বাধীনতা অর্জন করে। এই স্বতঃস্ফূর্ত দাসত্বের মাধ্যমে গভীরতর কোনও স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার ঘটাবে তারা। কিন্তু সে স্বাধীনতার মানে কী? এক কথায় বলা যায় যে, নিজেদের ক্ষেত্রে ওরা স্বাধীনতা *অনুভব করে* এবং এই স্বাধীনতা অবাধ নয়। একইভাবে মৃত্যুর দিকে পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়িয়ে (যা কিনা সর্বজনমান্য ধারণায় অ্যাবসার্ডিটি বলেই গণ্য) ওই অ্যাবসার্ড মানুষগুলো নিজেদের মধ্যে স্ফটিকায়িত হতে থাকা উক্ত ভাবাবেগভরা ভাবনার বাইরের সবকিছু থেকেই নিজেদের মুক্ত অনুভব করে। সাধারণ নিয়মাবলির দিক থেকে সে স্বাধীনতা উপভোগ করে। অস্তিত্ববাদী দর্শনের মৌলিক থিমগুলি তাদের মান পুরোপুরি বজায় রেখেছে—প্রসঙ্গটিকে এখানে এভাবেও দেখা যেতে পারে। চৈতন্যের কাছে প্রত্যাবর্তন, নিত্যকার সুষুপ্তি থেকে অব্যাহতি অ্যাবসার্ড স্বাধীনতার প্রথম ধাপগুলির প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু এতে অস্তিত্ববাদী নৈতিক ভাষণই (prédiction/preaching) পরোক্ষভাবে উল্লিখিত হয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে ওই আধ্যাত্মিক উৎক্রমণও—যা মূলত চৈতন্য থেকেও অব্যাহতি নেয়। একইভাবে আদিম দাসেরাও নিজেদের মালিক ছিল না (এটি আমার দ্বিতীয় উপমা)। কিন্তু তারা সেই স্বাধীনতাকে জানত, যার নিজের কোনও দায়[২৯] অনুভবের প্রশ্ন নেই। মৃত্যুরও আছে অভিজাতশ্রেণীসুলভ ক্ষমতা, যা কাউকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার সময় তাকে স্বাধীন-ই করে দেয়।

এই অতল নিশ্চয়তার নিজেকে ক্ষয়িত করে নিজের জীবনটিকেই অ্যাবসার্ড মানুষটির বেশ অচেনা মনে হয়। ফলে, লোকটি তার জীবনকে আর প্রসারিত করতে পারে না, প্রশস্ত দৃষ্টিতে দেখতে পারে না—এক ধরনের স্বাধীনতার আদর্শ নিহিত রয়েছে এখানে। যেকোনও সক্রিয় স্বাধীনতার মতোই এই নব্য স্বাধীনতারও একটি নির্দিষ্ট সময়-পরিধি আছে। চিরন্তনকে তা অবাধ ছাড়পত্র দেয় না, কিন্তু *স্বাধীনতার* ইলিউশনের জায়গাটি দখল করে, মৃত্যুর সঙ্গেই যা অবসিত হয়ে যায়। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত সেই মানুষটির সামনে কোনও এক ভোরে কারাগারের দরজা খুলে যায়। দণ্ডিত ব্যক্তিটির দিব্য উপস্থিতি, জীবনের বিশুদ্ধ আলোক-শিখা ছাড়া বাকি প্রতিটি বিষয়ে সেই অবিশ্বাস্য

নিঃস্পৃহতা—এসব থেকে পরিষ্কার যে, যুক্তিগ্রাহ্য-স্বাধীনতার মৌলিক উপাদান অবশ্যই মৃত্যু এবং অ্যাবসার্ড মানব-হৃদয় এর থেকেই শেখে, বেঁচে থাকে। এটাই দ্বিতীয় পরিণাম। অতএব, অ্যাবসার্ড মানুষটি দেখতে পায় জ্বলন্ত ও হিমশীতল, স্বচ্ছ ও সীমিত এক জগৎকে, যেখানে সবই রয়েছে, কিন্তু কিছুই সম্ভব নয়। আর এই জগতের বাইরে শুধুই ধ্বংস ও শূন্যতা। এরপরে এরকম একটা জগৎকে সে মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং সেখান থেকে নিজের শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, আশাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে এবং সান্ত্বনাহীন জীবনের একটি অনমনীয় সাক্ষ্য আহরণ করতে পারে।

কিন্তু এরকম একটা জগতে জীবনের মানেটা কী? তাৎক্ষণিকভাবে কিছুই না। কিন্তু ভবিষ্যতের পক্ষে উদাসীনতা এবং যা কিছু সহজলভ্য তাদের প্রত্যেকটিকে ব্যবহার করার বাসনা। জীবনের অর্থময়তায় বিশ্বাস সব সময়ই মূল্যবোধের, নির্বাচনের, পছন্দ-অপছন্দের একটা মানদণ্ডের নির্দেশক। পক্ষান্তরে, আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী অ্যাবসার্ডে বিশ্বাস উল্টো শিক্ষাই দেয়। কিন্তু বিষয়টি সূক্ষ্মভাবে বিচার্য।

*আপিল না করে* বেঁচে থাকা যায় কি না, তা জানার ব্যাপারটা আমাকে আগ্রহান্বিত করে। আমার অন্তস্তল হতে আমি নিষ্ক্রান্ত হতে চাই না। জীবনের এই রূপটি আমাকে দেওয়া হয়েছে বলে কি আমি নিজেকে মানিয়ে নেব তার সঙ্গে? এই বিশেষ বিষয়টির মুখোমুখি হয়ে অ্যাবসার্ডে বিশ্বাস এ মুহূর্তে অভিজ্ঞতার উৎকর্ষকে পরিমাণ দিয়ে পূর্ণ করেছে। যদি বিশ্বাস করি যে, অ্যাবসার্ড ছাড়া এ জীবনের আর কোনও রূপ নেই, যদি অনুভব করি যে, জীবনের পুরো ভারসাম্যটা সেই অনবচ্ছিন্ন বৈপরীত্যের উপরে নির্ভরশীল, যা আমার সচেতন বিদ্রোহ এবং তার রণক্ষেত্রের অন্ধকারের ভেতরে বিরাজ করছে, যদি স্বীকার করে নিই যে, সীমিত গণ্ডির সম্পর্কসূত্র ব্যতীত আমার স্বাধীনতার কোনও মূল্য নেই, তাহলে অবশ্য-ই বলব যে, যাকে উৎকৃষ্টভাবে বেঁচে থাকা বলে, এটা তা নয়। এটা গতানুগতিকভাবে বেঁচে থাকা। আমি নিজে বলব না যে, এটা অশিষ্ট বা বিদ্রোহমূলক, সম্ভ্রান্ত বা নিন্দনীয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্যভিত্তিক বিচারের স্বার্থে নিজস্ব ধ্যানধারণার মূল্যায়নকে এখানে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। যেটুকু দেখতে পাই, সেটুকুর ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত রচনা করি এবং যা অনুমিতিমাত্র তার মূল্যায়নের কোনও ঝুঁকি নিই না। এভাবে বাঁচাটা সম্মানজনক নয় ধরে নিলে প্রকৃত ঔচিত্য আমাকে বলবে অসম্মানজনক না হতে।

সাধারণভাবে, অনেকদিন বাঁচো, জীবনের এই রীতিটির কোনও মানে হয় না। ফলে, কথাটিকে সুনির্দিষ্টভাবে স্পষ্ট করা প্রয়োজন। গোড়াতেই মনে হতে পারে যে, পরিমাণের এই সর্বজনীন ধারণাটিকে ভালো করে খতিয়ে দেখা হয় নি। কারণ, তা

মানুষের অভিজ্ঞতার একটি বিপুল অংশকে হিসেবের মধ্যে আনতে পারে। মানুষের আচরণ-বিধি এবং তার মূল্যবোধের মানদণ্ড অর্থহীন হয়ে পড়ে, যদি না তা অভিজ্ঞতার পরিমাণ ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে নির্ণীত হয়, যেহেতু, মানুষ সেগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করার সামর্থ্য রাখে। একালে, আধুনিক জীবনের শর্তগুলি প্রথমে তাদের সম-পরিমাণ অভিজ্ঞতা বেশিরভাগ মানুষের উপরেই চাপিয়ে দেয় এবং পরে সেই-পরিমাণ গভীর অভিজ্ঞতাকে। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ব্যক্তিমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অবদান এবং তার ভেতরে "আগে থেকেই বিদ্যমান" উপাদানগুলিকেও বিবেচনায় রাখতে হবে। কিন্তু আমি তো তার বিচার করতে পারি না এবং এখানে আমি আমার সেই বিধিটির পুনরাবৃত্তি করতে চাই, যার সার কথা হলো—তাৎক্ষণিক প্রমাণগুলোকে সুবিন্যস্ত করো। এর পরে আমি লক্ষ্য করি যে, প্রচলিত নৈতিক বিধির ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যটি ততোটা তার মৌলিক নীতিগুলোর আদর্শ রূপের মধ্যে নিহিত নয়, যতোটা রয়েছে কিছু কিছু অভিজ্ঞতার নমুনার মধ্যে, যাতে তার পরিমাপ করা যায়। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রিকদের অবসরযাপনেরও কিছু নীতিমালা ছিল। যেমন, আমাদের আছে সারা দিনে আট ঘণ্টা কর্মব্যস্ত থাকার নির্দেশিকা। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকেই (তাদের ভেতরে কিছু হতভাগ্য মানুষও রয়েছে) আমাদের এ দৃষ্টিটি উন্মোচন করে দিয়েছে যে, বিপুল অভিজ্ঞতা উক্ত মানদণ্ডের সারণীটিকে পালটিয়ে দিতে সক্ষম। তারা আমাদের কল্পনা করতে শিখিয়েছে যে, শুধু অভিজ্ঞতার পরিমাণ দিয়েই রোজকার এই অভিযাত্রীটি সব পরিসংখ্যান ভেঙে ফেলবে এবং তার নিজের নীতিমালাকে[৩০] করায়ত্ত করে ফেলবে। (এখানে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই আমি ক্রীড়াজগতের পরিসংখ্যানের কথাটি মাথায় রাখছি। তবু রোম্যান্টিসিজমকে ত্যাগ করছি আর নিজেদের কাছেই জানতে চাইছি "এরকম একটি দৃষ্টিভঙ্গি তার কাছে কেমন লাগবে, ইতিমধ্যেই যে নিজের বাজিটি ধরার সংকল্প গ্রহণ করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, অভিনিবেশ সহকারে খেলার নিয়মটিকে বোঝার চেষ্টা করবে সে।"

পৃথিবীকে মোকাবিলা করার পাশাপাশি আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হবে, পুরনো পরিসংখ্যানগুলোকে ভেঙে ফেলা। বিরুদ্ধতা এবং শব্দক্রীড়া ছাড়া কী করেই বা তা সম্ভব? একদিকে অ্যাবসার্ড আমাদের বলে যে, সমস্ত অভিজ্ঞতাই গৌণ, অন্যদিকে তা আমাদের অসংখ্য অভিজ্ঞতার দিকে ঠেলে দেয়। তাহলে কী করে কেউ জীবনের সেই রূপটিকে বেছে না নিয়ে পারবে, যা মানববিদ্যার সম্ভাব্য দিকটিকে আমাদের সামনে তুলে ধরে (এ ধরনের বেশ কিছু লোকের কথা আমি আগেও বলেছি) এবং একটা মানদণ্ড বেঁধে দেয়। আবার, তাকে প্রত্যাখ্যানের দাবিও করে।

এসব সত্ত্বেও অ্যাবসার্ড এবং অ্যাবসার্ডের বৈপরীত্যভরা জীবন আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা দেয়। কারণ, আমাদের এই ভাবনাটাই ভুল যে, আমাদের অভিজ্ঞতার সমগ্র

পরিমাণটি আমাদের জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিগুলির উপরে নির্ভরশীল। কিন্তু তা নয়। বস্তুত গোটা ব্যাপারটা নির্ভর করে আমাদের নিজেদেরই উপরে। এখানে আমাদের অতি সরলীকরণের প্রয়োজনীয়তা আছে। যে দুজন মানুষ একই পরিমাণ আয়ু পায়, জগৎটা সবসময়ই তাদের সেই পরিমাণ অভিজ্ঞতাই প্রদান করে। সুতরাং আমাদেরই দায়িত্ব ওদের সম্পর্কে সজাগ থাকা। কারুর জীবন সম্পর্কে সজাগ থাকা মানে তার বিদ্রোহ, তার স্বাধীনতা এবং যতোটা সম্ভব তার জীবনটাকেও অনুভব করা। যেখানে স্পষ্টতার প্রাধান্য, মূল্যবোধের মানদণ্ড সেখানে গুরুত্বহীন। ব্যাপারটিকে আরও সরলভাবে ব্যাখ্যা করা যাক। ধরা যাক, একমাত্র বাধা, "সাফল্য অর্জনের একমাত্র অক্ষমতা"—ইত্যাদি সবই ঘটে অকালমৃত্যুর কারণে। এভাবে কোনও গভীরতা, কোনও আবেগ, কোনও আকুতি এবং কোনও আত্মত্যাগ চল্লিশ বছরের সচেতন জীবন এবং ষাট বছরের ব্যাপ্ত[৩১] সুবোধ্যতাসম্পন্ন অ্যাবসার্ড মানুষের দৃষ্টিতে সমতুল্য হতে পারে না (এমনকি যদি সে তেমন চায়ও)। পাগলামো আর মৃত্যু মেরামতযোগ্য নয়। একাধিক পছন্দের পসরা থেকে মানুষের বেছে নেওয়ার কোনও অবকাশ নেই। সুতরাং অ্যাবসার্ড এবং তার সঙ্গে জড়িত বাড়তি জীবন মানুষের ইচ্ছাধীন নয়, তা যার ইচ্ছাধীন তার নাম "মৃত্যু"।[৩২] শব্দের নিবিড় মূল্যায়নেও মোটের উপর বোঝা যায় যে, প্রসঙ্গটা কপালের। এ বিষয়ে ব্যক্তিকে সম্মতিজ্ঞাপনে সমর্থ হতে হবে। কুড়ি বছরের ব্যাপ্ত জীবন এবং সে জীবনের অভিজ্ঞতার কখনই কোনও বিকল্প মিলবে না।

কিন্তু গ্রিকদের মতো অত্যন্ত সজাগ জাতির মধ্যেও কিছু সেকেলে অসঙ্গতি রয়েছে। তাই, তারা বলে যে, যাদের অকালমৃত্যু ঘটেছে, তারা ভগবানের প্রিয়পাত্র। এটা তখনই সত্য হবে, যখন আপনি বিশ্বাস করতে রাজি থাকবেন যে, ভগবানের উদ্ভট রাজ্যে প্রবেশ করার অর্থ হলো, চিরতরে এই পৃথিবীর অনুভূতি, এই অনুভূতিসঞ্জাত বিশুদ্ধ আনন্দকে হারিয়ে ফেলা। সর্বক্ষণের অতন্দ্র আত্মার কাছে বর্তমান এবং বর্তমানের পরম্পরাটি অ্যাবসার্ড মানুষের কাছে আদর্শ। কিন্তু "আদর্শ" শব্দটিকে এখানে মিথ্যের মতো শোনায়। এটা তার পেশাও নয়, বড়জোর তার যুক্তিপদ্ধতির তৃতীয় মাত্রা বিশেষ। মনুষ্যেতরের উদ্বিগ্ন সতর্কতা থেকে শুরু করে অ্যাবসার্ডের অনুধ্যান তার ভ্রমণপথের শেষে মানুষী বিদ্রোহের[৩৩] দীপ্ত বহ্নিশিখার কেন্দ্রস্থলে ফিরে যায়।

এভাবে অ্যাবসার্ড থেকে আমি যে তিনটি ফলাফল অর্জন করি, তারা হলো—বিদ্রোহ, স্বাধীনতা এবং দীপ্ত আবেগ। চৈতন্যের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে আমি জীবনের বিধিতে পরিণত হই, যা আসলে "মৃত্যুরই আমন্ত্রণ"। আমি প্রত্যাখ্যান করি আত্মহত্যাকে। মোটা দাগের যে অনুরণনগুলি বেজে চলে এ সময়ে, অবশ্যই তারাও আমার পরিচিত। তা সত্ত্বেও আমি একটি কথা বলতে চাই। সত্যি কি এর প্রয়োজন আছে? নীৎশে যখন লেখেন—"স্পষ্টতই এটা মনে হয় যে, স্বর্গে কিংবা মর্ত্যে শেষ পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট

অভিমুখকে মানতে হবে; পরিণামে একটা সুফল মিলবে, যার জন্যে মনে হবে যে, পৃথিবীতে কষ্ট করে বেঁচে থাকার সার্থকতা আছে। যেমন, গুণ, কলা, সঙ্গীত, নৃত্য, যুক্তি, মন—যা কিছু রূপান্তরিত হবে, যা কিছু পরিমাণে খানিকটা কোমল, পাগলাটে বা পবিত্র।"—তখন তিনি বিশদভাবে গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালাগুলির ব্যাখ্যাই সেখানে দেন। কিন্তু তিনি অ্যাবসার্ড মানুষের পথটিকেও আমাদের সামনে তুলে ধরেন। শিখাটিকে মান্য করা সব থেকে সোজা এবং সব থেকে কঠিন, দুটোই। যাক গে, মাঝেমধ্যে নিজেই নিজের মূল্যায়ন করা ভালো। কারণ, কেবল নিজের পক্ষেই এটা করা সম্ভব।

আল্যাঁ[৩৪] বলেছিলেন, "চিন্তাগুলি যখন রাত্রিভারানত হয়ে ওঠে, তখনই "প্রার্থনা" কোরো। কিন্তু মিস্টিক ও অস্তিত্ববাদীরা এর উত্তরে বলবেন, "মন তো রাতের সঙ্গে মিলিত হবেই।" ঠিকই তা-ই। কিন্তু মুদ্রিত চোখের পাতার ভেতরে এবং মানুষের নিভৃত ইচ্ছের ভেতর দিয়ে জন্মায় যে অন্ধকার ও সূচীভেদ্য রাত, যার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে মন তাকে জাগিয়ে তোলে, সে রাত নয়। বরং মন যদি সত্যি কোনও রাতের মুখোমুখি হতেই চায়, তবে তা হোক ওই হতাশার রাত, সারাক্ষণই যা বেশ স্বচ্ছ—মেরু রাত্রি, মনের প্রহরী—সম্ভবত যেখান থেকে উদ্‌গত হয় সেই শ্বেত ও কুমারী উজ্জ্বলতা, যা বুদ্ধির আলোয় আঁকে প্রতিটি বস্তুর রূপরেখা। এ পর্যায়ে আবেগী বোঝাপড়ার মোকাবিলা করে সমতা। এর পরে আর অস্তিত্ববাদী উৎক্রমণের প্রশ্নই ওঠে না। তা মানবিক প্রবণতার যুগবাহিত দেয়ালচিত্রের মধ্যে নিজের অবস্থানটিকে চিহ্নিত করে নেয়। সজাগ দর্শকের পক্ষে এই উৎক্রমণ এখনও অ্যাবসার্ড। যতটা পর্যন্ত সে কূটাভাসটির সমাধান করতে পারবে বলে মনে করে, তার পুরোটাকেই সে ফের বহাল করে। সেদিক থেকে এটি সাড়া জাগায়। সেদিক থেকে সব-ই যার যার নিজের জায়গাটি ফিরে পায় এবং অ্যাবসার্ড জগৎটি তার সমস্ত ঔজ্জ্বল্য ও বৈচিত্র্য সমেত নবজন্ম লাভ করে।

কিন্তু থেমে যাওয়া খারাপ। একপেশে দৃষ্টি নিয়ে খুশি থাকা শক্ত। দ্বন্দ্ব ছাড়া এগোনো সম্ভবত যাবতীয় আধ্যাত্মিক গতির সূক্ষ্মতম দিক। পূর্বসূরীরা কেবল চিন্তাপদ্ধতির ব্যাখ্যা করেন। জীবনের লক্ষ্য তো বেঁচে থাকা।

— — — —

# L’ HOMME ABSURDE

# অ্যাবসার্ড মানুষ

১

বিশ্বাস করার সময়েও স্তাভ্রোজিনের মনে হয় না যে, তিনি বিশ্বাস করেন। আবার বিশ্বাস না করার সময়েও তার মনে হয় যে, তিনি বিশ্বাস করেন না।

—‘‘ভূতাবিষ্টেরা’ (Les possédes)[৩৫]

গ্যোয়টে একবার বলেছিলেন, "সময়ই আমার ক্ষেত্র"। কথাটি অবশ্যই অ্যাবসার্ড। কিন্তু, অ্যাবসার্ড-মানুষই বা বলে কাকে? তাকেই, যে শাশ্বতকে শুধু নাকচ করে, এছাড়া অন্য কিছু না। এমন নয় যে, নস্ট্যালজিয়া তাকে আমাদের কাছে অপরিচিত করে তোলে। কিন্তু নিজের সাহস এবং যৌক্তিকতাকে সে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সাহসিকতা তাকে আপিল না করেই বেঁচে থাকার শিক্ষা দেয়—নিজের সঞ্চয়টুকু সম্বল করে চলার শিক্ষা দেয়। যৌক্তিকতা বেঁধে দেয় তার সীমানা। নিজের সাময়িক আংশিক-স্বাধীনতা, ভবিষ্যৎহীন বিদ্রোহ এবং নশ্বর চৈতন্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সে তার জীবনের কাল-খণ্ডে অ্যাডভেঞ্চারে সামিল হয়। এটাই তার ক্ষেত্র, তার কর্মপ্রকৃতি। এখানে বাকি লোকের বিচারধারা থেকে তার বিচারধারা পৃথক, যার ভেতরে সে নিজেকে বেঁধে রাখে। তার কাছে মহত্তর জীবন মানে অন্য একটা জীবন নয়। সেটা অসমীচীন। অবশ্য আমিও এখানে তেমন কোনও ছেদো নিত্যতার কথা বলছি না, যা ভাবীকাল নামে অভিহিত। মাদাম রলঁ[৩৬] ছিলেন আত্মনির্ভরশীল। তাঁর ওই একগুঁয়েমির জন্য তিনি সাজাও পেয়েছেন। ভাবীকাল সানন্দে তাঁর কথার উদ্ধৃতি দেয়, কিন্তু তাঁর মূল্যায়ন করতে ভুলে যায়। মাদাম রলঁ ভাবীকাল সম্পর্কে উদাসীন।

নৈতিক আদর্শ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণের প্রশ্নটি সম্ভবত এখানে অবান্তর। আমি দেখেছি, অনেক নৈতিক আদর্শ সম্পর্কেই সাধারণ মানুষের মনোভাব বেশ খারাপ এবং প্রতিদিনই লক্ষ্য করি যে, সততার জন্যে কোনও বিধিনিষেধ প্রয়োজনহীন। অ্যাবসার্ড মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য একটাই মাত্র নৈতিক বিধি আছে। সেটি ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এবং মানুষের কাছে শিক্ষামূলক। যদিও তার অবস্থান ঈশ্বরের চৌহদ্দির বাইরে। বাকি ক্ষেত্রে (অর্থাৎ অনৈতিকতার কথা বলছি) অ্যাবসার্ড মানুষ যৌক্তিকতার (justifications) বাইরে কিছুই খুঁজে পায় না এবং সেখানে যৌক্তিকতা নির্ণয়ের মতো নেইও কিছু। মানুষের নির্দোষিতার এই মূল নীতিগুলি থেকেই আমার যাত্রা শুরু।

এই নির্দোষিতা ভীতিপ্রদ। "সবই অনুমোদনযোগ্য"—চেঁচিয়ে ঘোষণা করেছিলেন ইভান কারামাজভ। এর ভেতরেও অ্যাবসার্ডের ভাব আছে। কিন্তু ঈপ্সিত কারণেই এটিকে স্থূল অর্থে নেওয়া যাবে না। জানি না, উক্তিটিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা এটি কি মুক্তি বা আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস, না কি একটি তিক্ত ভাবের ইঙ্গিত! জীবনকে ঈশ্বর একটা মানে দিয়েছেন—এই নিশ্চয়তা শাস্তি-ব্যতিরিক্ত দুষ্কর্মের আকর্ষণী ক্ষমতাকে বহুলাংশে ছাপিয়ে যায়। পছন্দমতো বেছে নেওয়ার ব্যাপারটি এখানে কঠিন

হবে না। কিন্তু যেখানে পছন্দ করারই প্রশ্ন নেই, সেখানেই তিক্ততা শুরু হতে থাকবে। অ্যাবসার্ড মুক্তি দেয় না, বেঁধে রাখে। সব কাজকেই তা মান্যতা দেয় না। "সবেরই অনুমতি আছে"—কথার অর্থ এ নয় যে, নিষিদ্ধ কিছু নেই। যাবতীয় কাজের পরিণামকে অ্যাবসার্ড বড় জোর একটা সামঞ্জস্য দান করে। অপরাধমূলক কাজকে অ্যাবসার্ড অনুমোদন করে না। কারণ, তা শিশুসুলভ হয়ে উঠবে। কিন্তু তা অর্থহীন অনুশোচনার উদ্বোধন ঘটায়। এভাবে সমস্ত অভিজ্ঞতাই যদি নিরাসক্ত হয়ে ওঠে, তাহলে তুলনামূলকভাবে কর্তব্যও হয়ে ওঠে বৈধ। খেয়ালখুশিমতো কেউ গুণীজন হয় না।

নৈতিকতাগুলির ভিত্তি এই যে, প্রতিটি ঘটনারই কিছু কিছু পরিণতি আছে, যেগুলি নিজেদের বৈধ করে নেয় বা বাতিল করে। অ্যাবসার্ডপ্রভাবিত মন সাধারণভাবে ঠিক করে নেয় যে, ওই পরিণতিগুলোকে শান্তভাবেই গ্রহণ করবে সে। মূল্য চুকিয়ে দেওয়ার জন্যে সে প্রস্তুত থাকে। অন্যভাবে বলা যায় যে, দায়িত্ববান লোকদের অস্তিত্ব থাকলেও, কোনও দোষী ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই। মোটের উপরে, এ জাতীয় কোনও মন তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার জন্যে অতীতের অভিজ্ঞতাগুলিকেই সায় জানাবে। সময় সময়কে আরও প্রসারিত করবে, জীবন চলবে তার অভীষ্ট পূরণের পথে। এই ক্ষেত্রভূমিতে তার নিজের প্রাঞ্জলতাটুকু ছাড়া বাকি সব কিছুকেই তার কাছে অপ্রত্যাশিত প্রকৃতির ঠেকে। ফলে, সেই যুক্তিহীন শৃঙ্খলা হতে অন্য আর কোন নিয়মই বা উদ্ভূত হতে পারে? একমাত্র যে সত্যটিকে তার কাছে শিক্ষামূলক বলে মনে হয়, সেটি প্রথানুগ হয় না—সেটি মানুষের মধ্যে উদ্বোধিত ও উদ্‌ঘাটিত হয়। অ্যাবসার্ড মন তার যুক্তিক্রমের অন্তে মানব-জীবনের বর্ণনা ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসগুলি ব্যতীত নৈতিক নিয়মাবলির খুব বেশি খোঁজ চালাতে পারে না। নিচের কিছু ছবি এ ধরনের। এগুলি অ্যাবসার্ড যুক্তিপদ্ধতির বিস্তার ঘটায়, তাকে একটা সুনির্দিষ্ট রূপ ও উষ্ণতা দান করে।

কোনও একটা দৃষ্টান্ত যে বাধ্যতামূলকভাবে আর একটা দৃষ্টান্তের অনুসারী নয় (সম্ভব হলে অ্যাবসার্ড জগতে খুবই স্বল্পভাবে) এবং এই বর্ণনাগুলোও যে সেভাবে কোনও মডেল নয়—এই ধারণাটির পুষ্টিসাধনও কি আমাকেই করতে হবে? তাছাড়া, নির্দিষ্ট কোনও পেশাও থাকতে হবে তার। নইলে যাবতীয় সামঞ্জস্যের অধিকারী হয়েও সে হাস্যকর হয়ে উঠবে, যখন সে রুসোর দৃষ্টান্ত টেনে হামাগুড়ি দেওয়ার কথা বলবে এবং নীৎশের দৃষ্টান্ত টেনে মনে করিয়ে দেবে, মা'র সঙ্গে দুর্ব্যবহারের কথা। এক জন আধুনিক লেখক লিখেছেন, "অ্যাবসার্ড হওয়াটা আবশ্যক। কিন্তু নিজেই তার শিকারে পরিণত হওয়াটা আবশ্যক নয়।" যে প্রবণতাগুলি প্রবল হয়ে দেখা দেবে, সেগুলি শুধুই তাদের বৈপরীত্যগুলির বিবেচনার মাধ্যমে তাদের সমস্ত ভাবগুলিকে অনুমান করে নেবে। পোস্ট-অফিসের সামান্য একজন কেরানিও কোনও বিজয়ীর সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে, যদি তাদের উভয়ের চেতনা সমরূপ হয়। অভিজ্ঞতাগুলি অবশ্য এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ

ভূমিকা পালন করে। এমন জিনিসও কিছু আছে, যেগুলি হয় মানুষের উপকার করে কিংবা তার উল্টোটা। যদি মানুষ সচেতন হয়, তবেই তারা উপকার করে। নতুবা, মানুষকে তারা কোনও গুরুত্ব দেয় না। একজন মানুষের ব্যর্থতার পেছনেও যুক্তি থাকে। ব্যর্থতার জন্যে তার পরিমণ্ডল নয়, মানুষটি নিজেই দায়ী থাকে।

এখানে আমি বিশেষভাবে তাদেরই বেছে নিচ্ছি, যারা নিজেদের নিঃশেষে ক্ষয় করে ফেলতে চায় কিংবা যাদের আমি দেখি যে, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তার চেয়ে বেশি কিছু এখানে নেই। এ মুহূর্তে আমি সেই জগৎটা নিয়েই কথা বলতে চাই, যেখানে জীবনের মতোই চিন্তাগুলোরও কোনও ভবিষ্যৎ নেই। যা কিছুই মানুষকে কাজের প্রেরণা জোগায়, উদ্দীপ্ত করে, আশাকে তাদের ব্যবহার করতেই হয়। যে একচ্ছত্র চিন্তা মিথ্যাভাষণ নয়, তা একটি বন্ধ্যা চিন্তা। অ্যাবসার্ড জগতের কোনও ধারণার বা জীবনের মূল্যকে বন্ধ্যাত্ব দিয়েই পরিমাপ করা হয়।

— — — —

## LE DON JUANISME

# ডন জুয়ানবাদ

যদি অপর্যাপ্তভাবে ভালোবাসা যেত, তবে ব্যাপারটা সহজ হতো খুবই। কেউ যতো বেশি ভালবাসত ততো বেশি অ্যাবসার্ড তৈরি হতে থাকত। ডন জুয়ান যে ক্রমান্বয়ে এক নারী হতে অন্য নারীতে গমন করত, তার কারণ ভালোবাসার অপ্রতুলতা নয়। সামগ্রিক ভালোবাসার অন্বেষণে তাকে একজন মিস্টিক হিসেবে দেখার ব্যাপারটা বড়ই হাস্যকর। তবে হ্যাঁ, এ সত্য যে, সমপরিমাণ উদ্দামতার সঙ্গেই প্রতিটি নারীকে ভালোবেসেছিল সে। প্রতিবারই নিজের সমগ্র সত্তা দিয়ে অবশ্যই নারীদের সে তার হৃদয়ের উপহার ও অতল নিবিড়তা নিবেদন করেছিল। প্রতিটি নারী-ই ভাবত, সে ডন জুয়ানকে যে অর্ঘ্য নিবেদন করছে, আর কেউ কখনও তা তাকে দিতে পারেনি। প্রতিবারই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ছিল তারা এবং তাদের এই পুনরাবৃত্তির উপযোগিতা ডন জুয়ানকে কোনও রকমে বোঝাতে সক্ষম হতো। তাদের একজন বলেছিল, "শেষ পর্যন্ত তোমায় আমি ভালোবাসা দিতে পারলুম।" এতে ডন জুয়ান হেসে ফেললে আমরা কি অবাক না হয়ে পারি? সে বলেছিল, "শেষ পর্যন্ত", "না না, আর একটি বার।" অপর্যাপ্তভাবে ভালোবাসার জন্যে, দুর্লভ ভালোবাসার প্রয়োজন হবে কেন?

ডন জুয়ান কি বিষণ্ণ ছিল? সম্ভবত না। এ কিংবদন্তীতে আমার ততো বিশ্বাস নেই। তার এই হাসি, বিজয়ীর ওই আত্মম্ভরিতা, ওই প্রণয়ক্রীড়া, থিয়েটারপ্রীতি সবই অত্যন্ত প্রকট এবং আনন্দপূর্ণ। সুস্থ সবল প্রতিটি প্রাণী-ই নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চায়। ডন জুয়ানের ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে। কিন্তু বিষণ্ণ হওয়ার পেছনে জনতার দুটি যুক্তি থাকে   প্রথমত, তারা বিষণ্ণতার কারণ জানে না। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতের, জন্যে তারা আশাবাদী। কিন্তু ডন জুয়ান নিজেকে জানে এবং আগামীর জন্যে কোনও আশা পোষণ করে না। তাকে দেখে সেই শিল্পীদের কথা মনে পড়ে, যারা নিজেদের সীমাবদ্ধতা জানে ও কখনই সেই সীমা অতিক্রম করে না এবং ওই বিপজ্জনক বিরতিপর্বে যখন তারা আধিদৈবিক অবস্থান নেয়, সে সময় মহৎ শিল্পীদের চমৎকার সহজাত দক্ষতাকে উপভোগ করে। আর এটাই প্রকৃত প্রতিভা   বুদ্ধিমত্তা, নিজের সীমানা জানে যে। দৈহিক মৃত্যুর

যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত ডন জুয়ান বিষণ্ণতাকে অগ্রাহ্য করেছে। যে মুহূর্তে সে বিষণ্ণতাকে জেনেছে, হাসিতে ফেটে পড়েছে এবং ক্ষমা করে দিয়েছে সবকিছুকেই। যে মুহূর্তে সে আশাবাদী হয়েছে, তখনই বিষণ্ণতা গ্রাস করেছে তাকে। আজ, ওই নারীটির মুখেই অনন্য জ্ঞানের তেতো স্বাদ ও সান্ত্বনাকে খুঁজে পাচ্ছে সে। তেতো? বিষণ্ণ  এই অনতিক্রম্য ব্যর্থতাই সুখকে অনুভবগম্য করে তোলে।

ডন জুয়ানের মধ্যে একজন পাদ্রির প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার প্রবণতা লক্ষ্য করার বিষয়টিকে সম্পূর্ণ-ই মিথ্যে বলা যায়। ভিন্ন একটা জীবনের প্রত্যাশা ব্যতীত, অন্য কোনও গুমোর নেই তার। সে তা প্রমাণ করেছে। স্বর্গেরই বিপ্রতীপ কোনও একটা জীবনের বাজি ধরেছিল সে। সন্তুষ্টির মধ্য দিয়ে বাসনার আকুতি নষ্ট হয়ে যাবে—নিবীর্যের এই তুচ্ছতা তার ভেতরে নেই। এসব মানাতো ফাউস্টকে। শয়তানের কাছে নিজেকে বিক্রয় করার জন্যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করত সে। কিন্তু ডন জুয়ানের কাছে এ বিষয়টা অপেক্ষাকৃত সহজ। মলিনার "বুর্লাদর" নরকভীতির উদ্দেশ্যে বলেছে, "কী দীর্ঘ বিশ্রামই না তুমি দিয়েছ আমায়।" মৃত্যুর পরে কী ঘটে তা অর্থহীন, আর তাদের পক্ষে কী দীর্ঘ প্রলম্বিত সেই দিনগুলি, যারা বেঁচে থাকার কষ্টটাকে জানে। ফাউস্ট লালায়িত হয়েছিল পার্থিব সম্পদের জন্যে; হতভাগ্য মানুষটিকে তাই তার হাত দুটিকে বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল সামনের দিকে। নিজের আত্মাকে প্রায় সে বিকিয়ে দিয়েছিল, যখন তাকে আর আনন্দময় করে তুলতে পারছিল না সে। অন্যদিকে ডন জুয়ান পরিতৃপ্তির জন্যে করেছিল জোরাজুরি। যখন সে কোনও রমণীকে ছেড়ে দিয়েছে, কখনই তার কারণ এ নয় যে, তাকে সে তার কামনীয়া ভাবছে না। সুন্দরী রমণী সবসময়ই তার কাঙ্ক্ষিতা। আসলে, সে তখন অন্য কাউকে কামনা করছে। কাজেই দুটো ব্যাপার এক নয়।

এ জীবনে ডন জুয়ানের সব বাসনারই পরিপূরণ ঘটেছে। নইলে তার চেয়ে খারাপ আর কিছুই হতে পারত না। সে পাগল, অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ। যারা আশায় ভর করে বেঁচে থাকে, তারা জয়ী হতে পারে না। কেননা, করুণা উদারতার কাছে, স্নেহ ওজস্বিনী নীরবতার কাছে এবং মিলন নিঃসঙ্গ সাহসের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সকলেই হড়বড়িয়ে বলে—"লোকটা ছিল দুর্বল, আদর্শবাদী কিংবা এক জন সন্ত।"—এই মহত্ত্বকে উপেক্ষা করতে হবে। কারণ, এ মহত্ত্ব অপমানজনক।

ডন জুয়ানের ভাষণ আর সমগ্র নারী জাতির উদ্দেশে তার মন্তব্যগুলির জন্যে জনতা তার প্রতি যথেষ্টই বিরক্ত। তার অভিসন্ধিমূলক হাসি তার রচিত প্রশস্তিগুলির অবনমন ঘটায়। কিন্তু যে কেউই তার আনন্দের পরিমাণ নির্ণয় করতে যাবে, তাতে গুরুত্ব পাবে একটাই ব্যাপার  ফলপ্রসূতা। যে পাসওয়ার্ডগুলি পরীক্ষাসাপেক্ষ, সেগুলিকে নিয়ে

জটিলতা পাকিয়ে লাভ কী? নারী বা পুরুষ কেউই ওগুলিকে গ্রাহ্য করে না, তাদের উচ্চারিত কথাগুলিকেই শোনে। নিয়ম, প্রথা এবং সৌজন্য তারাই। তাদের কথা আমরা বলেছি। এরপরেও কিছু কাজ বাকি আছে আমাদের। সেজন্যে ইতিমধ্যেই ডন জুয়ান নিজে তৈরি হয়ে নিয়েছে। নৈতিকতার কাছে কেন আত্মসমর্পণ করবে সে? সে মিলোজ-এর মানারার[৩৭] মতো নয়, যে একজন সন্ত হওয়ার জন্যে বাসনার মধ্যে দিয়ে নিজেকে নিন্দিত করে তুলেছিল। নরক তার কাছে প্রলুব্ধ হওয়ার মতোই জায়গা। পবিত্র রোষের সামনে জবাব তার একটাই, যা মানুষের সম্মানের সঙ্গে জড়িত সে কম্যাণ্ডারকে বলে, "আমার মর্যাদা আছে আর আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষাও করেছি। কারণ, আমি একজন নাইট।" কিন্তু নিজেকে অনৈতিক করে তোলার পক্ষে এটাও তার পক্ষে একটা বড় প্রমাদ হয়ে উঠবে। এখানে আর পাঁচ জনের মতোই সেও ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের নৈতিক বাধানিষেধের গণ্ডির ভেতরে রয়েছে। সাধারণত ডন জুয়ান সর্বত্র যেভাবে চিত্রিত হয়েছে, সেভাবেই তাকে যথাযথভাবে চেনা সম্ভব—সাধারণ কোনও প্রলোভক এবং কামকলাবিদ্। সাধারণ প্রলোভক[৩৮] সে—পার্থক্য তার শুধু এখানেই। নইলে অন্যত্র সে সজাগ; আর সেজন্যেই সে অ্যাবসার্ড। যে প্রলোভক সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে, তার জন্যে নিজেকে সে বদলাবে না। অন্যকে প্রলুব্ধ করা তার জীবনের একটা শর্ত। কেবল গল্প উপন্যাসেই কেউ বদলায়, নিজের উত্তরণ ঘটায়। তবে সেক্ষেত্রেও একটি-ই কথা বলবার—কোনও কিছুরই পরিবর্তন ঘটে না, ঘটে রূপান্তর। ডন জুয়ান পরিমাণগত এথিকস স্থাপন করে নিজের গতিপ্রকৃতির মধ্যে, আর একজন সন্ত ঝুঁকে পড়ে উৎকর্ষের দিকে। অ্যাবসার্ড মানুষ তারাই, যারা বিষয়বস্তুর গভীরতায় বিশ্বাসী নয়। উষ্ণ যারা, চোখেমুখে বিস্ময়ের ঘোর যাদের, অ্যাবসার্ড মানুষ দুচোখ দিয়ে তাদের জরিপ করে। তাদের উৎসাহ দেয়, উত্যক্ত করে। অ্যাবসার্ড মানুষের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলে সময়। অ্যাবসার্ড মানুষ সময়-বিবিক্ত নয়। ডন জুয়ান আর রমণী "জোগাড়"-এর কথা ভাবে না। সে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণের (নির্দিষ্ট সংখ্যক নারীর সাহচর্যলাভ) সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সম্ভাবনাগুলিকেও নিঃশেষ করে ফেলেছে। "জোগাড় করা" মানে হচ্ছে নিজের অতিবাহিত অতীত জীবনের সমতা অর্জন। কিন্তু অনুতাপকে, আশারই ভিন্ন এই রূপটিকে ডন জুয়ান প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রতিকৃতিগুলির দিকে সে তাকিয়ে থাকতে শেখে নি।

এই জন্যেই কি সে স্বার্থপর? তার মতে, হয়ত তাই। কিন্তু এখানেও একে অপরকে বোঝা জরুরি। কেউ কেউ জন্মায় কেবলই প্রাণধারণের নিমিত্তে, আবার অনেকে হৃদয়ের ইচ্ছাপূরণের জন্যেও জীবনটাকে পায়। ডন জুয়ানও অন্তত এধরনের কথাই বলত। কিন্তু নিজের সাধ্যমতো বেছে নেওয়া অল্প ক'টি শব্দেই সে তা করত। কারণ, যে

ভালোবাসার কথা আমরা বলেছি, তা চিরন্তনের বিভ্রমে আচ্ছাদিত। আবেগের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ যারা, তারা সকলেই আমাদের শেখায় যে, চিরন্তন-প্রেম বলে কিছু নেই, আছে শুধু ব্যর্থ প্রেম। প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই ছাড়া তীব্র আবেগ মেলা দুষ্কর। সেই প্রেম চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে মৃত্যুর অন্তিম অসঙ্গতিতে। হয় আবেগে উচ্ছলিত হতে হবে, নয়ত কিছুই না। এখানে আত্মহত্যার নানা পদ্ধতি আছে। তাদেরই একটি আত্মার পূর্ণাহূতি এবং আত্মবিস্মৃতি। অনেকের মতো ডন জুয়ানও জানে যে, এটা খুব মর্মবিদারক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সবার মধ্যে কেবল ডন জুয়ানই জানে এবং বেশ ভালো করেই জানে যে, ঘটনাটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয় মহৎ প্রেম যাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে দূরে ঠেলে দেয়, তারা হয়ত সমৃদ্ধ হয় কিন্তু তাদের যারা ভালোবেসেছিল তারা নিঃস্ব হয়ে যায়। এক জন মা কিংবা আবেগী বধূর হৃদয়ের দরজাগুলো নিশ্চিতরূপেই বাইরের দিকটায় বন্ধ। কারণ, বাইরের জগৎ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে তারা। একটি মাত্র অনুভূতি, একটি মাত্র সত্তা, একখানি-ই মুখ—কিন্তু বাকি সবই অবলুপ্ত। এক অন্য ধরনের যে প্রেম ডন জুয়ানকে নাড়িয়ে দিচ্ছে, সে-ই তার মুক্তিদাতা। পৃথিবীর সব মুখগুলিকে এখানে সে বহন করছে এবং সে যে নিজেও মরণশীল, এই সত্যটি জানা থাকায় সে থর থর করে কাঁপছে। ডন জুয়ান বেছে নিয়েছে শূন্যতাকে।

এটা তার কাছে স্পষ্ট করে দেখার বিষয়। আমরা প্রেম বলি তাকেই, যা নির্দিষ্ট কারুর কারুর সঙ্গে আমাদের যুক্ত করে। এখানে সূত্রটি সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গির। তাকে সম্ভব করে তোলে বই ও কিংবদন্তীগুলো। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে আমি শুধু বাসনা, মমতা এবং বুদ্ধির সংমিশ্রণই বুঝি, যা আমাকে এ ধরনের কোনও মানুষের সঙ্গে বাঁধে। এই মিশ্রণটি বাকিদের ক্ষেত্রেও একই নয়। যাবতীয় অভিজ্ঞতাকে একই পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার আমার নেই। এ কারণেই দুজন ব্যক্তির ভাবভঙ্গি একই ধরনের হয় না। অ্যাবসার্ড মানুষ আবারও এখানে সেটিকে বহু করে ফেলে, ঐক্যবদ্ধ করতে পারে না। এভাবে সে অস্তিত্বের একটা নতুন রূপ আবিষ্কার করে, যা তাকে অন্তত ততখানি স্বাধীন করে, যতখানি স্বাধীন করে তাদেরও, যারা তার কাছে এসেছিল। নিজেকে যা যুগপৎ ক্ষণস্থায়ী এবং ব্যতিক্রমী মনে করে, তা ছাড়া মহৎ প্রেম বলে কিছু নেই। ওই সমুদয় মৃত্যু এবং পুনর্জন্মগুলোকে ডন জুয়ানের জীবনের স্তবকরূপে একত্রিত করা হয়েছে। এটাই হচ্ছে তার দানের এবং সঞ্জীবিত করার বিশেষ ভঙ্গিমা। একে কেউ স্বার্থপরতা বলবে কিনা, সে বিচারের ভার আমি অন্যদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি।

যারা মনেপ্রাণে চেয়েছিল যে, ডন জুয়ান শাস্তি পায়, এখানে তাদের কথাই আমি ভাবছি। না, পরকাল বা অন্য কোনও জীবন নয়, এই জীবনেই। তাকে ঘিরে যতো কাহিনি,

কিংবদন্তী এবং বৃদ্ধ ডন জুয়ানকে নিয়ে হাসাহাসি-এ সব নিয়েই আমি ভাবছি। ডন জুয়ান যেন তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। কোনও বিচক্ষণ মানুষের কাছে বার্ধক্য এবং তার লক্ষণগুলো কোনও বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। বস্তুত, সে ততটুকুই সচেতন। তাই এর ভয়াবহতাকে নিজের থেকে লুকোয় না। এথেন্সে একটি মন্দির ছিল, যেটিকে বার্ধক্যের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছিল। সেখানে শিশুদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ডন জুয়ানের ক্ষেত্রে যতো বেশি লোক তাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে, তাকে নিয়ে অপবাদগুলি ততো বেশি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। রোম্যান্টিকদের দেওয়া একটি অভিধাকে এখানে সে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই নির্যাতিত, করুণ ডন জুয়ানকে নিয়ে কেউ বিদ্রূপ করে নি। তাকে করুণা করা হয়েছে, ভাবা হয়েছে যে, স্বর্গ স্বয়ং মুক্তি দেবে তাকে। কিন্তু তা তো হয় নি। যে জগতে ডন জুয়ানকে দেখা গেছে, সেখানে পরিহাসও অন্তর্ভুক্ত। চরম শাস্তিকে খুব স্বাভবিকভাবেই নিয়েছে সে। খেলার নিয়ম এটাই। আর হ্যাঁ, এটাই তার মহত্ত্বের বৈশিষ্ট্য। খেলার নিয়মগুলোকে সবই মানতে হবে। তবু সে নিজেকে অভ্রান্ত মনে করেছে এবং ভেবেছে তার শাস্তি পাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। নিয়তিকে শাস্তি বলা যায় না।

এটাই তার অপরাধ আর এটিকে বুঝতে পারাও কতই না সোজা যে, ধর্মীয় মানুষ কেন নিজেই নিজের শাস্তি ডেকে আনে? মানুষ অর্জন করে নির্মোহ জ্ঞান, যা নাকচ করে দেয় তার নিজেরই যাবতীয় ঘোষণাকে। কাউকে ভালোবাসা এবং তাকে নিজের অধিকারভুক্ত করা, তাকে জয় করা ও ভোগ করা—এগুলোই জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি (এই প্রিয় শাস্ত্রীয় শব্দটিতে একটি তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, যা কামক্রীড়াকেও "জ্ঞান" বলে অভিহিত করে)। ওদের অজ্ঞতার পরিধি যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, ততদূর পর্যন্ত সে ওদের চরম শত্রু। একজন ঐতিহাসিক দেখিয়েছেন যে, প্রকৃত বুর্লাদর খুন হয়েছে ফ্রান্‌সিস্‌ক্যানদের দ্বারা, যারা "জন্ম থেকেই সব দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়া ডন জুয়ানের বাড়াবাড়ি ও দেবনিন্দার একটা পরিসমাপ্তি ঘটাতে" চেয়েছিল। পরে তারা বলেছিল যে, তার উপরে বজ্রাঘাত হয়েছিল। যদিও ডন জুয়ানের এই বিচিত্র পরিণতির প্রমাণ কেউ দেখাতে পারে নি। এর উল্টোটাও প্রমাণ করতে পারে নি কেউ। কিন্তু এটা যে সম্ভাব্য ছিল, তা ধরে নিয়েই আমি বলতে পারি যে, বিষয়টা যুক্তিসঙ্গত ছিল। এখানে আমি শুধু "জন্ম" শব্দটিকে এককভাবে আলাদা করতে চাই এবং সেটিকে নিয়ে খেলা করতে চাই। বেঁচে থাকার বাস্তবতাই সেই জিনিস, যা ডন জুয়ানকে নিষ্পাপতার আশ্বাস দিয়েছিল। কেবল, মৃত্যু থেকেই সে অর্জন করেছিল শাস্তি, যা এখন হয়ে উঠেছে প্রবাদের মতো।

পাথরের ওই সেনাধ্যক্ষটি কীসেরই বা ইঙ্গিত দিতে পারে আর? গতির ছন্দ নিয়ে যে

শীতল মূর্তিটি দাঁড়িয়ে রয়েছে, যে তপ্ত শোণিত আর সাহস প্রথাবিরোধী চিন্তার ঝুঁকি নেয়, তাদের শাস্তি ছাড়া আর কী-ই বা দিতে পারে সে? আবহমান যুক্তি, শৃঙ্খলা, ও নৈতিকতার সমস্ত শক্তি, দেবতার যাবতীয় অচেনা জাঁকজমকগুলো রোষ হয়ে ঝরে পড়ে তার উপরে। ওই বিশাল এবং হৃদয়হীন পাথরটি মূলত সেই শক্তিগুলিরই দ্যোতক, ডন জুয়ান যাদের চিরদিনের জন্যে বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু সেনাপতির অভিমুখ স্তব্ধ হয়েছে সেখানেই। বজ্র এবং বিদ্যুৎ ফিরে যেতে পারে কৃত্রিম স্বর্গে, যেখান থেকে আহূত হয়েছিল তারা। প্রকৃত ট্রাজেডির অবস্থান এদের বাইরে। না, ডন জুয়ান কোনও পাথুরে হাতের আঘাতে মৃত্যু বরণ করে নি। আমি তার এই প্রবাদপ্রতিম বাহাদুরিতে, তার এই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, পৌরুষদীপ্ত উচ্ছল হাসিতে বিশ্বাসী হতে চাই, যা অস্তিত্বহীন এক ঈশ্বরকে জাগিয়ে তোলে। মোটের উপর, আমি বিশ্বাস করি যে, ওই সন্ধেয় ডন জুয়ান যখন আনা'র ঘরে অপেক্ষা করছিল, সেই মুহূর্তে সেনাধ্যক্ষটি সেখানে যায় নি এবং মাঝ রাত্তিরের পর অবিশ্বাসীরা অবশ্যই যুক্তিবাদীদের ভয়াবহ তিক্ততাগুলিকে অনুভব করতে পেরেছিল। এমনকি তার জীবনের সেই কাহিনিটিকেও আমি নির্দ্বিধচিত্তে মেনে নিতে পারি, যার জন্যে সে এক মঠের মধ্যে নিজের জীবনটাকে চাপা দিয়েছিল। নাহ্, এই কাহিনির মহিমায়নের দিকটি কাল্পনিক বলে বিবেচিত হতে পারে না। দেবতার কাছে কী আশ্রয়ই বা আর চাইতে পারত সে? কিন্তু কাহিনিটি ক্ষণ-আনন্দপ্রবণ অস্তিত্বের করুণ পরিণতির চেয়েও আদ্যন্ত অ্যাবসার্ড প্রভাবিত জীবনের কার্যকারণাত্মক পরিণতির ব্যঞ্জনাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। এখানে ইন্দ্রিয়জ আনন্দ তপশ্চর্যায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এটা বোঝা জরুরি যে, এটি তার জীবনের একই দৈন্যদশার দুটি বিপরীত দিক হতে পারে। এর থেকে বীভৎস দৃশ্য আর কী হতে পারে? যখন মানুষের শরীর তার নিজেরই বিরুদ্ধাচারণ করে, শুধু এই কারণে যে, যথাকালে তার মৃত্যু ঘটে নি, তখন মিলনান্তক নাটকের যবনিকা পতনের আগেই সে এসে পড়ে ঈশ্বরের সামনে, যে ঈশ্বরের প্রশংসা সে করেনি কোনওদিন; এখন তাঁরই সেবা করছে, যেভাবে সে নিজের জীবনটা কাটিয়ে এসেছে এতদিন। শূন্যতার সামনে নির্বাকভাবে হাঁটু গেড়ে বসে হাত দুটি সে প্রসারিত করে দিয়েছে স্বর্গের দিকে, এই উপলব্ধি নিয়ে যে, তার নিজেরও কোনও গভীরতা নেই।

ডন জুয়ানকে আমি পাহাড়-চুড়োর গোপন স্প্যানিশ মঠগুলির কোনও একটির গুহায় দেখতে পাচ্ছি। সেখানে সূর্যতাপিত দেয়ালের সরু ফালির ভেতর দিয়ে তার চোখে যদি কিছু পড়ে, তবে সম্ভবত সেটা তার বিগত প্রেমের অপচ্ছায়া নয়, বরং বিশাল, নিঝুম, নিষ্ঠুর স্প্যানিশ মাঠগুলো, যেখানে নতুন করে নিজেকে খুঁজে পায় সে। হ্যাঁ, এই বিষণ্ণ এবং উজ্জ্বল দৃশ্য দিয়েই যবনিকা পতন। এই চূড়ান্ত সমাপ্তির জন্যে আমাদের অপেক্ষা আছে, প্রত্যাশা আছে, কিন্তু প্রাপ্তি বড়ই নগণ্য।

— — — —

# LA COMÉDIE

## নাটক

হ্যামলেট বলেছিল, "থিয়েটারই সেই ফাঁদ, যেখানে আমি বিবেককে "পাকড়াবো (অন্তরিণ করব)"। "পাকড়ানো" দারুণ একটা শব্দ। কারণ, বিবেক ছোটে খুব দ্রুত, নয়ত নিজেকে গুটিয়ে নেয়। তাই তাকে পাকড়াতে হবে ডানায়, পাকড়াতে হবে সেই অকিঞ্চিৎকর মুহূর্তে, যখন চঞ্চল দৃষ্টিতে ডানা ঝাপটাচ্ছে সে। রোজকার মানুষ গড়িমসি পছন্দ করে না। কেননা, সারাক্ষণই তাড়া থাকে তার। কিন্তু নিজের বিষয় ছাড়া, অন্য কিছুতে সে উৎসাহ পায় না। সে যা হতে চায়, বিশেষত তাতেই থাকে তার উৎসাহ। তার থিয়েটারপ্রীতির মধ্যেও দেখা যায়, নাটকের বিভিন্ন বাঁকগুলির মধ্যে করুণ অংশগুলিকে ছেড়ে দিয়ে বাকি জায়গাগুলি থেকেই রস গ্রহণ করছে সে। এখানে আমরা একজন অপরিণামদর্শী লোককেই দেখি, এবং জানি না, কোন্ আশার দিকে ছুটছে সে। যে জায়গাটা অন্যে ছেড়ে যায়, অ্যাবসার্ড মানুষ সেখান থেকেই যাত্রা শুরু করে। সেখানে অভিনয়ের প্রতি মুগ্ধতা সরিয়ে রেখে অ্যাবসার্ড মন চায় অভিনয়ের ভেতরে ঢুকতে। চরিত্রগুলির অন্দরে প্রবেশ করে, তাদের বিচিত্রতাকে অনুভব করে, সেগুলিকে অভিনয়ে ফুটিয়ে তোলে। আমি বলছি না যে, অ্যাবসার্ড মানুষ হওয়ায় অভিনেতারা সাধারণভাবে এ আবেদনটিকে মান্য করে। কিন্তু অভিনেতাদের নিয়তি হলো অ্যাবসার্ড নিয়তি, যা যেকোনও সূক্ষ্মদর্শী মনকেই প্রলুব্ধ করে নিজের দিকে টেনে নিতে পারে। যাতে আমার পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলো অনুসরণ করতে আপনাদের কোনও ভুল না হয়, সেজন্যেই এখানে এ প্রসঙ্গটির অবতারণার প্রয়োজন বোধ করছি।

অভিনেতা রাজ করে নশ্বরতার গণ্ডিতে। অভিনেতার খ্যাতি যে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, সবারই তা জানা। অন্তত, জনতা নিজেদের মধ্যে এরকমই বলে থাকে (যেমন, বাংলায় একটা কথা আছে—দেহপট সনে নট সকলই হারায়—অনুবাদক)। কিন্তু সব খ্যাতিই তো ক্ষণস্থায়ী। সিরিউসের দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্যোয়টের সমস্ত কীর্তি দশ হাজার বছরের মধ্যে ধুলোয় মিশে যাবে এবং তাঁর নামও মানুষ ভুলে যাবে। হয়ত হাতে গোনা কয়েকজন পুরাতত্ত্ববিৎ অবসিত যুগের "প্রমাণগুলোর" অনুসন্ধান করবে। এ ধারণাটিতেও কিছু না কিছু শিক্ষণীয় আছে, যা চিরন্তন। গভীর চিন্তা আমাদের

উদ্বেগগুলিকে সংহত করে সেই প্রগাঢ় উচ্চতায়, নিরাসক্তির ভেতরে পাওয়া যায় যাকে। এই উচ্চতা আমাদের যাবতীয় পূর্বসংস্কারগুলিকে পরম নিশ্চিতির দিকে চালিত করে অর্থাৎ তাৎক্ষণিকের দিকে। খ্যাতির মধ্যে যেগুলি সব থেকে কম ছলনাময়ী, সেগুলি-ই আজও টিকে আছে।

খ্যাতির প্রকারভেদ আছে। তাদের মধ্যে থেকে প্রতিষ্ঠিত এবং পরীক্ষিতগুলোকেই একজন অভিনেতা বেছে নেয়। সবাইকেই একদিন বিনাশপ্রাপ্ত হতে হবে—এই সত্যটি থেকে অভিনেতা তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটিতে পৌঁছোয়। অভিনেতাটি হয় সফলতা পায়, নয়তো পায় না। প্রশংসিত না হলেও একজন লেখকের আশা থাকে। সে ধরে নেয় যে, সে কেমন ছিল, সে পরিচয় তার লেখায় ভবিষ্যতেও মিলবে। কিন্তু একজন অভিনেতা বড় জোর কিছু ফোটোগ্রাফের সঞ্চয় রেখে যায়। সেখানে অন্য কোনও পরিচয় তার থাকে না। তার অভিনয়ের বিশেষ শৈলী বা নৈঃশব্দ্যগুলি, প্রেমকে কেন্দ্র করে তার আবেগ ও দীর্ঘশ্বাস, কোনও কিছুই উত্তর-কাল পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। কোনও অভিনেতাকে না জানা মানে, তার অভিনয়ও না করা এবং তার অভিনয় না করা মানে সে যত চরিত্রকে রূপ দিয়েছিল বা নতুন জীবন দিয়েছিল, সেগুলিকে একসঙ্গে নিয়ে শত বার মরে যাওয়া।

সুতরাং প্রশ্ন উঠতেই পারে, সৃষ্টিশীলতার সর্বাধিক তাৎক্ষণিকতার উপরে নির্মিত কোনও নশ্বর খ্যাতিকে ঘিরে কেনইবা আমরা এতো বিস্ময় প্রকাশ করব? কোনও অভিনেতা তো মাত্রই তিনটি ঘণ্টা পায় ইয়াগো, আলসেস্ত, ফেদ্‌র্‌ বা গ্লচেস্টার হওয়ার জন্যে[৩৯]। পঞ্চাশ স্কোয়্যার ফুট পাটাতনের উপরে এই সীমিত সময়সীমার ভেতরে সে তাদের মতো করে জন্মায় এবং মারা যায়। আগে অ্যাবসার্ডকে এতো বিস্তৃতভাবে, এতখানি সময় দিয়ে পরিস্ফুটিত করা হয় নি। মাত্র কয়েক ঘণ্টা মঞ্চের চৌহদ্দির মধ্যে পরিস্ফুট ওই সব আশ্চর্য জীবন, ওই রকম অসাধারণ পরিপাটি গ্রন্থিমোচনের এর চেয়ে আর কোন সহজ উপায়ই বা অ্যাবসার্ডের জন্যে কল্পনা করা যেতে পারে? মঞ্চের বাইরে সিগিস্‌মোঁদ (বা সিগিস্‌মুণ্ড)[৪০] কিছুই নয়। দু ঘণ্টা পরে তাকে আমরা শহরে গিয়ে খাওয়াদাওয়া সারতে দেখি। তারপর, তো এই জীবনটা একটা স্বপ্ন। কিন্তু সিগিস্‌মোঁদ—এর পরেও মানুষ রয়ে যায়। একদা যে নায়ক দোলাচলচিত্ততায় ভুগত, সে-ই পরে প্রতিশোধস্পৃহ কোনও ক্রুদ্ধ মানুষে পরিণত হয়। এভাবে একজন অভিনেতা কয়েক শ' বছর ধরে ওই চিন্তাভাবনাগুলিকে বহন করে চলে। সাধারণভাবে কোনও মানুষের যেরকম হওয়ার কথা, একজন অভিনেতা তাকে সেভাবেই অনুকরণ করে থাকে। অ্যাবসার্ড চরিত্রটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে সে। অ্যাবসার্ড চরিত্রটি প্রকৃতপক্ষে এক

পর্যটক। ফলে একজন পর্যটকের মতোই অভিনেতাটিও কিছু জিনিস বর্জন করে এবং তারই মতো পথ চলতে থাকে অবিরাম। সময়ের পর্যটক সে, মোটের উপর অন্তরাত্মা দ্বারা চালিত। প্রবল নৈতিকতা কখনও কোনও রসদ খুঁজে পেলে, তা পেত এই বিচিত্র রঙ্গমঞ্চেই। চরিত্রগুলি থেকে অভিনেতা কতটা লাভবান হয়, তা বলা খুবই কঠিন। আর তা তত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও নয়। তবে এটা অবশ্যই জ্ঞাতব্য যে, ওই অপরিবর্তনীয় (অবৈকল্পিক) চরিত্রগুলির সঙ্গে কোনও অভিনেতা নিজেকে কতখানি একাত্ম করতে সক্ষম? প্রায়ই দেখা যায় যে, চরিত্রগুলিকে দেশ-কালের প্রভাব কাটিয়ে সে ফুটিয়ে তোলে। চরিত্রগুলি অভিনেতাকে সঙ্গ দেয়, কিন্তু অভিনেতাটি সহজে নিজেকে অতটা পাল্টাতে পারে না। অনেকসময়ই দেখা যায়, হাতে পান পাত্র তুলে নেওয়ার সময়, তার মধ্যে হ্যামলেটের কাপ হাতে নেওয়ার প্রচলিত ভঙ্গিটি ফিরে আসে। নাহ্, যে চরিত্রগুলিকে সে জীবন্ত করে তুলতে চায়, তাদের থেকে তার দূরত্ব ততোটা বেশি নয়। সে প্রতিটি মাসের, প্রতিটি দিনের অফুরন্ত ছবি ফুটিয়ে তোলে। ফলে, বাস্তবতার এত রূপ সেখানে মেলে যে, মানুষের চাওয়া এবং তার হয়ে ওঠার কোনও সীমান্ত থাকে না। চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে প্রতিটি ক্ষেত্রে সবসময়ই সে নির্দেশ দেয় যে, আরও ভালোভাবে তাদের ফুটিয়ে তুলতে হবে। কারণ এটাই তার শিল্প : চূড়ান্তভাবে বানিয়ে তোলা, অভিনেয় চরিত্রগুলির সেই জীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা, যে জীবনটা তার নিজের নয়। তার এই সাধনার শেষে তার পেশাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে সর্বান্তঃকরণে কোনও কিছু বা বহু কিছু না হতে চেষ্টা করা। কোনও চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে তাকে যত কম সময়-সীমা বেঁধে দেওয়া হয়, ততই তার অধিক প্রতিভার প্রয়োজন হয়। চরিত্রগুলির আধারে নির্ধারিত তিন ঘণ্টার মধ্যেই সে মরতে যাবে। তিন ঘণ্টা ধরে সে অভিনয় করবে এবং অসাধারণ একটি জীবনকে মূর্ত করে তুলবে। একেই বলে, নিজেকে আবিষ্কারের লক্ষ্যে নিজেকেই লুপ্ত করে নেওয়া। ওই তিন ঘণ্টায় সে জীবনের অর্গলমুক্ত পথটি পরিক্রমা করে, গ্যালারির দর্শকের পক্ষে যে পথটি পরিক্রমা করতে সারা জীবন লেগে যায়।

ক্ষণস্থায়ী মূকাভিনয় ও অভিনেতা নিজেকে শুধু বাহ্যিক রূপের জন্য প্রশিক্ষিত ও সুদক্ষ করে তোলে। শারীরিক কিছু মুদ্রা আর কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে নিজের অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করাটাই থিয়েটারের ঐতিহ্য। কারণ, কণ্ঠস্বর হলো শরীরের আত্মার মতো। অভিনয়শিল্প দাবি করে যে, সব কিছুই হবে অতিরঞ্জিত এবং সব কিছুই রূপান্তরিত হবে শারীরিকতায়। মানুষ যেভাবে প্রেম করে মঞ্চেও যদি সেভাবেই প্রেমের দৃশ্য করতে হয়, হৃদয়ের অনন্য কণ্ঠস্বরকে সেভাবেই প্রয়োগ করতে হয়, যেভাবে মানুষ

কারুর দিকে তাকায় সেই দৃষ্টিনিক্ষেপণটিকেই যদি তুলে ধরতে হয়, তাহলে আমাদের ভাষায় কিছু কোড প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে নৈঃশব্দ্যগুলিও যেন শ্রুত হয় এখানে। প্রেম উদাত্ত করে তোলে কণ্ঠস্বরকে এবং নিশ্চলতা নিজেকেই করে তোলে দৃশ্যগ্রাহ্য। শরীরই রাজা। সকলেই "নাটুকে" নয় এবং এই অসমীচীন নিন্দিত শব্দটি পুরো একটা নন্দনতত্ত্ব এবং একটা নীতিবোধকে একেবারে নিজের চৌহদ্দির অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছে। মানুষের জীবনের অর্ধেকটাই কেটে যায় কিছু বোঝাতে, মুখ ফিরিয়ে থাকতে, চুপ থাকতে থাকতে। অভিনেতা এখানে একজন অনধিকার প্রবেশকারী। যে মন্ত্রের বাঁধনে তার প্রাণটি বাঁধা, সেই বাঁধন সে ভেঙে ফেলে, আর অবশেষে তার আবেগরাশি মঞ্চগুলিতে প্রবাহিত হয়ে যায়। অভিনয়ের প্রতিটি মুদ্রাকে ফুটিয়ে তোলে সে, উচ্চকিত কান্নার ভেতর দিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এভাবে অভিনয়োপযোগী করে চরিত্রগুলিকে নিবেদন করে। তাদের একটা নক্শা বা ভাস্কর্য রচনা করে। তাদের কাল্পনিক রূপের ভেতরে প্রবেশ করে এবং তাদের ছায়ামূর্তিতে প্রাণসঞ্চার করে। এখানে অবশ্য আমি সেই বিখ্যাত নাটকগুলির কথাই বলছি, যেগুলি অভিনেতাকে তার পূর্ণাঙ্গ শারীর-অভিনয়ের *সুযোগ* দেয়। শেক্স্পীয়রের কথাই ধরুন, তাঁর নাটকে, চরিত্রের প্রাথমিক উত্তেজনাগুলি শারীরিক আবেগের মধ্য দিয়ে নৃত্যে পরিণত হয়। সেই আবেগই সমস্ত কিছুকে ব্যাখ্যা করে, যাকে বাদ দিলে গোটা নাটকটারই ভিত নষ্ট হয়ে যায়। রাজা লীয়র কখনই উন্মত্ততার মুখোমুখি হতে পারতেন না, যদি তিনি কর্ডেলিয়াকে নিষ্ঠুরভাবে নির্বাসিত বা এড্‌গারকে ভর্ৎসনার কাজটি না করতেন। এই ঘটনাগুলোই ট্র্যাজিডির উন্মোচন ঘটিয়েছে এবং পরে লীয়রকে উন্মত্ততার দিকে ঠেলে দিয়েছে। দানব এবং তাদের সারাবন্দের (ইংরেজি উচ্চারণ সারাব্যাণ্ড)[৪১] হাতে আত্মাগুলোকে তুলে দেওয়া হয়েছে। কম পক্ষে চারজন পাগল রয়েছে এখানে। একজন ব্যবসা করতে গিয়ে পাগল হয়েছে, একজন পাগল হয়েই ছিল, আর বাকি দুজন যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে পাগল হয়েছে। চারজনই বিকলাঙ্গ, একই দুর্দশার অকথ্য চার মূর্তি।

মানদণ্ড হিসেবে মানব শরীর কখনই যথেষ্ট নয়। মুখচ্ছদ এবং পায়ের চটি, মুখের মেক-আপ (যা মুখটিকে রূপান্তরিত করে বা ফুটিয়ে তোলে তার আপন বৈশিষ্ট্যে), অতিরঞ্জিত বা আটপৌরে সাজপোশাক—রঙমহলের ওই যে জগৎ, তা বাহ্যরূপের মধ্যে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দেয়। কারণ, ওই জগতের যা কিছু, সবই নজর কাড়ার জন্যে। এই শরীর আমাদের সামনে যে জ্ঞান বয়ে আনে, সে-ও আসে অ্যাবসার্ড-মিরাক্‌লের ভেতর দিয়ে। তাই ইয়াগোকে আমি কখনই সম্যক উপলব্ধি করতে পারব না, যদি না তার চরিত্রে আমি অভিনয় করি। যত মন দিয়েই তার কথা শুনি, তাকে সম্পূর্ণত বুঝতে সক্ষম তখনই হই, যখন তাকে দেখতে পাই। অ্যাবসার্ড চরিত্রগুলির অভিনয়ের মধ্যে একটা ধারাবাহিক একঘেয়েমি আছে। একই ঝাপসা ছায়ারেখা, চেনা

ও অচেনার সহাবস্থান প্রতিটি নায়কের ক্ষেত্রে সব সময় একইভাবে চলতে থাকে। মহৎ নাটকগুলিতে অবশ্য এর সঙ্গে অতিরিক্ত একটা স্বরের ঐক্য[৪২] স্থাপিত হয়। সেখানে অভিনেতা নিজের একটা বৈপরীত্যও সৃষ্টি করে—একই ব্যক্তিত্ব তবুও কোথাও যেন আলাদা, একই শরীর, তবু অজস্র সত্তার সমাহার। মানুষ যেসবের মধ্যে বাঁচে, সেগুলিকেই জয় করতে চায়। কিন্তু তার সেই প্রয়াস হয়ে পড়ে অর্থহীন, সেই অধ্যবসায় হয়ে পড়ে ব্যর্থ। অ্যাবসার্ডের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি এখানেই। নিজেরাই অসঙ্গতিপূর্ণ যারা, তারাই কিনা ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হয়! অভিনেতাই সেই ব্যক্তি, যেখানে শরীর এবং মন একসঙ্গে মিশে যায়, যেখানে পরাজয়-বিধ্বস্ত মন তার একান্ত সহযোগীর দিকে ঢলে পড়ে। হ্যামলেট বলেছিল, "তারাই ভাগ্যবান, যাদের রক্ত (আবেগ) এবং বিচারশক্তি এমন সুন্দরভাবে মিশেছে যে, তারা আর ভাগ্যের হাতের বাঁশী হবে না, যে ভাগ্যের হুকুমেই তাদের নিরস্ত হতে হবে।'

চার্চ কী করে অভিনেতাদের এই আচরণকে ভর্ৎসনা না করে পেরেছিল? অভিনয়শিল্পে আত্মার কালাপাহাড়ি বাড়বাড়ন্ত, আবেগের ব্যভিচারিতা ও চিত্তের (যে চিত্ত একটির বেশি জীবনকে স্বীকার করে না ও সব ধরনের বাড়াবাড়ি নিয়ে সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে) কলঙ্কিত ভড়ংকে চার্চ অস্বীকার করেছিল এবং বর্তমানের প্রতি এই শিল্পের টান, প্রটিউসের বিজয় ইত্যাদিকে বাতিল করে দিয়েছিল। কারণ, ওগুলো ছিল চার্চের শিক্ষার বিরোধী। অবিনশ্বরতা একটা খেলা নয়। যে নির্বোধ কোনও নাটককে অবিনশ্বর বলে ভাবতে পছন্দ করে, সে কোনওদিন স্বাধীন হতে পারবে না। "সর্বত্র" এবং "চিরদিন" এ দুয়ের ভেতরে কোনও আপস নেই। সেখান থেকে ওই বহু নিন্দিত পেশা একটি মারাত্মক আত্মিক সঙ্কটকে তীব্র করে তুলতে পারে। "অনন্ত জীবন নয়, অনন্ত প্রাণোচ্ছলতাই গুরুত্বপূর্ণ"—বলেছিলেন নীৎশে। বস্তুত সব নাটকই এই ধারার অন্তর্ভুক্ত।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত আদ্রিয়েন লেকুভ্রোর[৪৩] স্বীকারোক্তিতে (confession) এবং কমিউনিয়নে রাজি ছিলেন, কিন্তু নিজের পেশা ছাড়তে নয়। একারণে স্বীকারোক্তির সুফল তিনি পান নি। ঈশ্বরের চেয়ে নিজের পেশার প্রতি পক্ষপাতে তাঁর আবেগের ঐকান্তিকতা কি অধিক নয়? নিজের পেশাকে শিল্প বলে মনে করতেন বলেই ওই নারী মৃত্যুশয্যায় অশ্রুপ্লুত হয়েও সে পেশার নিন্দেয় সম্মত হন নি। পাদপ্রদীপের সামনেও যা কখনই পারেন নি, সেই বিপুল মহত্ত্ব এভাবে তিনি অর্জন করেছেন। এটি-ই তাঁর সেরা এবং কঠিনতম অভিনয়। স্বর্গ এবং অর্থহীন আনুগত্যের মধ্যে কেউ যখন অসীমকে বেছে নেয় বা ঈশ্বরের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, তখন সেটিকেই ধ্রুপদী ট্র্যাজিডি বলা হয়, যেখানে প্রত্যেককেই তার স্থানটি ধরে রাখতে হয়। সে যুগের অভিনেতারা জানতেন যে, অভিনয় করার জন্যে চার্চ তাদের একঘরে করবে। সুতরাং এ পেশায় প্রবেশ মানে নরককে বেছে নেওয়া। চার্চ তাদেরকেই অপেক্ষাকৃত বৈরীভাবাপন্ন

ঠাওড়েছিল। কয়েকজন সাহিত্যিক প্রতিবাদ করেছিলেন—'কী! মলিয়েরের শেষকৃত্য প্রত্যাখ্যান!' কিন্তু তা শুধু বিশেষ একজনের জন্যেই করা হয়েছিল। সারাটা জীবন বহুমুখী প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে অভিনয়ের পোশাকে মঞ্চের উপরেই যিনি বিদায় নিয়েছিলেন পৃথিবী থেকে। তাঁর ক্ষেত্রে প্রতিভার কথা পাড়া হয়, যা সব কিছুকেই নিষ্কৃতি দেয়। কিন্তু প্রতিভা কাউকেই ক্ষমা করে না। শুধু এই কারণে যে, তা সে করতেই চায় না।

অভিনেতা জানে, তার জন্যে কোন শাস্তি অপেক্ষা করছে। কিন্তু এই মিথ্যে শাস্তি তার জীবনের সম্ভাব্য অন্তিম শাস্তির কাছে কতটুকুই বা গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাপারটা সে আগেই আঁচ করে আর পুরোপুরি মেনেও নেয়। অ্যাবসার্ড মানুষের মতোই একজন অভিনেতার অকাল-মৃত্যুও অপূরণীয়। পক্ষান্তরে, যত মানুষের সে মুখোমুখি হয়েছে, যত শতাব্দী সে পেরিয়ে এসেছে, বাকি আর কিছুই তাদের সমকক্ষ হতে পারবে না। একদিন তো মরতে হবে সবাইকেই। কিন্তু অভিনেতার ক্ষেত্রে, তা সারাক্ষণ, সর্বত্রই সন্দেহাতীতভাবে ঘটে চলেছে। তবু সময় তাকে সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলে এবং তার পাশে নিজের ছাপটিও রেখে যায়।

অভিনেতার ভাগ্য জিনিসটা কী, তা বোঝার জন্যে সামান্য কল্পনাশক্তি থাকলেই চলে। সময়ই সেই আধার, যার মধ্যে সে তার চরিত্রগুলিকে রূপদান করে, তাদের সংখ্যা নির্ণয় করে। একইভাবে সময়ের ভেতরেই সে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। যত সংখ্যক বিচিত্র জীবন সে যাপন করেছে, তত বেশি তাদের থেকে সে নিজের দূরত্ব রচনা করে। এক দিন আসে, যখন অবশ্যই তাকে মঞ্চ এবং পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। ফেলে আসা জীবনটা তখন তার সামনে এসে দাঁড়ায়, স্পষ্ট দেখতে পায় সে। ওই জীবনের শতচ্ছিন্ন রূপটিকে সে অনুভব করে, যা কোনওভাবেই আর মেরামতযোগ্য নয়। এ সব সে জানে এবং মরতে পারে এখন। প্রবীণ অভিনেতাদের জন্যে অবসর-আবাস নির্মাণ করা হয়েছে।

————

# LA CONQUÊTE
## জয়

"উঁহু", জয়ী ব্যক্তিটি বলল, "এমন ভেবো না যে, কাজে মগ্ন থাকতে পছন্দ করি বলে, আমাকে চিন্তাশক্তিহীন মানুষ হতে হবে।" বরং যা বিশ্বাস করি, তাতে নিখুঁতভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারি। বিশ্বাসের জোরটা বেশি হওয়ায় লক্ষ্যটিকে নিশ্চিত ও স্পষ্টরূপে দেখতে পাই। ওদের সম্পর্কে সাবধান, যারা বলে 'বিষয়টাকে খুব ভালোভাবে এ জন্যেই জেনে নি-ই, যাতে তাকে ভালোভাবে প্রকাশ করা যায়।' ফলে, ওরা যদি সেটা না করতে পারে, তা ঘটে ওদের অজ্ঞতা কিংবা অলসতাহেতু বিষয়ের খোলসের বাইরে আটকে যাওয়ায়।

বহুল বিবেচনার কোনও অবকাশ নেই আমার। জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছে মানুষ লক্ষ্য করে যে, বছরের পর বছর ধরে সে একটি সত্যকেই ধ্রুব জেনেছে। তবে সেটিও যদি সুস্পষ্ট হয়ে থাকে, তবে তা জীবনকে সঠিক পথে চালিত করতে পারে। ব্যক্তিমানুষকে নিয়ে আমার গুটিকয় কথা বলার আছে। মানুষ অবশ্যই সোজাসাপ্টাভাবে, প্রয়োজনে, অবজ্ঞা মিশিয়ে তার নিজের কথা বলবে।

মানুষ সেখানেই স্বয়ংপ্রভ, যেখানে যতটা সে বলে, তার চেয়ে বেশি নিজের ভেতরে লুকোয়। আমিও গোপন রাখব অনেক কথাই। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি যে, যারা একক ব্যক্তির বিচার করে, কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে আমাদের যে অভিজ্ঞতার দরকার হয়, তার থেকে অনেক কম অভিজ্ঞতা দিয়েই তারা তা করে থাকে। বুদ্ধি, উদ্দীপক বুদ্ধি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলিকেই শুধু আগাম আন্দাজ করে নিতে পারে। কিন্তু বিশেষ একটা যুগ, তার ভগ্নাবশেষ, তার অন্তঃপ্রবাহিত শোণিত-ধারার সাক্ষ্যে আমাদের মুগ্ধ করে। প্রাচীন যুগ থেকে আমাদের আধুনিক যন্ত্রযুগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে সমাজ এবং ব্যক্তির স্বকীয় গুণগুলির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা এবং তাদের মধ্যে কে কার অনুগত হয়ে কাজ করবে তা খোঁজ করার চেষ্টা করাটা সম্ভবপর ছিল। সম্ভবপর ছিল, প্রথমত, মানুষের মনের সেই জেদি উন্মার্গগামিতার জন্যে। ওই ভঙ্গিতেই তো মানুষ সেবা দিতে এবং সেবা পেতে জন্মগ্রহণ করেছে। দ্বিতীয়ত, এটা সম্ভব ছিল, কারণ, না সমাজ, না ব্যক্তি আজও তাদের সমুদয় শক্তির আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছে।

"আমি দেখেছি যে, বহু মেধাবী ব্যক্তি হল্যান্ডের শিল্পীদের আঁকা শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্মগুলি

দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে থাকে। যেহেতু, ওই শিল্পীরা জন্মেছিল ফ্লান্ডার্সের ত্রিশ বছর ব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সময়। ওই ভয়াবহ সময়ে বেড়ে ওঠা সাইলেশিয়ান কিংবদন্তীর প্রার্থনাগুলিকে লক্ষ্য করে তারা আশ্চর্য হয়েছিল। তাদের বিস্ময়ভরা দৃষ্টির সামনে ধর্মদ্রোহী, ঝঞ্ঝা-বিজয়ী শাশ্বত মূল্যবোধগুলি ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারপরেও অনেকটাই অগ্রগতি হয়েছে।

একালের শিল্পীরা ওই ধরনের পবিত্রতা থেকে বঞ্চিত। এমনকি প্রাথমিকভাবে তাদের শিল্পীজনোচিত মনটির উপস্থিতি সত্ত্বেও—যেটিকে আমি নীরস মন বলতে চাই, সেটির কোনও ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই। কারণ, পৃথিবীর সবাই, এমনকি ওই সন্তটি সমেত প্রত্যেকেই গতিমান। সম্ভবত এই বৈশিষ্ট্যটিকেই আমি সব থেকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি। পরিখাগুলির অভ্যন্তরীণ প্রতিটি ব্যর্থতার রূপ, প্রতিটি নক্‌শা, অলঙ্কার, কিংবা লৌহপিষ্ট প্রার্থনায় শাশ্বত তার নিজের বেশ খানিকটা অংশ হারিয়ে ফেলেছে। সচেতন আমি, আমার সময়ের থেকে নিজেকে বিযুক্ত রাখতে পারি না। তাই ঠিক করেছি, সময়ের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠব। এ জন্যেই ব্যক্তিমানুষকে আমি শ্রদ্ধা করি, কারণ, ব্যক্তিমানুষকে আমার হাস্যাস্পদ এবং লাঞ্ছিত বলে মনে হয়। জয় করার মতো কিছু নেই জেনেও আমি পরাজয়ের কারণগুলি জানতে উৎসুক। ওই কারণগুলি একটি অখণ্ড মনের দাবি করে, যা একই সঙ্গে নিজের পরাজয় এবং তাৎক্ষণিক জয়ের সমান। যে কেউ, যিনি বিশ্বনিয়তির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ, তার কাছে সভ্যতার প্রত্যাঘাত যন্ত্রণাদায়ক। ওই যন্ত্রণাকে আমি আপন করে নিয়েছি এবং তার সঙ্গে যুক্তও হতে চেয়েছি। ইতিহাস এবং শাশ্বতের মধ্যে আমি ইতিহাসকেই বেছেছি। কারণ, আমি নিশ্চয়তা চাই। এখন অন্তত আমি নিশ্চিত। আর যে শক্তি আমাকে ধ্বংস করছে, তাকে অস্বীকারই বা করি কেমন করে?

একদিন না একদিন সে সময়টা আসেই, যখন ভাবুকতা ও কর্মোদ্যোগের কোনও একটিকে বেছে নিতে হয়। এটাকেই পৌরুষের অর্জন বলে। কিন্তু তখনকার মানসিক ভাঙাগড়ার যন্ত্রণাগুলো খুবই অসহনীয়। তাই বলে দৃপ্ত মন কখনও আপস করে না। ঈশ্বর বা সময় তো আছেই, আছে ক্রুশদণ্ড কিংবা তলোয়ারও। পৃথিবীটার একটা উঁচুদরের মানে আছে, যা উদ্বেগগুলিকে জয় করে। কিংবা ওই উদ্বেগগুলি ছাড়া আর কোনও সত্য নেই। সময়ের সঙ্গেই চলতে হবে মানুষকে, মরতেও হবে তার সঙ্গেই। নইলে তাকে এড়িয়ে এগিয়ে যেতে হবে মহত্তর জীবনের দিকে। আমি জানি যে, নিত্যতায় বিশ্বাসী মানুষ আপস করে হলেও এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে সক্ষম। একেই মেনে নেওয়া বলে। কিন্তু এ বিষয়টিকে আমি ঘৃণা করি এবং চাই সবই, বা কিছুই না। যদি আমি কর্মোদ্যোগকেই বেছে নিই, তাহলে ভাববেন না যে, আমার মানসিক কল্পনার জগৎটা আমার কাছে অচেনা হয়ে উঠবে। কিন্তু ওই কর্মোদ্যোগ আমাকে সব কিছু দিতে পারে

না, এবং নিত্যতা থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আমি সময়ের সহযোগী হয়ে উঠতে চাই। আমার হিসেবের খাতায় আমি নস্ট্যালজিয়া বা তিক্ততার কোনওটাকেই রাখতে চাই না। আমি স্পষ্টভাবে শুধু দেখতে চাই। আপনাকে বলছি যে, আগামীকাল আপনি জঙ্গম হয়ে উঠবেন। আপনার এবং আমার কাছে সেটাই এক ধরনের স্বাধীনতা। ব্যক্তি মানুষ কিছুই করতে পারে না, আবার সবই করতে পারে। বুঝতেই পারছেন ওই রকম একটি চমৎকার নিরাসক্ত মুহূর্তে কেন আমি উল্লসিত হয়ে উঠি, একইসঙ্গে তাকে (ব্যক্তি মানুষকে) গুঁড়িয়ে দিই। পৃথিবীটাই তাকে বিধ্বস্ত করে এবং আমি সেই ব্যক্তি, যে তাকে মুক্ত করে দেয়। ব্যক্তি মানুষের সমস্ত অধিকারগুলোই ব্যক্তি মানুষকে ফিরিয়ে দিই আমি।

জয়ীরা জানে যে, শুধু শুধু কর্মোদ্যোগ নিরর্থক। যে কর্মোদ্যোগ মানুষ ও পৃথিবীর পুনর্গঠন করে, তাছাড়া, কোনও কর্মোদ্যোগ নেই আর। মানুষকে কখনই আমি নতুন করে সৃষ্টি করব না। কিন্তু ভাবটা এমন, যেন কেউ না কেউ সেটা করবেই। লড়াইয়ের রাস্তা আমাকে শরীরমুখী করে তোলে। ব্যাপারটা সঙ্কোচের হলেও শরীরই আমার একমাত্র নিশ্চয়তা। তাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না। আমার স্বদেশই আমার স্রষ্টা। এ কারণেই আমি এই অ্যাবসার্ড ও নিষ্ফল প্রয়াসকে বেছে নিয়েছি। এ কারণেই আমি লড়াইয়ের সপক্ষে। আমি আগেই বলেছি যে, এ্র যুগটাও নিজেকে তার মধ্যেই সঁপে দিয়েছে। আজ পর্যন্ত জয়ী'র মহত্ত্ব একান্তই ভৌগোলিক রয়ে গেছে। বিজিত অঞ্চলগুলি দিয়েই ব্যাপারটাকে পরিমাপ করা হয়েছে। শব্দটার অর্থ কেন পালটে গেছে এবং কেন সাধারণভাবে জয়ীর গুরুত্ব নির্ণয় বন্ধ হয়ে গেছে, তার পেছনে কারণ আছে নিশ্চয়ই। মহত্ত্ব পালটে ফেলেছে তার শিবির। তা অবস্থান করছে প্রতিবাদ এবং ভবিষ্যৎহীন আত্মত্যাগের মাঝখানে। সেখানেও পরাজয়ের কোনও গুরুত্ব নেই। জয় অবশ্যই কাম্য। কিন্তু একটি-ই জয় আছে, তা শাশ্বত। আমার ভাবনার সঙ্গে কখনই এটির মেলজোল হবে না। এখানেই আমি ধাক্কা খাই, আটকে পড়ি। বিপ্লব চিরকালই সংঘটিত হয়েছে দেবতাদের বিরুদ্ধে, সেই প্রমিথিউসের আমল থেকে। প্রমিথিয়ুসই ছিল প্রথম আধুনিক বিজেতা। ভাগ্যের বিরুদ্ধে এ হচ্ছে মানুষের দাবি। গরীবের দাবি কথাটা একটা ওজর মাত্র। যদিও, এ তাগিদটিকে শুধু আমি ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যেই চিহ্নিত করতে পারি এবং সেখানেই তার সঙ্গে রচনা করি নিজের সম্পর্ক। তবে ভাববেন না যেন, তাতে আমি কোনও আনন্দ পাই। মৌলিক বৈপরীত্যগুলিকে মনে রেখে আমি আমার মানবিক বৈপরীত্যগুলিকে রক্ষা করে চলি। আমি আমার স্পষ্ট দৃষ্টিটাকে তারই কেন্দ্রে স্থাপন করি, যা নিজেকে নেতিবাচক করে। মানুষের ধ্বংসের প্রাক্-মুহূর্তে তাকে আমি উদ্বেলিত করি এবং আমার স্বাধীনতা, আমার বিদ্রোহ, আমার আবেগ ওই উত্তেজনা, ওই সহজবোধ্যতা এবং ওই ব্যাপক পুনরাবৃত্তির মধ্যে ওই বৈপরীত্যগুলি সংগঠিত হয়।

হ্যাঁ, মানুষ নিজেই তার নিজের সীমানা। এবং সে-ই একমাত্র সীমানা। যদি কিছু সে হতে চায়, তবে তা এই জীবনেরই বৃত্তে। এখন এটা আমি ভালো করেই বুঝেছি। জয়ীরা কখনও সখনও জয়ের কথা, অন্যকে ছাপিয়ে ওঠার কথা বলে। কিন্তু তা সবসময়ই 'নিজেদের ছাপিয়ে ওঠা'র দিকটিকেই ইঙ্গিত করে। বুঝতেই পারছেন, তারা কী বলতে চায়। কিছু কিছু মুহূর্তে প্রত্যেকেই নিজেকে ঈশ্বরের সমকক্ষ বলে ভাবে। অন্তত লোকের কথায় তাই মনে হয়। কিন্তু এমনও হয় যে, কোনও এক উজ্জ্বল মুহূর্তে মানুষ তার মনের আশ্চর্য মহনীয়তাকে অনুভব করে। সাধারণ্যে তারাই জয়ী মানুষ, যারা এই উচ্চতার মধ্যে, এই বিবেকী চৈতন্যের মহত্ত্বের মধ্যে অহর্নিশ আপনাপন জীবনী-শক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট নিশ্চিতি লাভ করে। কথাটা যেন কিয়দংশে গাণিতিক পরিমাপনের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে যায় এবং জয়ীদের ভাগেই পরিমাণটা পড়ে বেশি। কিন্তু সঙ্কটের সময় এরা নিজেদের শক্তির কণামাত্র বেশি প্রয়োগ করতে পারে না। সেজন্যেই বিদ্রোহের দৃপ্ত আত্মার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরেও তারা কখনই মানবিক গলন-পাত্রটিকে পরিত্যাগ করতে পারে না।

সেখানে জীবজগৎকে কর্তিত হতে দেখেও তারা নিজেদের পছন্দসই ও প্রীতিপ্রদ মূল্যবোধ—মানুষ এবং তার নীরবতার সঙ্গেই একাত্ম হয়ে থাকে। একই সঙ্গে এটা তাদের পতন ও সমৃদ্ধির কারক। তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, একটাই বিলাসিতা মানবিক সম্পর্কের বিলাসিতা। মানুষ কেন উপলব্ধি করতে পারে না যে, এই নিরাপত্তহীন বিশ্বে যা কিছু মানবিক এবং একমাত্র মানবিক তা-ই শুধু অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট কোনও তাৎপর্যের কথা ভাবতে পারেও? আতঙ্কিত মুখ, বিপন্ন ভ্রাতৃত্ব, মানুষের মধ্যে এ ধরনের দৃঢ় এবং পবিত্র বন্ধুত্ব—এগুলোই সত্যিকারের ঐশ্বর্য, কারণ, তারা চিরস্থায়ী। এগুলোর মধ্যে মানুষের মন তার নিজের ক্ষমতা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকে। বলতে কি, এটাই মনের নৈপুণ্য। অনেকেই বলেছেন প্রতিভার কথা। কিন্তু, চটজলদিভাবে প্রতিভা কথাটি খুবই চমৎকার, তবে কিনা, আমি গুরুত্ব দেব বুদ্ধিকে। তাহলে তো বলতেই হবে ব্যাপারটা বেশ দারুণও হতে পারে। কেননা, তা (বুদ্ধি) মরুপ্রান্তরকে আলোকিত করে, তাকে শাসন করে। নিজের বাধ্যবাধকতাগুলিকে জেনে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে সে। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিরও মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু এই জানাটাই বুদ্ধির স্বাধীনতা।

আমাদের এটা অজানা নয় যে, সমস্ত চার্চই আমাদের বিরুদ্ধে। অতি মাত্রায় উৎকণ্ঠিত চিত্ত শাশ্বতকে পায় না আর চার্চগুলো পবিত্র বা রাজনৈতিক যাই হোক না কেন, শাশ্বতের জন্যে দাবি পেশ করে। সুখ আর সাহস, শাস্তিদান বা ন্যায়বিচার তাদের কাছে গৌণ। তারা একটা মতবাদ তুলে ধরে এবং বলে যে, সবাইকেই সে ব্যাপারে মতামত দিতে হবে। কিন্তু কোনও বিশেষ মতবাদ বা শাশ্বতকে নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই।

যে সত্য আমার নাগালের মধ্যে, তাকে তো হাত দিয়েই ছোঁয়া যায়। নিজেকে তা থেকে আলাদা করতে পারি না। এ জন্যেই আমাকে দিয়ে আপনি কোনও কিছুই খাড়া করতে পারবেন না—বিজেতাদের কোনও কিছুই আমার মনে দাগ কাটে না, এমনকি তাদের মতবাদগুলোও।

এতদ্‌সত্ত্বেও সব শেষে মৃত্যুরই অধিষ্ঠান। আমরা এও জানি যে, সবেরই শেষ সেটা। এ কারণে সমগ্র ইউরোপের যে সমাধিগুলো আমাদের অনেকেরই মন অধিকার করে রয়েছে, সেগুলো ঘৃণ্য। জনতা যেগুলিকে ভালোবাসে, কেবল সেগুলিকেই সুন্দর করে তোলে আর মৃত্যু আমাদের তাড়িয়ে দেয়, আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়। একেও জয় করতে হবে। শেষ বন্দিশালাগুলো, মড়কের জন্যে খালি হয়ে যাওয়া পাদুয়ার কারগারের বন্দিটি; চিৎকার করতে করতে পরিত্যক্ত প্রাসাদের হলঘর দিয়ে যখন দৌড়োচ্ছিল, ভেনিসের লোকেরা ঘিরে ফেলেছিল জায়গাটা লোকটা শয়তানকে ডাকছিল এবং তার কাছে নিজের মৃত্যু প্রার্থনা করছিল। বিপদ কাটিয়ে ওঠার একটা কৌশল ছিল এটা। এবং এখনও পশ্চিমের কাছে এটা একটা সাহসিকতার চিহ্ন, যা কিছু কিছু স্থানকে নারকীয় করে তোলে, যেখানে মৃত্যু নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করে। বিদ্রোহের জগতে মৃত্যু অবিচারকেই বাড়িয়ে তোলে। সে (মৃত্যু) একটা চরম শোষণ।

বাকিরা (অর্থাৎ যারা বিদ্রোহী নয়) আপসহীনভাবে শাশ্বতকে বেছে নেয় এবং এই পৃথিবীর ইলিউশনকে অভিযুক্ত করে। তাদের সমাধিগুলো অসংখ্য ফুল ও পাখির কলরোলে আমোদিত হয়ে থাকে। জয়ীর পক্ষে এটাই মানানসই এবং তা তাকে পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি দান করে, যাকে একদা নিজেই সে প্রত্যাখ্যান করেছিল। পক্ষান্তরে, সে বেছে নিয়েছে কালো লৌহ-আবেষ্টনী কিংবা নাম না জানা কোনও নালা। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা মাঝে মধ্যে শ্রদ্ধা ও করুণাভরা সন্ত্রাসে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মৃত্যুর ওরকম একটা ছবির সহযোগী হয়ে বেঁচে থাকতে পারে ওরা। তা সত্ত্বেও তাদের চিত্ত সেখান হতেই তাদের শক্তি ও যুক্তি চয়ন করে। আমরা আমাদের সামনে দণ্ডায়মান নিয়তিকে উত্তেজিত করি, কখনও কখনও নিজেদের জন্যে বোধ করি করুণাও। একমাত্র এই অনুকম্পাটিকেই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়। এটা এমন এক অনুভূতি, যা আপনাকে তেমন স্পর্শ করবে না এবং সেটিকে আপনার কদাচিৎ মনে হবে বলিষ্ঠ। তবু আমাদের মধ্যে তাকেই বলা হবে সবার মধ্যে সাহসী, যে এটিকে অনুভব করবে। কিন্তু অতি সহজে যাকে বোঝা যায়, বলিষ্ঠ আমরা বলি তাকেই। আর যে শক্তিকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি না, তাকে চাই না।

আবারও বলতে চাই যে, এই ছবিগুলো কোনও নৈতিক বিধির উত্থাপন করছে না এবং কোনও রায়ের সঙ্গেও যুক্ত হচ্ছে না। তারা কিছু নক্‌শা ছাড়া কিছুই নয়। জীবনের একটা ভঙ্গিকেই তারা শুধু তুলে ধরে। প্রেমিক, অভিনেতা কিংবা অভিযাত্রীরা অ্যাবসার্ডকে

ফুটিয়ে তোলে। চাইলে তারা একই রকম চমৎকারিত্বে সাধু, সিভিল সার্ভেন্ট অথবা রাষ্ট্রপ্রধানকেও ফুটিয়ে তুলতে পারে। জানাটাই যথেষ্ট এবং কোনও কিছুকে আড়াল না করা। ইতালির মিউজিয়ামগুলিতে দেখা যেত যে, ফাঁসিকাঠগুলিকে আড়াল করবার জন্যে পাদ্রীরা দণ্ডিত মানুষদের সামনে রঙিন পর্দা ঝুলিয়ে দিত। উৎক্রমণ তার সমস্ত ধরনের রূপের মধ্য দিয়ে দিব্য বা অনন্তের দিকে ছুটে যাচ্ছে, দৈনন্দিনের কিংবা আইডিয়ার ইলিউশনের কাছে আত্মসমর্পণ করছে—এই পর্দাগুলোই লুকিয়ে রাখছে অ্যাবসার্ডকে। কিন্তু পর্দা ছাড়া সিভিল সার্ভেন্টও আছে এবং তাদের কথাই আমি বলতে চাই। এদেরই একজনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে বেছে নিয়েছি। এই পর্যায়ে অ্যাবসার্ড তাদের রাজকীয় ক্ষমতাভোগের অধিকার দেয়। এটা সত্য যে, ওই রাজপুত্রদের কোনও সাজা নেই। কিন্তু অন্যদের উপরে তাদের একটা আধিপত্য আছে। কারণ, তারা জানে যে, সব রাজত্বই কাল্পনিক। তারা জানে যে, সেখানে তাদের রয়েছে একচ্ছত্র রাজসিকতা এবং তাদের গুপ্ত দুর্ভাগ্য বা তাদেরকে নিয়ে সাধারণের মোহভঙ্গ ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণাই নিরর্থক। আশা থেকে বঞ্চিত হওয়াটা হতাশা নয়। পৃথিবীর অগ্নিশিখা অবশ্যই দিব্য সৌরভের অনুপূরক। এখানে আমি কিংবা অন্য কেউ সে বিচার করতে পারবে না। তারা আরও ভালো হওয়ার চেষ্টা করছে না, তারা চেষ্টা করছে ধারাবাহিকতাসম্পন্ন হওয়ার। "জ্ঞানী" কথাটা যদি সেই মানুষদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়, যারা হিসেব-নিকেশ না করেই যে জীবনটা পেয়েছে, তার মধ্যেই বাস করছে, তাহলে, তারা জ্ঞানী ব্যক্তি। এদের মধ্যে একজন জয়ী ব্যক্তি রয়েছে, তবে মনোজগতের। সেও ডন জুয়ান, তবে জ্ঞানের ডন জুয়ান; সেও অভিনেতা, তবে বৌদ্ধিক অভিনেতা এবং সে নিজেই এটা অনেকের থেকে বেশি জানে "আপনি কোনওভাবেই স্বর্গে বা মর্ত্যে কোনও সুবিধা পেতে পারেন না। আপনার প্রিয় ছোট্ট নিরীহ ভেঁড়াটিকে নিখুঁত করে তোলার জন্যে—দুটি শিং সুদ্ধ আপনি বড়জোর তুচ্ছ একটা ভেঁড়ার সমতুল্য হয়ে ওঠেন, এর বেশি কিছু নয়—এমনকি যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, আপনার কোনও গুমোর নেই এবং জজিয়তি করতে গিয়ে আপনি কেলেঙ্কারি বাঁধান না।"

যেকোনও উপায়েই, অ্যাবসার্ড যুক্তিবিচার পদ্ধতিতে উষ্ণ মুখগুলিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। সময় এবং নির্বাসনের সঙ্গে যারা জড়িয়ে আছে, ভবিষ্যতের ভাবনা ছাড়াই দুর্বলতাগুলিকে কাটিয়ে এই জগতের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে যারা বাঁচতে জানা কল্পনা এরকম আরও অনেককেই এখানে সামিল করতে পারে। যার স্পষ্টভাবে চিন্তা করে এবং মোটেই আশাবাদী নয়, তাদের দিয়েই এই অ্যাবসার্ড, ঈশ্বরহীন পৃথিবীটা পূর্ণ। তবে সব থেকে অ্যাবসার্ড চরিত্র যে সৃষ্টিকর্তা, তাঁর ব্যাপারে এখনও আমি কিছুই বলি নি।

————

# LA CRÉATION ABSURDE

# অ্যাবসার্ড সৃষ্টি

PHILOSOPHIE ET ROMAN

# দর্শন এবং উপন্যাস

যারা অ্যাবসার্ডের দুর্লভ পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করেছে, তারা কিছু গভীর এবং স্থায়ী ভাবনাকে তাদের শক্তির মধ্যে সঞ্চারিত না করে সংরক্ষণ করতে পারে নি। তাই, সেখানে, বিশ্বস্ততার একটা আশ্চর্য অনুভূতি-ই কেবল পাওয়া যায়। দেখা গেছে যে, সচেতন ব্যক্তিরা কোনও বিরোধে না জড়িয়েও লড়াইয়ের চরম প্রতিকূলতাতেও নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছে। কারণ, কোনও কিছুকে পাশ না কাটিয়ে যাওয়াটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে পৃথিবীর অ্যাবসার্ডিটিকে সয়ে যাওয়ার অভ্যাসটি এক ধরনের অধিবিদ্যক মর্যাদা লাভ করে। জয় কিংবা নাট্যাভিনয়, বহুপ্রণয়, অ্যাবসার্ড বিদ্রোহ এগুলো হচ্ছে এক ধরনের শ্রদ্ধার্ঘ্য, কোনও প্রচারাভিযান-প্রক্রিয়ায় মানুষ যেগুলিকে নিজের মর্যাদার উদ্দেশেই নিবেদন করে, যে মর্যাদার কাছে আগে থেকেই সে হেরে রয়েছে।

এটা নিছকই রণ-নীতির কাছে বিশ্বস্ত থাকার মতো একটা বিষয়। মনের স্থৈর্য রক্ষার ক্ষেত্রে ওই ভাবনাটা সুপ্রতুল—যাকে মন সমর্থন জুগিয়েছে এবং এখনও বিশ্বসভ্যতাকে সমর্থন করে চলেছে। লড়াইকে তো অস্বীকার করা যাবে না। মানুষকে লড়াই মেনে নিতেই হবে বা তাতে প্রাণ দিতে হবে। অ্যাবসার্ডের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। তার বিভিন্ন রূপগুলিকে পুনরুদ্ধার করে সেগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে তার মধ্যেই শ্বাস নিতে হবে। এখানে অ্যাবসার্ড-আনন্দ একটা চমৎকার সৃষ্টি। "একমাত্র আর্ট এবং আর্ট ছাড়া আমাদের আর নেই কিছুই, যেখানে সত্যের খাতিরে প্রাণ দেওয়া যায়"—বলেছিলেন নীৎশে।

বিভিন্ন পদ্ধতিগুলিকে যে সমস্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমি বিবৃত করছি বা তাদের উপরে জোর দিচ্ছি, তাতে এটা নিশ্চিত যে, আবারও কোনও মৃত্যু ঘটলে, সেখানেও নতুন কোনও যন্ত্রণা নেমে আসবে। বালকের মতো বিস্মরণের পশ্চাদ্ধাবনে এবং সন্তোষের আবেদনে এখন কোনও সাড়া মিলবে না। কিন্তু যে ধারাবাহিক চাপ নিয়ে মানুষকে জগতের সামনে দাঁড়াতে হয়, যে সুমিত উত্তেজনা তাকে সবকিছুকে মেনে নিতে বাধ্য করে, সেগুলি তাকে ভিন্ন একটা জ্বরের মধ্যে ঠেলে দেয়। জগতের সমস্ত

শিল্প-কর্মই মানুষের চৈতন্যের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার অভিযানগুলিকে নির্ধারণের একমাত্র সম্ভাব্য মাধ্যম। সৃজনশীলতা দ্বিগুণভাবে বাঁচিয়ে রাখে মানুষকে। প্রুস্তের হাতড়ে বেড়ানো,উদ্বিগ্ন অন্বেষণ, নিপুণ পুষ্পসংগ্রহ, ওয়ালপেপার সংগ্রহ এবং উদ্বেগগুলির এখন আর নেই কোনই তাৎপর্য। একই সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী এবং অনুভবগম্য সৃষ্টিগুলিকে টেনে নিয়ে চলা ছাড়া আর কিছুই করে না সে, যেখানে অভিনেতা, বিজেতা এবং সমস্ত অ্যাবসার্ড মানুষ তাদের জীবনের প্রতিটি দিন অতিবাহিত করে। সকলেই চেষ্টা করে নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলির মূকাভিনয়, পুনরাবৃত্তি এবং পুনর্সৃষ্টি করতে। নিজের মতো করে সত্যকে আবিষ্কার করতে করতেই আমরা জীবনটাকে নিঃশেষিত করে ফেলি। সত্য থেকে যে মানুষ দূরে সরে গেছে, তার কাছে সমগ্র অস্তিত্বটা অ্যাবসার্ডের মুখোশ পরিহিত একটা বিশাল সঙ ছাড়া কিছুই নয়। সৃষ্টি নিজেই একটা বিশাল সঙ।

এরা জানে শুরুটা কীভাবে করতে হয়। পরে তাদের সার্বিক চেষ্টাটাই থাকে, নিষ্ফলা দ্বীপে পদার্পণ করে দ্রুত সেটিকে ঘুরে দেখা এবং তার প্রসারণ ও সমৃদ্ধি ঘটানো। কিন্তু জানাটা দরকার প্রথমেই। কারণ, অ্যাবসার্ড আবিষ্কার একটা বিরতির সঙ্গে সমাপতন ঘটায়, যেখানে ভবিষ্যৎ ভাবাবেগগুলি প্রস্তুত এবং যুক্তিসঙ্গতও। এমনকি গোসপেল্‌হীন মানুষদের জন্যেও অলিভ পর্বত বরাদ্দ রয়েছে। সুতরাং কেউ যেন ঘুমিয়ে না পড়ে। কারণ, অ্যাবসার্ড মানুষের কাছে ব্যাপারটা বিশ্লেষণ বা সমাধানের নয়, তা হচ্ছে অভিজ্ঞতা-অর্জনের এবং তার বর্ণনার। সহজবোধ্য যে নিরাসক্তি, তা দিয়েই সব কিছুর সূত্রপাত হয়।

বর্ণনা—এ হলো গিয়ে অ্যাবসার্ড ভাবনার চূড়ান্ত লক্ষ্য। বিজ্ঞানও পৌঁছে গেছে তার কূটাভাসগুলির (paradoxes) শেষ পর্যায়ে। বিজ্ঞান তাই নতুন সত্যের অবতারণা বন্ধ করে দিয়েছে এবং গভীর ভাবনাচিন্তা ও দৃশ্যগ্রাহ্য বস্তুসমূহের চির নির্মল ম্যাপ সে আর আঁকছে না। ফলে, মনও জেনে গেছে যে, যে আবেগ পৃথিবীর নানা রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরছে সেগুলি পৃথিবীর অন্তস্তল থেকে নয়, তার বৈচিত্র্য থেকে উদ্‌গত হচ্ছে। বিশ্লেষণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সংবেদনটি থেকে যাচ্ছে এবং তার সঙ্গে জগতের অনবচ্ছিন্ন গুণগত আবেদন অক্ষয় হয়ে থাকছে, যেখানে আমরা সমস্ত শিল্প-কর্মেরই ভূমিকাটিকে অনুধাবন করতে পারছি।

এটি একই সঙ্গে একটি অভিজ্ঞতার মৃত্যু এবং তার কয়েক-গুণ বৃদ্ধির সূচক। ইতিমধ্যেই পৃথিবী যে থিমটির অর্কেস্ট্রা রচনা করেছে—এটা তারই এক প্রকার একঘেয়ে ও আবেগী পুনরাবৃত্তি এর মধ্যে বাঁধা পড়েছে শরীর, দেবাঙ্গনের অফুরন্ত দৃশ্য, রূপ ও রঙ, সংখ্যা বা কষ্টগুলো। সুতরাং, স্রষ্টার আশ্চর্য এবং বালসুলভ জগতে এই প্রবন্ধের মূল থিমটির সঙ্গে পুনরায় মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে এই উপসংহারটি নিরপেক্ষ হবে

না। এর মধ্যে কোনও প্রতীকের অন্বেষণ এবং কোনও শিল্প-কর্মকে অ্যাবসার্ডের শেষ আশ্রয় হিসেবে গণ্য করাটা ভুল হবে। এটা স্বয়ং একটা অ্যাবসার্ড ফেনোমেনন এবং আমরা কেবলমাত্র এর বর্ণনা নিয়েই ভাবব। বুদ্ধির যন্ত্রণাকে তা কোনও ছাড় দেয় না। বরং এটা ব্যাধির এমন একটা উপসর্গ, যা সারাক্ষণ মানুষের সমগ্র চিন্তার প্রতিফলন ঘটায়। কিন্তু প্রথম বারের জন্যে মনকে তার নিজের বাইরে নিয়ে যায়, এবং অন্যের বিপরীত দিকে স্থাপন করে। তবে, তা সরে দাঁড়াবার জন্যে নয়, স্পষ্টভাবে কানা গলিটাকে দেখাবার জন্যে, যেটার ভেতরে ঢুকে পড়েছে সবাই। অ্যাবসার্ড যুক্তিবিচারকালে সৃষ্টি নিরাসক্তি ও আবিষ্কারের অনুসারী হয় এবং সেই স্থানটাকে চিহ্নিত করে, যেখান থেকে অ্যাবসার্ড আবেগ উত্থিত হয় এবং পরিসমাপ্তি ঘটে যুক্তির। এ প্রবন্ধে এভাবেই এই স্থানটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অ্যাবসার্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বৈপরীত্যগুলিকে কোনও শিল্পসৃষ্টির মধ্যে খুঁজে নেওয়ার জন্যে স্রষ্টা এবং ভাবুকদের প্রচলিত কিছু থিমকে উদ্‌ঘাটিত করলেই চলে। আসলে, এই সিদ্ধান্তটা বুদ্ধির সঙ্গে ততটা অভিন্ন নয়, কেননা, বৈপরীত্যগুলি তাদের বেশ পরিচিত। ভাবনা এবং সৃষ্টির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা এরকমই। একই যন্ত্রণা যে, একই মানুষকে দুটি ভিন্ন অভিমুখে চালিত করে—এটা বলতেও কি আমায় গলদঘর্ম হয়ে উঠতে হবে? এটাই সেই জায়গা, যেখানে শুরুতেই তারা মিলিত হয়। কিন্তু সব চিন্তাই অ্যাবসার্ড থেকে জাত। আমি দেখেছি তাদের ভেতরে অল্পই সেখানে থেকে যায়। তাদের বিচ্যুতি এবং অবিশ্বস্ততার নিরিখে আমি পরিমাপ করতে পেরেছি যে, অ্যাবসার্ডে কী আছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি বিস্মিতও হয়েছি এ কথা ভেবে যে, অ্যাবসার্ড শিল্পও কি সম্ভব?

আর্ট এবং দর্শনের ওই পারস্পরিক বৈপরীত্যের দুর্মর স্বভাবের উপর গুরুত্ব দেওয়াটা অসম্ভব হয়ে উঠবে। যদি এটিকে আপনি খুব সংকীর্ণ অর্থে নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন, তবে তা নিশ্চয়ই মিথ্যে হবে। যদি আপনি বোঝাতে চান যে, এই নিয়ম দুটোর প্রত্যেকটিরই একটি করে অদ্ভুত পরিমণ্ডল আছে, সেটা সত্য হলেও অস্পষ্ট থেকে যাবে। একমাত্র যে যুক্তিটির এখানে গ্রহণযোগ্যতা আছে, তা এসেছে কোনও দার্শনিক যে প্রক্রিয়ার *মধ্যে* আবদ্ধ এবং কোনও শিল্পী তার যে শিল্পকর্মের *পুরোভাগে* উপস্থিত সেখান থেকে। কিন্তু, তা এক বিশেষ ধরনের শিল্পকর্ম এবং দর্শনের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত ছিল। এখানে সেটাকে আমরা গৌণ বিবেচনা করছি। স্রষ্টা ও শিল্পের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার ধারণাটি শুধু সেকেলে নয়, মিথ্যেও। শিল্পীর উল্টো দিকে দেখানো হয়েছে

যে, কোনও দার্শনিক কখনও বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি রচনা করে নি। কিন্তু এ পর্যন্ত এটাই সত্য যে, নানা প্রেক্ষিতেও কোনও শিল্পী কখনও একাধিক বিষয়কে প্রকাশ করে নি। শিল্পের তাৎক্ষণিক নিপুণতা, তার নবীকরণের প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র একটি পূর্বনির্ধারিত তত্ত্বের দ্বারাই সত্য হয়ে উঠতে পারে। কেননা, এভাবে কোনও শিল্পকর্ম একটা নির্মাণ এবং সকলেই জানেন যে, মহৎ স্রষ্টারা কীরকম একঘেয়ে হয়ে থাকেন। একই যুক্তিতে দার্শনিকের মতোই শিল্পীও দায়বদ্ধ হয় নিজের ও নিজের কাজের প্রতি। এই মিশেলটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নান্দনিক সমস্যাটিকে তুলে ধরে। তাছাড়া, যিনি মনের একাগ্র সাধনায় অবিচল তার কাছে পদ্ধতি এবং পরিণতির এই বিশিষ্ট ভিত্তিটি ছাড়া কিছুই নিরর্থক নয়। উপলব্ধির জন্যে, ভালোবাসার জন্যে মানুষ নিজে যে বিধিগুলি তৈরি করে এ দু'য়ের মধ্যে কোনও বিসম্বাদ নেই। তারা অন্যোন্যসম্পৃক্ত। দুটি ক্ষেত্রেই একই উদ্বেগ গিয়ে মিশেছে।

শুরুতেই দু একটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। কোনও অ্যাবসার্ড আর্টকে বাস্তবসম্মত করে তুলতে তার আঙ্গিক-ভাবনাটিকে অবশ্যই সুবোধ্য হতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মূল ভাবনাটি যেন নিয়ন্ত্রক যুক্তিবুদ্ধির মতো দৃশ্যমান না হয়ে ওঠে। এই কূটাভাসটিকে অ্যাবসার্ডের ধাঁচেই বিশ্লেষণ করতে হবে। যেকোনও আর্টই জন্ম নেয় নির্দিষ্ট কিছু যুক্তির কাছে বুদ্ধিকে প্রত্যাখ্যান করে। যৌন বাসনার উপরে আর্ট নিজের বিজয় চিহ্নিত করে। স্পষ্ট ভাবনাই আর্টকে প্রলুব্ধ করে, কিন্তু সেই প্রলোভনের ভেতরে আর্ট নিজেকে বিসর্জনও দেয়। যাকে বলে গভীরতর তাৎপর্য, তার সঙ্গে যুক্ত হবার প্রলোভনের কাছে আর্ট আত্মসমর্পণ করবে না। কারণ, সেটাকে আর্ট অবৈধ বলেই জানে। শিল্পকর্ম বৌদ্ধিক নাটককে সাবয়ব করে, কিন্তু, পরোক্ষতার সহায়তা ছাড়া তা প্রমাণ করতে পারে না। অ্যাবসার্ড শিল্পের চাই এমন একজন শিল্পী, যে এই সীমাবদ্ধতাগুলিকে জানবে, তার চাই এমন একটি শিল্পকর্ম, যেখানে বাস্তব নিজেকে ছাড়া অন্য কিছুকেই সংকেতিত করবে না। তাৎপর্য আর জীবনের সান্ত্বনা কখনই শেষ কথা হতে পারে না। সৃষ্টি করা বা সৃষ্টি না করার মাধ্যমে পালটায় না কিছুই। অ্যাবসার্ড স্রষ্টা নিজের সৃষ্টিকে ধরে রাখে না। কখনও সখনও কাজটাকে সে বর্জনও করে। এ রকম বর্জনের ব্যাপার ঘটেওছিল। একজন আবিসিনীয়ই এর যথোপযুক্ত প্রমাণ।

এখানে নন্দনতত্ত্বের নিয়মগুলিও লক্ষণীয়। প্রকৃত শিল্পকর্ম মানবিক মূল্যবোধের উপরে নির্ভরশীল এবং মূলত তা প্রকাশ করে "যৎসামান্য"-ই। শিল্পীর বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা ও তার শিল্পে বিম্বিত অভিজ্ঞতার মধ্যে এবং উইলহেম মেস্তর[৪৪] ও গ্যোয়টের পরিপক্কতার মধ্যে একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। যখন শিল্প-কর্মটি বর্ণনামূলক সাহিত্যের সমগ্র অভিজ্ঞতাটিকে নক্‌শি-কাগজের উপরে ফুটিয়ে তুলতে চায়, তখন সম্পর্কটিকে

খারাপ বলা যায়। যখন শিল্পকর্মটি অভিজ্ঞতার একটি কর্তিত ভগ্নাংশ ছাড়া কিছু নয় (যেন একটি হীরকখণ্ড, যেখানে সীমাহীন বর্ণবৈভব একটি অভ্যন্তরীণ দ্যুতিতে সংহত হয়েছে), তখন সম্পর্কটিকে ভালো বলা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে শাশ্বতের বাড়তি চাপ এবং ভানটুকু রয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রয়েছে বহুপ্রসূ একটি শিল্পকর্ম, যা তথাকথিত সমগ্র অভিজ্ঞতার ফসল। কিন্তু তার ঐশ্বর্য সংশয়াতীত নয়। *জ্ঞান*-কে ছাপিয়ে যায় যে *শালীনতাবোধ*, তাকে আয়ত্ত করাই অ্যাবসার্ড শিল্পীর সমস্যা। এমতাবস্থায়, সাধারণভাবে কোনও মহৎ শিল্পী শেষ পর্যন্ত একজন মহৎ মানুষও। এটিও স্পষ্ট যে, এভাবে বেঁচে থাকাটাও যতটা সম্ভব চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে যাওয়া। সুতরাং এর পরে শিল্পকর্মটি বুদ্ধিদীপ্ত নাটক হয়ে ওঠে। শিল্পচিন্তার মর্যাদার অস্বীকৃতিকে অ্যাবসার্ড রচনা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে এবং তাকে বাদ দিলে সেটা সেই বুদ্ধির চেয়ে বাড়তি কিছু হয় না, যা শিল্পকর্মটির বাইরের রূপেরই শুধু নির্মাণ করে এবং বেশ কিছু ছবি দিয়ে সেটিকে আবৃত করে, যার পেছনে খুব একটা যুক্তি নেই। পৃথিবীটা যদি স্পষ্ট হতো, তবে আর্টের অস্তিত্ব থাকত না।

যেখানে বর্ণনার আশ্চর্য সংযম[৪৫] রয়েছে, সেখানে আর্টের আঙ্গিক বা রঙ নিয়ে আমার বলার কিছু নেই। ভাবনার যেখানে ইতি, প্রকাশের সেখানে সূচনা। ফ্যালফ্যালে দৃষ্টির যে কিশোর কিশোরীরা মন্দির এবং যাদুশালাগুলো ভরিয়ে তুলেছে, শরীরী বিভঙ্গ দিয়েই তারা নিজেদের জীবনদর্শন প্রকাশ করছে। যেকোনও লাইব্রেরির থেকেও এ ব্যাপারটি অ্যাবসার্ড মানুষের কাছে অনেক বেশি শিক্ষামূলক। উল্টোদিক থেকে সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এটা সত্য। উপদেশহীন কোনও আর্ট যদি থেকে থাকে, তবে তা অবশ্যই সঙ্গীত। গণিতের সঙ্গেও এটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, যাতে অযৌক্তিকতাগুলিকে না ধার করতে হয়। মনের এই খেলাটা নিয়ম মেনে নিজের সঙ্গেই চলতে থাকে এবং ওই পরিমিত নিয়মগুলি আমাদের গণ্ডীর সীমারেখার মধ্যে নানান রূপ নিতে থাকে এবং এর বাইরে তাদের কম্পনগুলি কোনও একটি অমানবিক জগতে মিলিত হয়। প্রকৃতপক্ষে কোনও শুদ্ধতর সংবেদন নেই। উদাহরণগুলি খুবই সহজ। অ্যাবসার্ড মানুষ নিজের জন্যে এই সামঞ্জস্য ও রূপগুলিকে চিহ্নিত করে।

কিন্তু এখানে আমি সে ধরনের শিল্পকর্মের কথাই বলতে চাইব, যেখানে বিশ্লেষণের লোভটাই সব থেকে বেশি থাকবে। ইলিউশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফুটে উঠবে এবং প্রা অবশ্যম্ভাবী একটি পরিণতি ঘটবে। আমি উপন্যাসের কথা বলছি। সেখানে অ্যাবস টিকতে পারে কি না, তা খতিয়ে দেখার প্রস্তাব করছি।

একটা জগৎ সৃষ্টি করতে সবার আগে উপযুক্ত ভাবনাচিন্তা করবার প্রয়োজন ঘটে। অথবা প্রয়োজন হয় স্বকীয় জগৎটাকে একটা সীমার মধ্যে বেঁধে ফেলবার। দুটোই অবশ্য হরে দরে একই। প্রক্রিয়াটির সূচনা ঘটে সেই মৌল মতানৈক্যে, যা মানুষকে তার অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে। এর ফলে মানুষ তার নস্ট্যালজিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা ক্ষেত্র, যুক্তিঋদ্ধ একটা জগৎকে খুঁজে পায়। বিভিন্ন দৃষ্টান্তগুলোও তাকে আলোকিত করে। যেকোনও কারণেই হোক, মানুষকে তা ওই অসহনীয় বিচ্ছিন্নতাটিকে রদ করার একটা সুযোগও দেয়। যেকোনও দার্শনিকই একজন স্রষ্টা হয়ে থাকে (এমনকি যদি সে কান্টও হয়)। থাকে তার সৃষ্ট চরিত্র আর প্রতীকেরা; থাকে নিগূঢ় কর্মোদ্যোগ এবং গ্রন্থিমোচনও (dénouement/denouncement)। পক্ষান্তরে, কবিতা এবং প্রবন্ধের উপর দিয়ে উপন্যাসের দৃপ্ত পদচারণা, তার বাইরের বিভিন্ন রূপের প্রকাশ সত্ত্বেও কেবলই আর্টের একটা মহৎ বুদ্ধিশীলতার পরিচয় দেয়। শুনুন, এটা বিশেষভাবেই মহোত্তমের প্রশ্ন। কোনও সাহিত্য-প্রকরণের বহুপ্রসূতা এবং মহত্ত্ব প্রায়শই সেখানে প্রাপ্ত আবর্জনা দিয়েও মূল্যায়িত হয়। অসংখ্য খারাপ উপন্যাস নিশ্চয়ই আমাদের মহত্তরগুলির কথা ভুলতে দেয় না। আসলেই, তারা তাদের সঙ্গে নিজের জগৎটাকে টেনে নিয়ে চলে। উপন্যাসের নিজস্ব যুক্তি আছে, বিচারবুদ্ধি আছে, স্বজ্ঞা (intution) আছে, আছে দোলাচলতাগুলোও। আছে সুবোধ্যতার[৪৬] আবশ্যকতাও।

যে ধ্রুপদী বৈপরীত্যের কথা আগে বলেছি, এখানে তার যৌক্তিকতা এখনও অপেক্ষাকৃত কম। কারণ, সে একটা সময় ছিল, যখন দর্শনশাস্ত্রকে লেখকের থেকে আলাদা করা সহজ ছিল। আজ দর্শনশাস্ত্র যখন সার্বজনিকতার দাবি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখছে, যখন তার সর্বোত্তম ইতিহাস হয়ে উঠছে তার অনুশোচনার ইতিহাস, তখন আমরা জানি যে, যথার্থ কোনও পদ্ধতি তার লেখক হতে পৃথক হতে পারে না। স্বয়ং নীতিবিদ্যাও তার বিশেষ কোনও দৃষ্টিকোণ থেকে দীর্ঘ ও যুক্তিপূর্ণ ব্যক্তিগত কিছু স্বীকারোক্তি ছাড়া কিছুই নয়। অ্যাবসার্ড ভাবনা শেষ পর্যন্ত তার শরীরের অবলম্বনেই ফিরে যায়। এবং তেমন করেই শরীর এবং আবেগের কাল্পনিক গতিবিধিগুলো কমবেশি পৃথিবীর ভবিষ্যদৃষ্টির প্রয়োজনমাফিক নির্ধারিত হয়ে থাকে। লেখক "গল্প" বলা বন্ধ করে দিয়েছে এবং নিজের একটা জগৎ রচনা করছে। মহৎ ঔপন্যাসিকেরা হয়ে উঠেছেন দার্শনিক ঔপন্যাসিক—বলা যায়, গবেষণাপত্র-রচয়িতাদের বিপরীতে তাঁদের অবস্থান। যেমন, বালজাক, সাদ, মেলভিল, স্তাঁদাল, দস্তেয়ভস্কি, প্রুস্ত, মালরো, কাফ্‌কা। অসংখ্য নামের মধ্যে এই ক'টি নামই যথেষ্ট।

কিন্তু লেখার মধ্যে তাঁরা আসলে সুনিরূপিত যুক্তির থেকে যে চিত্রকল্প নির্মাণের দিকে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন, তা তাঁদের সবার কোনও একটি নির্দিষ্ট ভাবনার উন্মোচক

হয়ে উঠেছে, বিশ্বাস জন্মিয়েছে তাঁদের ব্যাখ্যার যেকোনও মূল বিধিগুলির উপযোগিতায়। আর নিশ্চিত হয়েছে দৃশ্যগ্রাহ্য রূপের শিক্ষণীয় বার্তায়। তাঁরা শিল্পকর্মকে যুগপৎ সমাপ্তি এবং সূচনা হিসেবে বিবেচনা করেন। এটা প্রায়শই একটি অনভিব্যক্ত দর্শনের, তার ব্যাখ্যানের এবং তার অভিষেকের ফলশ্রুতি। কিন্তু ব্যাপারটা পূর্ণতা পাবে একমাত্র ওই দর্শনের সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনার মাধ্যমে। শেষ পর্যন্ত এটা পুরনো একটা থিমের রূপান্তরকে যৌক্তিকতা দান করে। সে মোতাবেক সামান্য কোনও চিন্তাও জীবন থেকে দূরে সরে যায়। আবার বেশ কিছু চিন্তাই জীবনের সঙ্গে সমন্বিতও হয়ে থাকে। বাস্তবকে ঊর্ধ্বায়িত করতে না পেরে চিন্তা তাকে অনুকরণ করা বন্ধ করে দেয়। যে উপন্যাসগুলি প্রশ্নচিহ্নের মধ্যে রয়েছে, সেগুলি ওই আপেক্ষিক এবং অন্তহীন জ্ঞানের বাহন, অনেকটা, প্রেমের মতো। উপন্যাস-শিল্পে প্রেমের বর্ণনায় প্রারম্ভিক বিস্ময় আর অগণন স্মৃতি-রোমন্থন লক্ষ্য করা যায়।

এগুলোও খানিকটা প্রতিপত্তির ব্যাপার, শুরুতেই যাদের আমি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু পাশাপাশি এগুলিকে সেই অবসাদগ্রস্ত রাজপুত্রদের মধ্যেও আমি লক্ষ্য করেছি, যাদের আত্মহত্যার পরে তাদের নিয়ে আমি গভীর অনুধ্যান করতে পেরেছিলাম। বস্তুত, যে শক্তি ওদের ইলিউশনের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির দিকে ফিরিয়ে আনে সেই শক্তিটিকে জানা এবং বর্ণনা করার ব্যাপারটাই আমাকে আগ্রহান্বিত করে। সুতরাং এ পদ্ধতিটিই এখানে আমার সহায়ক হয়ে ওঠে। এতক্ষণ যা যা বলা হয়েছে, সেগুলোই আমার যুক্তিতর্ককে কাটছাট করার সুযোগ দেবে এবং অবিলম্বে সুনির্দিষ্ট একটি দৃষ্টান্তের মধ্যে সেগুলিকে সারাংশিত করবে। *আপীল*[৪৭]*-বিহীন* জীবন মেনে নিয়ে কেউ *আপীল-বিহীনভাবে* কাজ করতে এবং সৃষ্টিকর্ম চালিয়ে যেতে পারে কি না—তা জানতে আমি উৎসুক। তাছাড়া এই ধরনের স্বাধীনতাকামী হওয়ার পথটাই বা কী? আমি আমার জগৎটাকে অপচ্ছায়া-মুক্ত করতে চাই এবং ভরিয়ে তুলতে চাই রক্তমাংসের সত্যের সম্ভারে, যেগুলির অস্তিত্বকে কখনই অস্বীকার করতে পারি না। অন্য কিছুই না করে আমি অ্যাবসার্ড আর্টকে রূপ দিতে পারি, সৃজনশীলতাকে বেছে নিতে পারি। কিন্তু অ্যাবসার্ড মানসিকতা যদি অনড় হয়, তবে যথেচ্ছাচার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেও একই কথা। যদি অ্যাবসার্ডের অনুশাসনগুলিকে গ্রাহ্য না করা হয়, যদি ওই শিল্পকর্ম বিচ্ছেদ এবং বিদ্রোহকে বিশদভাবে না ফুটিয়ে তোলে, যদি তা শুধুই ইলিউশন আর উদ্বোধিত আশার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, তাহলে, তা যথেচ্ছচারী হওয়া থেকে বিরত হয়। এদের থেকে আমি নিজেকে কিছুতেই আলাদা রাখতে পারি না। আমার

জীবন এর মধ্যে কোনও একটা মানে খুঁজে পেতেই পারে, কিন্তু তা আমার কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ। এখানে আর সেই নিরাসক্তি ও আবেগের চর্চা নেই, কোনও মানুষের জীবনকে যা সার্থকতা ও বৈভবের জয়মুকুটে ভূষিত করবে।

যে সৃষ্টিকর্মে ব্যাখ্যা করার প্রলোভন (অর্থাৎ ব্যাখ্যা করার উপাদান প্রচুর) খুবই জোরদার, কেউ কি সে প্রলোভনকে জয় করতে পারে? উপন্যাসের জগতে যেখানে বাস্তবতার পরিচয় অত্যন্ত প্রকট, সেখানে কি আমি রায়দানের বাসনাকে জলাঞ্জলি না দিয়ে অ্যাবসার্ডের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি? আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বেশ কিছু বিষয়কে বিবেচনায় রাখতে হবে? ইঙ্গিতটা কী, নিশ্চয় এতক্ষণে তা সুস্পষ্ট হয়েছে। যেমন ধরুন, সতর্কতার চূড়ান্ত বিচক্ষণতা, যে বিচক্ষণতা তার মৌলিক ও সুকঠোর জ্ঞানগুলিকে চরম বিভ্রমের সময়েও জলাঞ্জলি দিতে ভয় পায়। সৃষ্টিকে যা ধারণ করে, তা অ্যাবসার্ড-সচেতন মানুষের একটি অন্যতম সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গিরূপে গণ্য হয়। মানুষের কাছে তা জীবনের সব ধরনের রীতিকে মুক্ত করে দেয়। বিজেতা কিংবা অভিনেতা, স্রষ্টা কিংবা ডন জুয়ান হয়ত ভুলেও যায় যে, তার জীবনচর্চা তার পাগলামো সম্পর্কিত সচেতনতা ব্যতীত সম্ভবপর হতে পারে না। খুব দ্রুতই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে সকলে। সুখী হওয়ার জন্যে মানুষ অর্থোপার্জন করতে চায়। তাই মানুষের সর্বাত্মক প্রয়াস ও জীবনের সেরা সময়টা ওই অর্থোপার্জনেই নিবেদিত হয়। সে ভুলেই যায় তার সুখের কথা। পরিণামমুখিনতাই তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হয়ে ওঠে। বিজেতার সমস্ত প্রয়াসও একইরকমভাবে লক্ষ্যের অভিমুখে চালিত হয়, যা বৃহত্তর জীবনের একটা পথ বৈ কিছু নয়। ডন জুয়ানও নিজেকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দেয়, ওই জীবনেই তৃপ্ত হয়, যার মহত্ত্বকে কেবল বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই অনুভব করা যায়। একদিক থেকে তা সচেতনতা। আরেক দিক থেকে তা বিদ্রোহ; উভয় ক্ষেত্রেই অ্যাবসার্ড তিরোহিত হয়েছে। মানুষের অনেক বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে। সবার থেকে হতভাগ্য যে, সেও সাধারণত ইলিউশনে বিশ্বাসী হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেয়। আমাদের প্রয়োজনবোধই শান্তির জন্যে এই ধরনের বিশ্বাসে উৎসাহ দিতে রাজি হয়। তলিয়ে দেখলে বিষয়টিকে অস্তিত্ববিষয়ক সম্মতির সমান্তরাল বিবেচনা করা যেতে পারে। এভাবেই আলোর ঈশ্বর এবং মৃন্ময়-মূর্তির আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু মানুষের পক্ষে একটা মধ্যপন্থা খুঁজে নেওয়াই জরুরি।

এ পর্যন্ত যতটা সম্ভব অ্যাবসার্ড পরিস্থিতির দুর্বলতাগুলির সঙ্গে সকলের পরিচয় ঘটানো হয়েছে। সেগুলোই তার মূল বৈশিষ্ট্যও। এভাবে যদি আগাম আমাদের সতর্ক হতে হয়, তবে, কেবল এটুকু খেয়াল রাখলেই চলবে যে, দর্শনবিশেষের মতো উপন্যাস-শিল্পও পাঠককেও একই অস্পষ্টতা দান করতে পারে। সুতরাং কোনও একটি সৃষ্টিকে আমি একটা ইলাস্ট্রেশন হিসেবে নিতে পারি, যার সব কিছুই একটি সুস্পষ্ট

সূচনাবিন্দু এবং সুবোধ্য পরিমণ্ডলসহ অ্যাবসার্ডের সচেতনতার নির্দেশ দেবে। তার পরিণামগুলো আমাদের আলোকিত করবে। সেখানে যদি অ্যাবসার্ডকে সম্মান না দেওয়া হয়, তাহলে আমরা জানতে পারব যে, কোন্ পক্ষপাতিত্বের জোরে ইলিউশন এখানে নিজেকে তুলে ধরেছে। সেক্ষেত্রে, একটি বিশেষ উদাহরণ, থিম বা স্রষ্টার বিশেষত্বই পর্যাপ্ত বিবেচিত হবে। এখানেও সেই ব্যাখ্যাটির প্রসঙ্গই আসবে, একটি বৃহত্তর প্রেক্ষিতে যেটিকে আগেই সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

দস্তেয়ভস্কির একটি অত্যন্ত প্রিয় থিমকে এখানে আমি পর্যালোচনা করব। অন্যদেরও কিছু লেখা খুঁটিয়ে[৪৮] পড়ব নিশ্চয়ই। তবে, দস্তেয়ভস্কির লেখাটিতে মহত্ত্ব এবং আবেগের ভিত্তিতে বিতর্কটি সরাসরি পর্যালোচিত হবে, অস্তিত্ববাদী দর্শনের আলোচনায় যার উল্লেখ আমি করেছি আগেই। এই অনুরূপতা (parallélisme) আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ করবে।

— — — —

# KIRILOV
# কিরিলভ

দস্তেয়ভস্কির নায়কেরা সবাই এই আত্মজিজ্ঞাসায় পীড়িত হয়েছিল যে, জীবনের মানে কী? এ ব্যাপারে আধুনিক ব্যঙ্গবিদ্রূপের পরোয়া করে নি তারা। আধুনিক সংবেদনশীলতার সঙ্গে ধ্রুপদী সংবেদনশীলতার পার্থক্য এই যে, ধ্রুপদী সংবেদনশীলতা নৈতিক সমস্যার উপর বেড়ে উঠেছে, আর আধুনিকটি অধিবিদ্যার উপরে। দস্তেয়ভস্কির উপন্যাসে প্রসঙ্গটিকে এতো প্রগাঢ়ভাবে হাজির করা হয়েছে যে, তার কোনও চূড়ান্ত মীমাংসাই হতে পারে শুধু। অস্তিত্ব হবে অলীক কিংবা শাশ্বত—দস্তেয়ভস্কি যদি এই জিজ্ঞাসার মধ্যেই তৃপ্ত থাকতেন, তাহলে তিনি দার্শনিক হতেন। কিন্তু এ ধরনের বৌদ্ধিক অবসর-বিনোদনের ফলাফল মানুষের জীবনে কেমন হতে পারে, তা তিনি বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন। সেদিক থেকে তিনি একজন শিল্পী। এই দুটি বিষয়ের মধ্যে পরেরটিতেই তিনি মনোনিবেশ করেছেন, যেটিকে তিনি তাঁর *লেখকের ডায়ারি* গ্রন্থে যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আত্মহত্যা নামে অভিহিত করেছেন। বস্তুত, ডিসেম্বর ১৮৭৬-এ পাঠানো ওই ডায়ারির এক কিস্তিতে তিনি "যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আত্মহত্যা"র যুক্তিগুলোর কাল্পনিক রূপগুলিকে ব্যক্ত করেছিলেন। "অমরত্বে যার বিশ্বাস নেই, তার কাছে এ জীবন এক চূড়ান্ত অ্যাবসার্ডিটি"—এই ধারণায় বদ্ধমূল হওয়ার পরে কোনও হতাশ ব্যক্তি যে সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করে, সেগুলো এই

সুখ নিয়ে আমার প্রশ্নের উত্তরে চৈতন্যের মধ্যস্থতায় আমি জেনেছিলুম যে, মহৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে আমি সুখী হতে পারব না। কিন্তু এ জ্ঞানটিকে আমি আত্মস্থ করতে পারিনি এবং কোনওদিনই পারব না। অতএব এটা স্বাভাবিক যে—(আমি আত্মহত্যা করব)।

পরিশেষে, এখানে যেহেতু আমি বাদী এবং প্রতিবাদী, অভিযুক্ত এবং বিচারক দুজনেরই দায়ভার গ্রহণ করেছি, এবং এই নাটকে প্রকৃতির ভূমিকাকে নির্বোধ বলে মনে করি এবং আমিও সেই ভূমিকায় অভিনয় করা অবমাননকর মনে করি, তাই—(আমি আত্মহত্যা করব)।

বাদী, প্রতিবাদী এবং বিচারক এবং অভিযুক্ত সকলেরই দিক থেকে আমার অকাট্য ক্ষমতাবলে আমি সেই প্রকৃতির নিন্দা করছি, যা তার ঔদ্ধত্যবলে যন্ত্রণাভোগের জন্য

আমাদের অস্তিত্ব (প্রাণ) দান করেছে—আমি অভিশাপ দিচ্ছি আমার বিলুপ্তির সঙ্গে যেন তারও বিলুপ্তি ঘটে।

এখানেও কিছু কৌতুকের ব্যাপার রয়েছে। আত্মহত্যা নিজেকেই হত্যা করে। কেননা, অধিবিদ্যক স্তরে তা নিজেই উত্যক্ত হয়ে রয়েছে এবং এক অর্থে নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে। —এভাবেই সে প্রমাণ করছে যে, সে কারুর কাছে হার মানবে না। যাই হোক, সকলেই জানেন যে, এই বিষয়টি-ই *লে পসেদে*-এর কিরিলভের মধ্যে মূর্ত হয়েছে। তবে, অনবদ্য স্বতঃস্ফূর্ততায়। সে-ও সেখানে যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আত্মহত্যার প্রবক্তা। কোথাও একবার কিরিলভ ঘোষণা করেছিল যে, সে নিজের জীবনটা নিজেই কেড়ে নিতে চায়। কারণ, সেটাই তার "ভাবনা"। তার এই "ভাবনা" কথাটিকে অবশ্যই আক্ষরিক অথে নিতে হবে। একটা ভাবনাও, একটা চিন্তার কারণে সে প্রস্তুত হচ্ছে মৃত্যুর জন্যে। এ আত্মহত্যা উচ্চকোটির। একটার পর একটা দৃশ্যান্তরের মধ্যে দিয়ে কিরিলভের মুখোশটা খুলে যায়, যে মারাত্মক ভাবনা তাকে চালিত করে আমাদের সামনে সেটি উদ্ঘাটিত হয়। বস্তুত, ইঞ্জিনিয়ারটি (অর্থাৎ কিরিলভ) ফিরে যায় তার ডায়ারিতে লিপিবদ্ধ যুক্তিগুলোর কাছে। সে অনুভব করে যে, ঈশ্বর প্রয়োজনীয় এবং তাঁর অস্তিত্ব থাকতেই হবে। কিন্তু সে এও জানে যে, ঈশ্বর নেই, আর থাকতেও পারেন না। "কেন আপনারা বোঝেন না" সে চিৎকার করে, "কারুর আত্মহত্যা করার পক্ষে এই যুক্তিটাই যথেষ্ট?" তার এই মনোভাব এরকমভাবে তাকে কিছু অ্যাবসার্ড পরিণামের সঙ্গে জড়িয়ে দেয়। যে কারণটিকে সে ঘৃণা করে, নির্লিপ্তির মাধ্যমে সে মেনে নেয় যে, আত্মহত্যা সেটির কারণ হিসেবে গণ্য হোক "গতরাতে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলুম যে, আমি কিচ্ছুকে পাত্তা দেব না।" আর শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ ও স্বাধীনতার একটি মিশ্র অনুভূতি নিয়ে সে তার দলিল তৈরির কাজটি করে ফেলে আমার অবাধ্যতাকে, আমার নতুন এবং ভয়ংকর স্বাধীনতাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্যে আমি নিজেকে হত্যা করব। এটা তার প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপার নয়। ব্যাপারটা বরং বিদ্রোহের। স্বভাবজ সংযম সত্ত্বেও কিরিলভ ঘটনাক্রমে একটি অ্যাবসার্ড চরিত্র সে আত্মহনন করে। কিন্তু সে স্বয়ং এই অসঙ্গতিটির ব্যাখ্যাও দেয়, আর সেই ভঙ্গিটাও এমন যে, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবসার্ডের গোপন সত্যটির নির্ভেজাল প্রকাশও ঘটে যায়। প্রকৃতপক্ষে, সে তার প্রাণঘাতী যুক্তির সঙ্গে একটি অনন্য অভীষ্টকে যুক্ত করে, যা চরিত্রটিকে একটা পূর্ণাঙ্গ প্রেক্ষিত দান করে ঈশ্বর হয়ে ওঠার জন্যে সে নিজেকে হত্যা করতে চায়।

প্রাঞ্জলতার দিক থেকে তার এই যুক্তিটি ধ্রুপদী গোত্রের। ঈশ্বর যদি না থাকে, তবে কিরিলভ ঈশ্বর। ঈশ্বর যদি না থাকে, কিরিলভ অবশ্যই নিজেকে হত্যা করবে। এই যুক্তিটা অ্যাবসার্ড, কিন্তু সেটার প্রয়োজন ছিল। যাই হোক, যে ঈশ্বরকে মর্ত্যে নামিয়ে আনা হয়েছে, তাকে আবার বিশেষ একটা তাৎপর্য-দানের ব্যাপারটা বেশ মজার। ওই

তাৎপর্যটি "যদি ঈশ্বর না থাকে, তবে আমিই ঈশ্বর"—এই যুক্তিটির সমার্থক হয়ে উঠেছে। এটি আজও আমাদের কাছে বেশ দুর্বোধ্যই রয়ে গেছে। শুরুতেই খেয়াল করতে হবে যে, যে এই পাগলামোর দাবিটিকে নিয়ে জাঁক করে, সে অবশ্যই এই পৃথিবীরই একজন মানুষ। নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে সকালে রোজই সে শরীরচর্চা করে। শাতভ যে তার স্ত্রীকে সারিয়ে তুলছে, সেই আনন্দে সে উদ্বেলিত। তার মৃত্যুর পরে পাওয়া একটি কাগজে দেখা যায় যে, সে সেখানে একটি মুখের ছবি আঁকার চেষ্টা করেছিল, যেটি "তাদের" দিকে তাকিয়ে জিভ ভেঙানো শুরু করেছিল। শিশুসুলভ সে, খিটখিটে, আবেগপ্রবণ, নিয়মনিষ্ঠ এবং স্পর্শকাতর। যুক্তি এবং অবসেসন ছাড়া অতিমানব নিয়ে তার বলার মতো কিছু নেই। অথচ তার কাছে সব মানুষেরই তালিকা আছে। তবুও শান্তভাবে দিব্যত্ব নিয়েই কথা বলে সে। সে পাগল নয়, দস্তেয়ভস্কিও না। ফলে, যা তাকে চঞ্চল করে, তা কোনও ছিট্‌গ্রস্তের চিত্তবিভ্রম নয়। শব্দগুলিকে এ ক্ষেত্রে তাদের নির্দিষ্ট অর্থ অনুযায়ী বিচার করলে তা হাস্যকর হবে।

তাকে বুঝতে কিরিলভ নিজেই সাহায্য করে আমাদের। স্তাভ্রোজিনের একটি প্রশ্নের উত্তরে সে স্পষ্ট করে দেয় যে, সে কোনও ঈশ্বররূপী মানুষের কথা বলছে না। আমরা মনে করতেই পারি যে, নিজেকে যীশুখ্রিস্ট থেকে আলাদা করার জন্যেই এ ভাবনাটির উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু তা যীশুখ্রিস্টের সঙ্গে সংযুক্তির ব্যাপারই হয়ে উঠেছে। বস্তুত, কিরিলভ কিছুক্ষণের জন্যে এই কল্পনায় বুঁদ হয়েছিল যে, যীশুখ্রিস্ট মৃত্যুর পরে কোনও স্বর্গ লাভ করেন নি। সুতরাং এই নির্যাতনগুলি কিরিলভের কাছে নিরর্থক মনে হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার (কিরিলভ) বলেছে "প্রকৃতির নিয়ম যীশুখ্রিস্টকে মিথ্যার মধ্যে বাঁচতে এবং মিথ্যার মধ্যে মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য করেছিল।" এ দিক থেকে যীশুখ্রিস্ট সামগ্রিকভাবে জীবনের অতিরঞ্জন ও আকস্মিকতাকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। যীশুখ্রিস্ট একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ। কারণ, তিনি চূড়ান্ত অ্যাবসার্ড পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি ঈশ্বররূপী মানুষ নন, তিনি মানুষরূপী ঈশ্বর। তাঁর মতোই আমরা প্রত্যেকে,অন্তত কিছুটা পরিমাণে, ক্রুশবিদ্ধ এবং পরিস্থিতির শিকার হতে পারি।

সুতরাং ঐশ্বরিকতা সম্পূর্ণত পার্থিব। কিরিলভ বলেছে "তিন বছর ধরে আমি আমার ঐশ্বরিকতার বৈশিষ্ট্যকে খুঁজে চলেছি এবং তাকে আমি পেয়েছি। আমার ঐশ্বরিকতার বৈশিষ্ট্য হলো— আমার স্বাধীনতা।" কিরিলভীয় যুক্তির মানেটা এতক্ষণে বোঝা গেল "যদি ঈশ্বর না থাকে, তবে আমি-ই ঈশ্বর"। ঈশ্বর হওয়ার অর্থ অবশ্যই এই পৃথিবীতে স্বাধীন হওয়া, অমর সেই সত্তার ভজনা না করা। সর্বোপরি, ওই দুর্বহ স্বাধীনতা থেকেই এই সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হয়েছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকলে, সবই ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করে এবং আমরা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে করতে পারি না কিছুই। ঈশ্বর না থাকলে সবই নির্ভর করে আমাদের উপরে। কিরিলভের কাছে নীৎশের মতোই

ঈশ্বরকে হত্যা করার তাৎপর্য ঈশ্বরে পরিণত হওয়া। এই পৃথিবীতে অনন্ত জীবনকে অনুভব করার কথা গোস্‌পেলেও[৪৯] আছে। কিন্তু এই অধিবিদ্যক অপরাধই যদি মানুষের পূর্ণতার পক্ষে পর্যাপ্ত হবে, তা হলে আর আত্মহত্যাকে বাড়তি জুড়ে দেওয়া কেন? কেন কেউ আত্মহত্যা করবার পরে স্বাধীনতা অর্জন করে শেষে এই পৃথিবীটাকে ত্যাগ করবে? এটা যে পরস্পরবিরোধী, তা কিরিলভ ভালোই জানে। তাই সে বলে "ব্যাপারটা যদি বোঝোই, তাহলে তো তুমি একজন জার (tzar) এবং নিজেই নিজেকে মেরে ফেলার থেকে তুমি বরং মহিমান্বিত হয়ে বেঁচে থাকবে।" কিন্তু, সাধারণভাবে মানুষ "এটা" জানে না, "এটা"-কে তারা অনুভব করে না। প্রমিথিউসের যুগের মানুষের মতো অন্ধবিশ্বাস[৫০] লালন করে তারা। তাদের পথ দেখাতে হবে। কেননা, ধর্মোপদেশ ছাড়া এক মুহূর্ত চলতে পারে না তারা। ঘটনাক্রমে, মানবতার প্রতি ভালোবাসায় কিরিলভকে একদিন আত্মহত্যা করতেই হতো। তার আগে ভ্রাতৃবর্গকে অবশ্যই সে দেখাবে একটি রাজকীয় ও দুর্গম পথ, যে পথের প্রথম যাত্রীটিও হবে সে নিজেই। এটা একটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আত্মহত্যা। পরে তো কিরিলভ আত্মত্যাগই করবে। কিন্তু যদি সে ক্রুশবিদ্ধও হয়, কোনও ষড়যন্ত্রের শিকার হবে না। সে রয়ে যাবে ভবিষ্যৎহীন মৃত্যুতে আস্থাবান, বিষণ্ণতায় বিধুর একজন মানুষরূপী ঈশ্বর হিসেবে। সে বলেছিল "আমি অসুখী। কারণ, নিজের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে দায়বদ্ধ আমি।"

কিন্তু যখনই সে মারা যাবে এবং সাধারণ লোকের আলোকপ্রাপ্তি ঘটবে, তখন পৃথিবীটা জারদের (tzars) দ্বারা ভরে যাবে এবং মানবমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কিরিলভের পিস্তলের গুলির আওয়াজ হয়ে উঠবে অন্তিম বিপ্লবের সংকেত। ফলে, এটা সেই হতাশা নয়, যা তাকে মৃত্যুর অভিমুখে ঠেলে দিয়েছিল, বরং এটা তার প্রতি প্রতিবেশীদের ভালোবাসা। একটি অবর্ণনীয় আধ্যাত্মিক অভিযানকে রক্তক্ষরণের মধ্যে দিয়ে শেষ করার আগে কিরিলভ একটি সুপ্রাচীন মানবিক যন্ত্রণার রূপক-এ সেটিকে অভিব্যক্তি দান করেছিল "সব ভালো।"

সুতরাং দস্তেয়ভস্কির থিম যে আত্মহত্যা, তা প্রকৃতই একটি অ্যাবসার্ড থিম। সে প্রসঙ্গে যাবার আগে, একটু খেয়াল করবেন যে, অ্যাবসার্ডের বাড়তি থিমে অন্যান্য যে চরিত্রগুলি নিজেরাই চলমান অবস্থায় রয়েছে, তাদের মধ্যে কিরিলভের পুনরার্বিভাব ঘটছে। স্তাভ্রোজিন এবং ইভান কারামাজভ তাদের প্রাত্যহিক জীবনে অ্যাবসার্ড সত্যকে প্রয়োগের চেষ্টা করেছে। তারাই সেই ব্যক্তি, যারা কিরিলভের মৃত্যুতে বন্ধনমুক্ত হয়েছে। জার (tzar) হওয়ার জন্যে তারা তাদের দক্ষতার প্রয়োগ করে। স্তাভ্রোজিন একটি "আয়রনিক" জীবন যাপন করেছে। সকলেই জানেন, সেটা কোন্ ব্যাপারে। নিজের চার পাশে সে একটা ঘৃণার বাতাবরণ রচনা করে। কিন্তু তার পরেও চরিত্রটির উন্মোচক গুহ্য শব্দটি মেলে তার বিদায়ী পত্রের মধ্যে। "আমি কোনও কিছুকেই ঘৃণা করতে

সক্ষম হই নি।" সে একজন নিরাসক্ত জার (tzar)। ইভানও ঠিক একইভাবে মনের রাজকীয় ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্থন করতে অসম্মত হয়েছে। তাই, আপন ভাইয়ের মতো নিজেদের জীবন দিয়ে যারা প্রমাণ করে যে, বিশ্বাস করার জন্যে আত্মনিগ্রহ জরুরি, তাদেরকে হয়ত সে বলবে যে, ব্যাপারটা খুব লজ্জাকর। তার গুহ্য শব্দটি-ই হচ্ছে : "ঠিক আছে, সব-ই মঞ্জুর করা হলো।" এই কথাগুলির মধ্যে প্রকৃতই বিষণ্ণতার ছায়া আছে। ঈশ্বরের হত্যাকারীদের মধ্যে সন্দেহাতীতভাবে বিশিষ্টতম নীৎশের মতোই, সে-ও পাগল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই ঝুঁকিটা তো নেওয়াই যায় এবং এ রকম ট্র্যাজিক পরিণতির সামনে দাঁড়িয়ে অ্যাবসার্ড মন এই প্রশ্নটির প্রয়োজনীয় শক্তিটাও পেতে পারে এর দ্বারা কী প্রমাণিত হয়?

এভাবেই উপন্যাসগুলিও *জার্নালের* মতোই অ্যাবসার্ড প্রসঙ্গগুলিকে পেশ করে। আমৃত্যু তারা যুক্তির প্রতিষ্ঠা করে যায় সাফল্যের উল্লাস, "ভয়ংকর" স্বাধীনতা, জারদের গরিমা—এগুলো হয়ে ওঠে মানবিক। সবই ঠিকঠাক আছে, সবই মঞ্জুর এবং কিছুই বিদ্বেষে ভরা নয়, এগুলো হচ্ছে অ্যাবসার্ড রায়। কিন্তু কী চমৎকার সেই সৃষ্টি, যার ভেতরে আগুন এবং বরফের ওই স্রষ্টাদের এত পরিচিত বলে মনে হয় আমাদের। যে নিরাসক্তির আবেগকম্প্র পৃথিবী তাদের চিত্তে গম্‌-গম করে, সেটিকে আমাদের কাছে এতটুকু দানবিক বোধ হয় না। আমাদের দৈনন্দিন উদ্বেগের মধ্যেই তাকে আমরা চিহ্নিত করি। তাছাড়া, দস্তেয়ভস্কি যেভাবে অ্যাবসার্ড জগৎকে পরিচিত ও যন্ত্রণাদীর্ণ চমৎকারিত্বে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, সম্ভবত আর কেউই তা পারেন নি। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তটি কী? দুটি উদ্ধৃতি আমাদের সামনে সম্পূর্ণ অধিবিদ্যক প্রতিবর্তনটিকে (retour/reversal) তুলে ধরবে, যা লেখকদের অন্য উন্মোচনের দিকে চালিত করবে। যে যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আত্মহত্যা করেছে ও যার যুক্তিগুলি সমালোচকদের মধ্যে প্রতিবাদ জাগিয়ে তুলেছে, সেগুলি সম্পর্কে দস্তেয়ভস্কি তাঁর জার্নালের এই কিস্তিগুলোয় এভাবে নিজের অবস্থান এবং সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন "যদি অমরত্বে বিশ্বাস মানুষের কাছে এতটাই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে যে, তাকে বাদ দিয়ে সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিতে উন্মুখ, তবে অবশ্যই তা মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক অবস্থা হয়ে থাকবে। ঠিক এ জায়গাটি থেকেই মানুষের আত্মার অমরত্ব কোনও সন্দেহের অবকাশ না রেখে বিদ্যমানতা লাভ করেছে।" এর পরে আবার তাঁর শেষ উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠাগুলিতে, ঈশ্বরের সঙ্গে বিশাল লড়াইয়ের পরে কয়েকটি শিশু আলিওশাকে জিগ্যেস করছে "কারামাজভ যা বলছে তা সত্য, কেননা, ধর্মেও সেটাই আছে, সেটা এই যে, মৃতদের মধ্য থেকেই আমাদের উত্থান হবে, সবার সঙ্গে সবার দেখা হবে আবার।" উত্তরে আলিওশা বলে—"নিশ্চয়, আমাদের আবার সকলের সঙ্গে দেখা হবে, আনন্দিতভাবে আমরা সবাই একে অন্যকে জানাব, আমাদের

জীবনে কী কী ঘটেছিল।”

এভাবে কিরিলভ, স্তাভ্রোজিন এবং ইভান পরাজিত হয়েছিল। *লে কারামাজভ*[৫১], *লে পসেদে*-কে জবাব দিয়েছিল। সত্যিই তা ছিল একটা উপসংহার। আলিওশার ঘটনাটি রাজপুত্র মিশকিনের *ঘটনাটির* মতো দ্ব্যর্থবোধক নয়। পরবর্তী অসুখটা এক চির বহমান বর্তমানের মধ্যে বেঁচে থাকে ঔদাসীন্য এবং স্মিত হাসির সঙ্গে অনুরঞ্জিত হয়ে এবং সেই আশিস্‌ধন্য অবস্থাটাই হতে পারে সেই অনন্ত জীবন, যার কথা বলছে রাজপুত্র। উল্টোদিকে আলিওশা স্পষ্টই বলছে "আবার আমাদের মিলন হবে।" আত্মহত্যা বা উন্মাদগ্রস্ততার আর প্রশ্নই থাকছে না কোনও। অমরত্ব আর অমরত্বের আনন্দ নিয়ে নিশ্চিত যে, তার কাছে আর কীসেরই বা গুরুত্ব? মানুষ সুখের পরিবর্ত হিসেবে দিব্যতাকে দান করে। "আনন্দের সঙ্গে আমরা সবাই একে অন্যকে জানাব, আমাদের জীবনে কী কী ঘটেছিল।" এভাবেই কিরিলভের পিস্তল রাশিয়ার কোথাও গর্জে উঠেছিল, কিন্তু এ পৃথিবী তার অন্ধ আশাগুলিকে লালন করে থাকে। জনগণ "সেটা" বুঝতে পারে নি।

ঘটনাক্রমে, এখানে কোনও অ্যাবসার্ড ঔপন্যাসিক আমাদের সম্ভাষণ করছেন না, করছেন একজন অস্তিত্ববাদী ঔপন্যাসিক। এখানেও উৎক্রমণটি মর্মস্পর্শী এবং তার মহত্ত্ব সে দান করে তাকেই, যার দ্বারা সে অনুপ্রাণিত হয়। এই ঘনিষ্ঠতা মর্মস্পর্শী, আদ্যন্ত হেঁয়ালি দ্বারা সংশয়িত, অনিশ্চিত এবং ব্যাকুল। *লে কারামাজভ* সম্পর্কে বলতে গিয়ে দস্তেয়ভস্কি লিখেছিলেন "বইটিকে আদ্যন্ত সেই মূল প্রশ্নটি-ই তাড়া করে ফিরবে, জীবনভর যেটিকে বহন করে আমি চেতনে বা অবচেতনে যন্ত্রণা সয়েছি ঈশ্বরের অস্তিত্ব।" এটা বিশ্বাস করা শক্ত যে, কোনও একটি উপন্যাস জীবনব্যাপী কোনও যন্ত্রণাকে একটি আনন্দময় পরিণামে রূপান্তরিত করতে পারে। একজন সমালোচক[৫২] যথার্থই বলেছেন যে, দস্তেয়ভস্কি ইভানের দিকে এবং কারামাজভের সদর্থক অধ্যায়টি লিখতে যেখানে তিন মাসের প্রযত্ন লেগেছিল, সেখানে যাকে তিনি "দেবনিন্দা" বলেছিলেন, উত্তেজনার ঘোরের ভেতর দিয়ে তিন সপ্তাহেই সেটি তাঁর লেখা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে একজনও নেই, যার শরীরে সেই যন্ত্রণা নেই, যারা একে বাড়িয়ে তোলে না এবং যারা শরীরী অনুভূতি বা নৈতিক স্বেচ্ছাচারিতায়[৫৩] এর সমাধান খোঁজে না। যাই হোক, এই সংশয়ের ভেতরেই আমরা থাকতে চাই। এখানে একটি লেখা আছে, যেটিকে দিনের আলোর থেকে আলো-আঁধারিতে বেশি অনুভব করা যায়, আশার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামকে বুঝতে তা বেশি কাজে লাগে। একেবারে শেষে পৌঁছে স্রষ্টা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির বিরুদ্ধে কিছু জিনিস পছন্দমতো বেছে নেন। এই অসঙ্গতি এভাবে আমাদের বিশিষ্টতা নির্ধারণের সহায়ক হয়ে ওঠে। এখানে যা পাচ্ছি, তা কোনও অ্যাবসার্ড গ্রন্থ নয়, তা সেই গ্রন্থ, যা অ্যাবসার্ড সমস্যাটিকে পেশ করছে।

দস্তেয়ভস্কির প্রত্যুত্তর গ্লানিভরা। স্তাভ্রোজিন তাকে বলেছে "লজ্জা"। পক্ষান্তরে,

অ্যাবসার্ড সৃষ্টিকর্ম কোনও জবাব দেয় না; উভয়ের মধ্যে সার্বিক তফাৎ এটাই। উপসংহারে সতর্কভাবে এই কথাটিকে নোট করছি এই গ্রন্থে কোনও খ্রিস্টান চরিত্র অ্যাবসার্ডের বিরোধিতা করছে না, বিরোধিতা করছে তার পারলৌকিক-জীবন সম্বন্ধীয় প্রচারের। একই সঙ্গে খ্রিস্টান এবং অ্যাবসার্ড হওয়া সম্ভব। এরকম অনেক খ্রিস্টানের দৃষ্টান্ত আছে, যারা পরলোকের জীবনে বিশ্বাস করে না। সুতরাং, শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে অ্যাবসার্ড বিশ্লেষণের কোনও একটি দিককে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব, যেগুলিকে পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতেই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারত। "সুসমাচারের অ্যাবসার্ডিটি" প্রচারের যে ধরনটি আছে উক্ত প্রচারটিও তারই অভিমুখী। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারটা অবিশ্বাস্যতাকে আটকায় না— এই বহুপ্রসূ প্রতিক্রিয়াপূর্ণ ধারণাটিকেই তা আলোকিত করে। উল্টোদিকে এও অনায়াসলক্ষ্য যে, এই পথগুলির সঙ্গে পরিচিত *লে পসেদে*-এর লেখক উপসংহারে এসে একটা অন্য পথ ধরেছেন। দস্তেয়ভস্কি, চরিত্রগুলির যিনি স্রষ্টা কিরিলভের প্রতি তাঁর বিস্ময়কর জবাবটিকে এভাবে সারসংক্ষেপিত করা যেতে পারে অস্তিত্ব ছলনাময়ী এবং তা শাশ্বত।

————

## LA CRÉATION SANS LENDEMAIN

# ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি বা যে সৃষ্টি আগামীতে থাকবে না

যাইহোক, এখানে পৌঁছে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, চিরকাল আশাকে পাশ কাটানো সম্ভব নয় এবং যারা তার থেকে মুক্ত থাকতে চায়, তাদেরকেও আশা অবরুদ্ধ করে ফেলতে পারে। এ নিয়ে বিভিন্ন বইয়ে এতদিনের আলোচনাগুলোয় এই কৌতূহলেরই প্রকাশ লক্ষ্য করেছি। তাই, বিশেষ করে, সৃষ্টি-জগতের সত্যিকারের অ্যাবসার্ড কাজের একটা তালিকা আমি করতে পারি।[৫৪] তবে, সবকিছুরই একটা শুরু থাকা উচিত। এক ধরনের বিশ্বস্ততা এই গবেষণার লক্ষ্য। প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধীদের ব্যাপারে চার্চ যে এত কর্কশ, তার কারণ, চার্চ মনে করে যে, অধঃপাতে যাওয়া ছেলের মতো আর শত্রু হয় না। কিন্তু খ্রিস্টীয় জ্ঞানবাদী ঔদ্ধত্যের রেকর্ড এবং মানিসিয়ান (manicheens)[৫৫] প্রবণতার অধ্যবসায় গোঁড়া মৌলবাদ পত্তনের ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রার্থনার চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসূ। যথোচিত সম্মতিপূর্বক বলতে চাই, অ্যাবসার্ডের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। একের পথ যে অন্যদের থেকে আলাদা— সেটা আবিষ্কারের পরে প্রত্যেকে সেটাকেই অবলম্বন করে। আশা যে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ছদ্মবেশে ফিরে আসে, তা লক্ষ্য করা যে ভাবলেশহীন কোনও ব্যাপার নয়—তা অ্যাবসার্ড যুক্তিবিচার পদ্ধতির চূড়ান্ত পরিণামে, তার স্বীয় যুক্তিনির্ধারিত কোনও একটি প্রবণতার মধ্যে প্রকাশিত। সেই প্রবণতাটি অ্যাবসার্ড *আত্মনিগ্রহের* জটিলতাকেই নির্দেশ করে। মোটের উপর তা অনিঃশেষ সতর্কতার আবশ্যকতাকেই নির্দেশ করে এবং এভাবে আমার এ প্রবন্ধের মূল পরিকল্পনাটিকেই মান্যতা দেয়।

অ্যাবসার্ড রচনাগুলির নির্ঘণ্ট-রচনার কাজটা বড্ড আগাম হয়ে যাচ্ছে—এ রকম মনে হলে, তাদের মধ্যে যেটিতে অ্যাবসার্ড অস্তিত্বের সমগ্রতা আছে, সেটির ব্যাপারে সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে বিশেষ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতেই পারে। নঞর্থক ভাবনা ছাড়া আর্ট কখনই যথার্থতা লাভ করে না। কোনও মহৎ সৃষ্টিকে তার সাদায়-কালোয় উপলব্ধি করতে গেলে আর্টের বিবর্তনে তার অন্ধকার এবং অবমাননাকর দিকগুলিরও পর্যায়ক্রমিক বিবরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। "শুধু শুধু" কাজ করা এবং সৃষ্টি করা, কাদামাটির মূর্তিরচনা, নিজের সৃষ্টির যে কোনও ভবিষ্যৎ নেই সেটা জানা, এক

বার সচেতন হয়ে দেখা যে, একদিন তার সৃষ্টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে (কারণ, শত শত বছরের জন্যে নির্মিত একটি সৌধের চেয়ে তার সৃষ্টির গুরুত্ব বেশি নয়)—এগুলো খুবই গভীর প্রজ্ঞার ব্যাপার। অ্যাবসার্ড ভাবনা এ প্রজ্ঞাকে মান্যতা দেয়। একদিকে নাকচ করা এবং অন্যদিকে তাকে বড় করে দেখানো—একই সঙ্গে পরস্পরবিরোধী দুটি কাজ করার যে পদ্ধতি, অ্যাবসার্ড স্রষ্টার সামনে খোলা শুধু সেটিই। তাই, তাকে শূন্যতাকে বর্ণময় করে তুলতেই হয়।

কোনও শিল্পকর্মের বিশেষ ধারণাকে এটা এগিয়ে নিয়ে যায়। স্রষ্টার কাজকে প্রায়শই আমরা বিচ্ছিন্ন কোনও স্মারকের পরম্পরা হিসেবে লক্ষ্য করি। এভাবে শিল্পী এবং বিদ্বান উভয়কে পরস্পরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি। কোনও গভীর ভাবনা একটা ধারাবাহিক রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে জীবনের অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করে তাকে একটা নির্দিষ্ট রূপ দেয়। একইভাবে কোনও মানুষের সমগ্র সৃজন তার সেই নির্দিষ্ট সৃজনকর্মের ধারাবাহিক ও বিভিন্ন রূপের মধ্যে নিজের শক্তিসঞ্চয় করে। একে অন্যকে তারা সহযোগ দান করে, ভুল শুধরে দেয়, পরস্পরকে ছাপিয়ে যায়, এমনকি উভয়ের মধ্যে বিরোধিতাও ঘটে। কেউ যদি সৃষ্টির শেষ ঘণ্টাটি বাজিয়ে দেয়, তবে তা অন্ধ শিল্পীর "আমার যা ছিল, সবই হয়ে গেছে বলা"—এই জয়সূচক অলীক চিৎকারটি নয় : তা হচ্ছে স্রষ্টার মৃত্যু, যা তার অভিজ্ঞতার ঝাঁপিটি বন্ধ করে দেয় এবং প্রতিভাদীপ্ত বইটির ইতি টানে।

তবে সার্বিকভাবে দেখলে তারা তাদের স্বাভাবিক বর্গগুলিকে পুনরুদ্ধার করে। যেমন, মৃত্যু থেকে তারা তাদের নির্দিষ্ট তাৎপর্যগুলিকে আহরণ করে। তারা তাদের সব থেকে স্পষ্ট আলোটা তাদের লেখকদের নিজের জীবন থেকে গ্রহণ করে। মৃত্যুর সময় তাদের ধারাবাহিক কাজগুলো কেবলই তাদের ধারাবাহিক ব্যর্থতারই সংকলন মাত্র। কিন্তু এই ব্যর্থতাগুলি যদি একইভাবে সাড়া দেয়, তবে বুঝতে হবে স্রষ্টা তার নিজের ভাবমূর্তিটি পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে এবং সে যে নিষ্ফলা গুমোরটির অধিকারী, হাওয়ায় ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে সেটিকে।

আধিপত্যবিস্তারের প্রযত্নটি এখানে প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু মানবিক বুদ্ধি এখানে খুবই প্রবল, যা কেবল সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত দিকগুলিকেই নির্দেশ করবে। অন্যত্র এই সত্যটাকে আমি প্রকাশ করেছি যে, সচেতন থাকা ছাড়া মানুষের ইচ্ছের আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু নিয়মানুবর্তিতা ছাড়া তা অসম্ভব। ধৈর্য এবং প্রাঞ্জলতার যত রূপ আছে সেখানে সৃষ্টি-ই সব থেকে কার্যকর। মানুষের একমাত্র সম্ভ্রমের নড়বড়ে প্রমাণ এটি-ই নিজের অবস্থার বিরুদ্ধে জেদি বিদ্রোহ এবং এক নিষ্ফলা প্রয়াসের অধ্যবসায়। এটি দাবি করে রোজকার চেষ্টা, স্বীয় দক্ষতা, সত্যের সীমা, পরিমাণ ও শক্তি সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা। এটি *আত্মনিগ্রহ* রচনা করে। পুনরাবৃত্তি করার জন্যে ও সময়কে চিহ্নিত করার জন্যে ওগুলো সবই "অনর্থক"। কিন্তু কোনও মহৎ শিল্পকর্ম শিল্পীর কাছে যে শ্রম দাবি

করে এবং তার দুঃস্বপ্ন জয় করবার ও নিজের নগ্ন বাস্তবের (সত্যের) মুখোমুখি হওয়ার যে সুযোগ দান করে, তার তুলনায় শিল্পের নিজের গুরুত্ব (নান্দনিক) হয়ত কমই।

নন্দনতত্ত্বের বিচার করতে গিয়ে যেন আমরা কোনও ভুল না করে বসি। এবারে আমি যা বলব, তা কোনও তত্ত্বের (thèse/thesis) সহিষ্ণু অন্বেষণ বা অনবচ্ছিন্ন ও অর্থহীন বিশ্লেষণ নয়। বরং তার উল্টো (যদি আমি তাকে স্পষ্টরূপে বুঝে থাকি)। তত্ত্বোপন্যাস (la roman à thèse/thesis novel) যা প্রমাণ করে, তা সবার কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য। তা সেই বস্তু, যা প্রায়ই আত্মতুষ্ট চিন্তায় অনুপ্রাণিত। যখন আপনি নিশ্চিত যে, সত্য আপনার দখলে, তখনই আপনি তার কথা বলেন। কিন্তু মানুষ যে ধারণাগুলিকে প্রকাশ করে, সেগুলি তার ভাবনার উল্টো হয়ে থাকে। এ ধরনের স্রষ্টা এবং দার্শনিকেরা নিজেদের নিয়ে বিব্রত। পক্ষান্তরে, আমি যাদের কথা বলছি বা ভাবছি, সেই চিন্তাবিদ্দের ভাবনা খুব প্রাঞ্জল। যে মুহূর্তে ভাবনাগুলো প্রতিবর্তনমূলক (retour/reversal) হয়, সেগুলো তাদের কাজের বিভিন্ন দিকগুলিকে তাদের সীমিত, জাগতিক এবং বিপ্লবী ভাবনার স্বতঃসিদ্ধ প্রতীক হিসেবে আমাদের সামনে উত্থাপিত করে।

তারা কিছু একটা প্রমাণ করে। কিন্তু সেই প্রমাণগুলি হলো সেই সমস্ত .প্রমাণ, যেগুলিকে ঔপন্যাসিকেরা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, সাধারণভাবে জগতের জন্যে নয়। মূল কথা হলো, ঔপন্যাসিকেরা বাস্তবে সফলতা লাভ করবে আর এতেই তাদের মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। যে ভাবনাটি তাদের জন্যে সার্বিকভাবে এই যৌন সফলতা রচনা করেছে, তার মধ্যে বিমূর্ত শক্তিগুলি নাস্তানাবুদ হয়েছে। তাদের যখন এই হাল, শরীর তখন সৃষ্টির জগৎকে তার সমস্ত অ্যাবসার্ড ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান করে তুলেছে। এই তির্যক দর্শনগুলি-ই গড়ে তুলেছে আবেগদৃপ্ত রচনাগুলিকে।

যে চিন্তাগুলি ঐক্যকে বর্জন করে, তারাই বৈচিত্র্যকে মহিমায়িত করে। বৈচিত্র্যই আর্টের বাসভূমি। একমাত্র সে চিন্তাই মনকে স্বাধীন করতে পারে, যা নিজের সীমাবদ্ধতা এবং ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে সজাগ থেকে মনকে একান্তে ছেড়ে দিতে পারে। কোনও বিশেষ তত্ত্ব সেই চিন্তাকে প্রলুব্ধ করে না। জীবন ও শিল্পের পরিপক্কতার জন্যে এই চিন্তা অপেক্ষা করে। এই চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে চির-হতাশ সেই আত্মাটিকে এই সৃষ্টিটি ফের এক বার নেহাতই ধরা গলায় নিজের কথা বলবে। আর স্রষ্টা তো তখন নিজের খেলায় ক্লান্ত হয়ে পালিয়ে যেতে চাইছে। স্রষ্টা যদি নিজের খেলায় ক্লান্ত হয়ে সেখান থেকে চলেই যেতে চায়, তাহলে হয়ত বলবে না কিছুই।

সুতরাং অ্যাবসার্ড সৃষ্টির কাছে আমি অদেরকেই চাই, যাদেরকে চাই চিন্তার কাছেও। তারা হলো বিদ্রোহ, স্বাধীনতা এবং বৈচিত্র্য। যদিও পরে এদের নিরর্থকতা যথেষ্টই

প্রকট হয়ে উঠবে। যেখানে বুদ্ধি ও আবেগ একাত্ম হয়ে স্বয়ং আগুয়ান হয়, প্রতিদিনের সেই প্রয়াসে অ্যাবসার্ড লোকটি যে নিয়মানুবর্তিতা আবিষ্কার করে, তা তার শক্তিগুলির পক্ষে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। উপযুক্ত অধ্যবসায়, নিষ্ঠা এবং সুবোধ্যতার প্রয়োগ এভাবে বিজেতার মানসিকতার সারূপ্য অর্জন করে। সৃজনশীলতা যেন কারুর ভাগ্যকে সাকার করে তোলার মতো। কারণ, এই চরিত্রগুলো, তাদের কর্মপ্রণালি, অন্তত তাদের নিজেদের স্বভাবানুগই পরিস্ফুটিত হয়েছে। অভিনেতাটি আমাদের শিখিয়েছে যে সত্তা এবং তার অভিব্যক্তির মাঝখানে কোনও সীমান্ত-অঞ্চল নেই।

আবারও বলছি, এই কথাগুলির কোনওটিরই প্রকৃত কোনও অর্থ নেই। তবে এই স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে এখনও অনেক কিছু করা সম্ভব। স্রষ্টা বা বিজেতা যে-ই হোন, তার অন্তিম চেষ্টাটাই থাকে নিজেকে দায়িত্বভারমুক্ত করা; সেটিকে হাসিল করতে এগিয়ে যাওয়া। তা সে জয়লাভের জন্যে, প্রেমের জন্যে, সৃষ্টির লক্ষ্যে বা এমনি এমনি, যে কোনও কারণেই হতে পারে। এভাবেই কারুর জীবনের চূড়ান্ত নিষ্ফলতাকে পূর্ণাঙ্গতা দান করা হয়। বস্তুত, এটা তাদের ওই কাজটাকে বুঝতে অনেক বেশি স্বাধীনতা দান করে, সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অ্যাবসার্ডিটি সম্পর্কে সচেতনতাও অর্জন করে। এর ফলে তারা যাবতীয় অতিরেকসহ ঝাঁপিয়ে পড়ার অধিকারটাও লাভ করে। শেষ পর্যন্ত যা পড়ে থাকে, সেই নিয়তির পরিণতিটা স্বয়ং ভয়াবহ। মৃত্যুর সেই একক ভয়াবহতার বাইরের যা কিছু আনন্দ বা সুখ,—সবই স্বাধীনতা। সেই পৃথিবীটাই পড়ে থাকে, মানুষই যার একমাত্র প্রভু। যা তাকে এতকাল ধরে রেখেছিল, তা ছিল অন্য কোনও পৃথিবীর বিভ্রম (এটা স্বর্গ বা নরক—যা কিছুই হতে পারে)। তার ভাবনার পরিণামগুলো আর বিচ্ছেদমূলক থাকে না, হয়ে ওঠে দৃশ্যমালার স্তবকবন্ধ। নিঃসন্দেহে তা উচ্ছলিত হয় মিথের মধ্যে। কিন্তু মানুষের যন্ত্রণাভোগ ব্যতীত এই মিথগুলির অন্য কোনও গভীরতা থাকে না। মানুষের যন্ত্রণার মতই সেই মিথগুলির গভীরতার কোনও অন্ত থাকে না। মানুষকে যা মুগ্ধ ও বিচারশক্তিহীন করে তোলে, তা সেই পবিত্র ঐশী উপকথাটি নয়, বরং মর্ত্য মুখচ্ছবি, ভঙ্গিমা এবং নাটক, যার মধ্যে এক দুরূহ প্রজ্ঞা এবং ক্ষণস্থায়ী একটি আবেগ সংহত হয়েছে।

—

# LE MYTHE DE SISYPHE
# সিসিফাসের* কিংবদন্তী

* সিসিফাস-এর ফরাসি সিজিফ্। স্বভাবতই কামুও তাই লিখেছেন। কিন্তু সিসিফাস নামটি বাঙালি পাঠকের কাছে পরিচিত বলে সর্বত্র 'সিসিফাস'-ই ব্যবহৃত হলো।

দেবতারা সিসিফাসকে এই দণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন যে, তাকে পাহাড়ের চুড়োয় একটি পাথরের খণ্ডকে সারাক্ষণ তুলতে হবে, যখন সেটি নিজের ওজনে বার বার গড়িয়ে পড়বে নিচে। তাঁরা যুক্তিসম্মতভাবেই ভেবেছিলেন যে, নিষ্ফল আর নিরাশ শ্রমের থেকে বেশি ভয়াবহ আর কোনও শাস্তি নেই।

হোমারকে বিশ্বাস করলে, তাঁর ধারণা অনুযায়ী মানুষের মধ্যে সিসিফাস ছিল সব থেকে জ্ঞানী আর বিচক্ষণ। অন্য একটি লোকশ্রুতি এই যে, সে দস্যুবৃত্তি করত। আমি এ দুয়ের মধ্যে কোনই অসঙ্গতি দেখতে পাই না। যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে মতামতেরও পার্থক্য ঘটে, কেন সিসিফাস নরকের একজন ব্যর্থ শ্রমিকে পরিণত হল। প্রথম থেকে বলতে গেলে বলতে হয় যে, দেবতাদের হাল্‌কাভাবে নেওয়ার জন্যেই সে অভিযুক্ত হয়। দেবতাদের গোপনতাকে সে হরণ করেছিল। ঈসোপুস-এর কন্যা ঈজিনাকে নিয়ে গিয়েছিল জুপিটার। কন্যার এই অন্তর্ধানে তার পিতা ঈসোপুস অত্যন্ত আহত হয়েছিল এবং সিসিফাসের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিল। সিসিফাস, যে এই অপহরণের ব্যাপারটা জানত, সে এই শর্তে গোপন খবরটি জানাতে রাজি হয় যে, কোরিন্থ-এর নগরদুর্গে ঈসোপুসকে জল সরবরাহ করতে হবে। দেবলোকের বজ্রনির্ঘোষের থেকে জলের আশীর্বাদ তার কাছ অধিক কাঙ্ক্ষণীয় ছিল। এর জন্যে তাকে শাস্তি দিয়ে নরকে পাঠানো হয়েছিল। হোমার আমাদের এও জানিয়েছেন যে, সিসিফাস মৃত্যুকে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। প্লুটো তার সাম্রাজ্যের পরিত্যক্ত ও স্তব্ধ রূপটিকে সইতে পারছিল না। তাই সে যুদ্ধের দেবতাকে পাঠিয়েছিল, যিনি মৃত্যুকে তাঁর বিজেতার হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

কথিত আছে যে, সিসিফাস মৃত্যুর নৈকট্যে থাকায় তার পত্নীর ভালোবাসা পরখ করে দেখতে চেয়েছিল। নিজের শবটিকে সমাহিত করার পূর্বে খোলা রাস্তার মাঝখানে শায়িত করার নির্দেশ দিয়েছিল পত্নীকে। সিসিফাস নরকে জেগে উঠেছিল এবং সেখানে মানুষী ভালোবাসার প্রবল প্রতিস্পর্ধী বিশ্বস্ততায় উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল। তাই, পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে তার স্ত্রীর সংশোধনার্থে প্লুটোর কাছে সম্মতি আদায় করে নিয়েছিল। কিন্তু, যখন সে আবার পৃথিবীর রূপের সঙ্গে পরিচিত হল, পৃথিবীর জল, রৌদ্রালোক, উষ্ণ প্রস্তর আর সমুদ্রকে উপভোগ করল, তখন আর নরকের অন্ধকারে ফিরে যেতে চাইল না। তাকে ডেকে পাঠানো হলো, তার প্রতি ক্রোধ ব্যক্ত করা হলো, তাকে সতর্ক করা হলো—কিন্তু কোনওটাই কাজে এল না। বহু বছর ধরে সে খাঁড়ির বাঁক, উজ্জ্বল

সমুদ্র এবং সুস্মিত পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিল। দেবতাদের হুকুমজারি অবশ্যম্ভাবী ছিল। বুধ এলো এবং এই উদ্ধত লোকটির জামার কলার ধরে, তার আনন্দ থেকে তাকে উপড়ে ফেলে জোর করে তাকে ফের নরকে পাঠাল, যেখানে সেই পাথরের খণ্ডটিকে আগে থেকেই তার জন্যে রাখা ছিল।

ইতিমধ্যেই আপনারা বুঝে নিয়েছেন যে, সিসিফাস একজন অ্যাবসার্ড নায়ক। যতোটা তার আবেগপ্রবণতার জন্যে ততোটাই তার উপরে ঘটে যাওয়া নির্যাতনের জন্যে। দেবতাদের প্রতি তার অবজ্ঞা, মৃত্যুর প্রতি তার বিদ্বেষ, জীবনের প্রতি তার প্রবল আবেগের জন্যেই সে এক অকথ্য দণ্ড লাভ করেছে, যেখানে তার সমগ্র অস্তিত্বটিকে নিয়োজিত করা হয়েছে, কিছুই না করার জন্যে। পৃথিবীর প্রতি তীব্র আবেগ প্রকাশের জন্যে অবশ্যই এ ধরনের মূল্য দিতে হয়। সিসিফাসের নরক-বাস সম্পর্কে অন্য তথ্য কিছুই আমরা জানি না। মিথগুলো তৈরি হয় আমাদের কল্পনাশক্তিকে চাগিয়ে দেওয়ার জন্যে। সে কারণেই এখানে আমরা দেখি যে, একটি বিশাল পাথরের খণ্ডকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাহাড়ের ঢালে শত বার উপরে তোলার জন্যে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে কী প্রাণান্ত চেষ্টা সিসিফাসের। আমাদের চোখে পড়ে তার সিঁটিয়ে যাওয়া মুখ, পাথরের খণ্ডটিতে লেপ্টে থাকা তার গণ্ডদেশ, কাঁধ দিয়ে ঠেসে উপরে ধরে রাখা কাদামাটি মাখা পাথরের পিণ্ড, নিচে সেই কাদার মধ্যেই সেঁটে থাকা তার পা দুটিকে, মানুষের সার্বিক নিরাপত্তার জন্যে যে হাতের সৃষ্টি, কাদামাটি মাখা সেই হাত দুটি প্রসারিত করে পাথরখণ্ডটিকে আবার উপরে তোলবার চেষ্টাকে। যেখানে আকাশ নেই, সময় হারিয়ে ফেলেছে তার গভীরতা, সেই স্থান এবং কাল তার উপরে এই দীর্ঘ দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যপূরণ হয়েছে তার, মুহূর্তের মধ্যে পাথরটিকে যখন সে গড়িয়ে নিচের পৃথিবীতে পড়ে যেতে দেখেছে, এবার যেটিকে আবার গড়িয়ে গড়িয়ে পাহাড়ের চুড়োয় তুলতে হবে তাকে। সুতরাং আবার সে নেমে আসে উপত্যকায়।

প্রত্যাবর্তনের অন্তবর্তী ওই সময়-সীমায়, ওই বিরতিপর্বের সিসিফাস আমাকে আকর্ষণ করে। পাথরের অতো কাছে কঠোর পরিশ্রম করতে করতে তার মুখটি এখন নিজেই রূপান্তরিত হয়েছে পাথরে। খুবই ভারী অথচ সুমিত পদক্ষেপে লোকটিকে আমি ফিরে যেতে দেখি নিচে, তার যন্ত্রণার দিকে, যে যন্ত্রণার শেষ কোথায় তা সে নিজেই জানে না। তার নিশ্চিত যন্ত্রণার মতোই দম নেবার যে ক্ষণটি তার কাছে ফিরে আসে—সেটি-ই তার সচেতনতার মুহূর্ত। ওই মুহূর্তগুলিতে যখন সে দেবতাদের স্তরে উত্তীর্ণ হয়, তখন নিয়তির চেয়েও মহৎ হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে পাথরের চেয়েও শক্তিশালী।

এই মিথটি যদি ট্র্যাজিক হয়, তবে তার কারণটা এই যে, এর নায়ক সতর্ক। যদি প্রতিটি মুহূর্তেই আশা তাকে চালিত করে তাহলে আর নিপীড়নের জায়গা থাকে কোথায়?

একালের শ্রমিকরাও প্রতিদিন একই কাজ করে এবং তাদের জীবনও কম অ্যাবসার্ড নয়। কিন্তু তা কদাচিৎ ট্র্যাজিক হয়ে ওঠে, যখন তারা সচেতন হয়ে ওঠে। দেবতাকুলের সর্বহারা সিসিফাস, ক্ষমতাহীন এবং বিদ্রোহী। সে তার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার সমগ্র রূপটি সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল। নিচে নামার সময় এটা সে উপলব্ধি করে। যে সহজ কারণে তার নির্যাতন জুটেছে, সেই কারণই তাকে জয়মুকুটও পরিয়েছে। এমন কোনও নিয়তির অস্তিত্ব নেই, যাকে অবজ্ঞার দ্বারা জয় করা যায় না।

তাই অবরোহণটি যদি কখনও দুঃখের মধ্যে দিয়ে ঘটে, তাহলে তা আনন্দের মধ্যে দিয়েও ঘটতে পারে। এটা তেমন বড় কথা নয়। কল্পনা করা যাক, আবার সিসিফাস তার পাথরের কাছে ফিরে গেছে এবং তার দুঃখের দিন শুরু হয়েছে। মর্ত্যের ছবিগুলি যখন স্মৃতিগুলিকে সজোরে আঁকড়ে ধরে, সুখের আহ্বান যখন হয়ে ওঠে তীব্র, তখনই মানুষের মনে জেগে ওঠে বিষাদ : পাথরখণ্ডটির জয় এখানেই, যা পাথর-খণ্ডটি স্বয়ং। বহন করার জন্যে বিপুলা দুঃখ বড্ড ভারী। এ যেন আমাদের গেথসেমানি'র[৫৬] রাত্রিসমূহ। কিন্তু যে সত্য জীবনকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়, স্বীকৃতির অভাবে তা ধ্বংস হয়ে যায়। এভাবে ঈদিপাস সত্য না জেনে শুরুতেই নিয়তির অনুগামী হয়। কিন্তু যে মুহূর্তে সে সত্যটিকে জানতে পারে ট্র্যাজেডির শুরু হয় তখনই। কিন্তু একই সঙ্গে অন্ধ এবং মরীয়া তার মনে হয় যে, পৃথিবীর সঙ্গে তার একমাত্র বন্ধন রচনা করছে মর্ত্যনারীর শীতল হাতখানি। তারপর তার মারাত্মক একটি মন্তব্য বাজতে থাকে আমাদের কানে "এত অগ্নিপরীক্ষার পরেও, আমার পরিণত বয়স ও আত্মার মহনীয়তা আমাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, সবই ঠিক আছে।" দস্তেয়ভস্কির কিরিলভের মতো সফোক্লিসের ঈদিপাস এভাবে অ্যাবসার্ড-বিজয়ের রেসিপি দান করে। প্রাচীন প্রজ্ঞা আধুনিক শৌর্যকে স্বীকৃতি দেয়।

সুখের একখানি নির্দেশিকাগ্রন্থ লিখতে প্রলুব্ধ না হয়ে কেউ অ্যাবসার্ডকে আবিষ্কার করে না। "আরে! কী সংকীর্ণ দৃষ্টি আপনার?" যাইহোক, পৃথিবী তো একটাই। সুখ আর অ্যাবসার্ড একই পৃথিবীর দুই সন্তান। তারা অবিভাজ্য। এ কথাটা বলা ভুল হবে যে, প্রধানত অ্যাবসার্ড উদ্ভাসন থেকেই সুখ উদ্‌গত হয়, একইভাবে অ্যাবসার্ডের অনুভূতিও সুখ থেকে উদ্‌গত হয়। ঈদিপাস বলেছিল "আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, সবই ঠিক আছে।" তার এই মন্তব্যটি পবিত্র। অরণ্যে এবং মানুষের সীমিত ভুবনে এই উক্তিটি এখনও অনুরণিত হচ্ছে। উক্তিটি সবাইকে এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, এখনও সব কিছু শেষ হয়ে যায় নি। উক্তিটি এই বিশ্ব থেকে একজন দেবতাকে বিতাড়িত করবে, যে এখানে এসে অতৃপ্ত ছিল এবং বাধ্য হয়েছিল একটি নিষ্ফলা যন্ত্রণাকে বেছে নিতে। উক্তিটি

অদৃষ্টকে মানবিক-বিষয় করে তোলে, যার মীমাংসা মানুষকে নিজেদের মধ্যেই করে নিতে হবে।

সিসিফাসের সমস্ত নিঃশব্দ আনন্দই রয়েছে সেখানে। তার অদৃষ্ট তারই। পাথরটিও তারই নিজের বস্তু। একইভাবে অ্যাবসার্ড ব্যক্তিটি যখন মনে মনে নিজের কষ্টের কথা ভাবে, তখন সে তার উপাস্য দেবতাদের স্তব্ধ করে রাখে। সহসা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে তারই নৈঃশব্দ্য। সেখানে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বিস্ময়ভরা ক্ষুদ্র কণ্ঠস্বর জেগে ওঠে। অবচেতন, গোপন বার্তা, সবার মুখের ইশারা এসবই হয়ে ওঠে প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া এবং বিজয়ের মূল্য। ছায়া ছাড়া সূর্য হয় না, আর তাই রাতকে জানা জরুরি। অ্যাবসার্ড মানুষটি "হ্যাঁ" বলে আর তার প্রয়াস থাকে অব্যাহত। ব্যক্তিগত অদৃষ্ট বলে যদি কিছু থাকে, তবে উচ্চতর অদৃষ্টের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। যদিওবা কিছু একটা থাকে, তবে তা হচ্ছে সেইটি, যেটিকে সে অবশ্যম্ভাবী এবং ঘৃণার্হ বলে মনে করে। এতদ্ব্যতীত, সে স্বয়ং জানে যে, সে-ই তার দৈনন্দিন জীবনের প্রভু। ওই সূক্ষ্মতম মুহূর্তে যখন মানুষ, জীবনের পেছন পানে ফিরে তাকায়, তখন সিসিফাস তার পাহাড়ে ফিরে যায়। কেন্দ্রহীন সেই তাৎক্ষণিক গতিময়তার মধ্যে সে মনে মনে ভেবে নেয় সেই ঘটনাগুলির কথা, যেগুলি নিঃসম্পর্কিত হলেও তার অদৃষ্ট হয়ে উঠেছে, যেগুলি তারই সৃষ্ট, তারই স্মৃতিপথের সঙ্গে জড়িয়ে হচ্ছে এবং শিগ্‌গিরই তার মৃত্যুতে চাপা পড়ে যাবে। যা কিছু মানবিক, যার মুলে রয়েছে শুধুই মানুষ, তাতে প্রত্যয় অর্জন করে একজন দৃষ্টিহীন মানুষ এভাবে দেখার জন্যে উৎসুক হয়ে ওঠে, যে জানে যে, রাত্রির কোনও শেষ নেই। সিসিফাস যাচ্ছে এখনও। পাথরটি গড়াচ্ছে এখনও।

পাহাড়ের পাদদেশে আমি সিসিফাসকে ছেড়ে এলুম। সকলেই যার যার নিজের ভার (fardeau/weight) দেখতে পায়। সিসিফাস আমাদের শেখায় সেই শ্রেষ্ঠ আনুগত্য, যা দেবতাদের অস্বীকার করে এবং সামনে তুলে ধরে পাথর। সেও সিদ্ধান্ত নেয় যে, সবই ঠিক আছে। এর পর থেকে ঈশ্বরহীন এই ব্রহ্মাণ্ডটা আর নিষ্ফলাও নয়, নিরর্থকও নয়। ওই পাথরটির প্রতিটি অণুকণা, ওই রাত্রিপরিবৃত পর্বতের প্রতিটি উজ্জ্বলিত খনিজ নিজের মধ্যেই যেন এক একটি পৃথিবী গড়ে তোলে। শুধুমাত্র শৃঙ্গাভিলাষী লড়াইটি-ই মানুষের অন্তরকে ভরিয়ে তুলতে যথেষ্ট। সিসিফাসকে সুখী বলেই গণ্য করতে হবে।

— — — —

APPENDICE

# L'ESPOIRE ET L'ABSURDE DANS L'ŒUVRE DE FRANZ KAFKA

পরিশিষ্ট

# ফ্রান্ৎস কাফকার রচনায় আশা ও অ্যাবসার্ড

L'étude sur Franz Kafka que nous publions en appendice a été remplacée dans la première édition du *Mythe de Sisyphe* par le chapitre sur *Dostoievsky et le Suicide*. Elle a été publiée cependant par la revue *L'Arbalète* en 1943.

On y retrouvera, sous une autre perspective, a critique de la création absurde que les pages sur Dostoievsky avaient déjà engagée. *(Note de l'éditeur)*.

কাফকার উপরে রচিত যে লেখাটিকে আমরা পরিশিষ্ট অংশে ছাপছি, *ল্য মিত্ দ্য সিজিফ্*-এর প্রথম সংস্করণে সেটি ছিল 'দস্তেয়ভস্কি এবং আত্মহত্যা' শীর্ষক একটি অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যাই হোক, এটি ১৯৪৩-এ *লার্বালেত্*-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

আপনারা লক্ষ্য করবেন যে, ভিন্ন প্রেক্ষাপটে অ্যাবসার্ড-শিল্পকর্ম নিয়ে এ ধরনের অন্য একটি আলোচনা দস্তেয়ভস্কি শীর্ষক অধ্যায়টিতে ইতিমধ্যেই সন্নিবিষ্ট হয়েছে। (সম্পাদকের টীকা)

কাফকার সমস্ত লেখার ধরনটাই এমন যে, পাঠক বার বার পড়তে বাধ্য হয়। তাঁর লেখার উপসংহারগুলো বা যেখানে উপসংহার নেই, কিছু না কিছু ব্যাখ্যা হাজির করে। যদিও সেগুলি সুবোধ্য ভাষায় পরিস্ফুটিত হয় না, তবু তাদের যথার্থভাবে বুঝে ওঠার আগেই, প্রয়োজন হয় গল্পটিকে ভিন্ন কোনও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ফের একবার পড়বার। অনেকসময় দু ধরনের ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকে, যখন দু বার পড়ার আবশ্যকতা দেখা দেয়। লেখকও এটাই চান। তাই বলে, কাফকার লেখাকে খুঁটিয়ে বিচারের চেষ্টাটাও ভুল হবে। কোনও প্রতীক সাধারণভাবে এবং তার রূপান্তরের মধ্যে যাই হোক না কেন, একজন শিল্পী শুধু তাকে সঞ্চালনার মাধ্যমেই পুনর্বহাল করেন। শব্দ ধরে ধরে তার মানে করেন না। তাছাড়া প্রতীকবাদী শিল্পের থেকে দুরূহ আর কিছুই হতে পারে না। যেকোনও প্রতীকই সর্বদা লেখক প্রযুক্ত শব্দের প্রচলিত অর্থকে অতিক্রম করে যায় এবং তাকে দিয়ে এটাই বলায় যে, তা এর মানে যতটা ব্যক্ত করতে চেয়েছে, আসলেই, তার থেকে অনেক বেশি অর্থবহ হয়ে উঠেছে। এ দিক থেকে সুনিশ্চিত পদ্ধতি হচ্ছে অনর্থক না খুঁচিয়ে লেখাটার দখল নেওয়া, পূর্বনির্ধারিত কোনও ধারণায় চালিত হয়ে সেটিকে পড়তে না শুরু করা এবং তার চোরা স্রোতগুলির তল্লাসি না চালানো। বিশেষ করে, কাফকার ক্ষেত্রে এ নিয়মটাই মেনে নেওয়া ভালো যে, তাঁর নাটককে অনুসরণ করতে হবে বাইরের অনুষঙ্গে এবং উপন্যাসকে ঔপন্যাসিক রূপকল্পের মাধ্যমে।

প্রথম দৃষ্টিতে এবং একজন আনকোরা পাঠকের কাছে এগুলি হচ্ছে অশান্ত অভিযান, যেগুলি মাতিয়ে তুলেছে এমন কিছু উত্তাল এবং একগুঁয়ে চরিত্রকে, যারা এমন কিছু সমস্যাকে ধাওয়া করছে, যেগুলি কখনই তাদের নিজেদের তৈরি করা নয়। *বিচার* রচনাটিতে *জোজেফ 'ক'* অভিযুক্ত। কিন্তু কেন, তার কারণ সে জানে না। সন্দেহ নেই যে, সে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে আগ্রহী, কিন্তু কেন তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে, তা সে জানে না। উকিলেরা এ মামলাটিকে খুবই জটিল মনে করে। যদিও এ অবস্থাতেও সে খাওয়া দাওয়া, প্রেম করা কিংবা সংবাদপত্র পাঠ কিছুতেই ছেদ দেয় না। তারপরে বিচার শুরু হয়। তবে বিচার-কক্ষটি খুবই অন্ধকার। বিচার-প্রক্রিয়াটিকে *জোজেফ* তেমন বুঝতে পারে না এবং ধরেই নেয় যে, তার সাজা হবেই, যদিও জানে না কেন? মাঝে মাঝে সে খুবই সংশয়গ্রস্ত হয় এবং এভাবেই চলতে থাকে তার জীবন। অনেক দিন পরে সুন্দর পোশাক পরা দুজন নম্র স্বভাবের লোক তার সঙ্গে দেখা করে ও বলে তাদের অনুগামী হতে। যথেষ্ট সৌজন্যের সঙ্গে তারা তাকে একটি পরিত্যক্ত দুর্গে নিয়ে যায়, একটা পাথরের খণ্ডের উপরে তার মাথাটাকে রেখে বলি দেয়। মরার আগে নিশ্চয়ই দণ্ডিত সে বলে থাকবে—"কুকুরের মতো।"

দেখতেই পাচ্ছেন, কোনও কাহিনি'র প্রতীক নিয়ে কিছু কথা বলা কত কঠিন।

কেননা, তার বৈশিষ্ট্যগুলি এতই সংবেদনশীল যে, তাকে শুধুমাত্র স্বাভাবিকতা বলেই মনে হয়। কিন্তু এই স্বাভাবিকতা অনুধাবনের পক্ষে খুবই দুরূহ একটা বর্গ। কিছু কিছু লেখা আছে, যেখানে এ ধরনের প্রসঙ্গকে পাঠকের খুবই স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু বাকি জায়গায় (নিশ্চয়ই খুব কমই উদাহরণ পাওয়া যাবে) তাদের জীবনে যা ঘটে, চরিত্রেরা সেগুলিকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়। উদ্ভট অথচ স্পষ্টগ্রাহ্য একটি কূটাভাসের (paradox) মাধ্যমে বলা যায় যে, চরিত্রগুলির অভিযান যত বেশি অসাধারণ হবে, গল্পের স্বাভাবিকতাও তত চোখ পড়বে কোনও মানুষের জীবনের অস্বাভাবিকতাকে আমরা যতটা অনুভব করি এবং সেই মানুষটি তার সেই অস্বাভাবিকতাকে যতটা মেনে নেয়, তারই একটা অনুপাত এখানে রয়েছে। সম্ভবত এই স্বাভাবিকতা কাফকার নিজস্ব। আর প্রকৃতপক্ষে সবাই বুঝতেও পারেন, *বিচার* উপন্যাসটির মূল বক্তব্য কী? অনেকেই এখানে সাধারণ মানুষের অসহায়তার প্রতিচ্ছবির কথা বলেন। ধারণাটি যথার্থ বটে। তবে ব্যাপারটা একই সঙ্গে সহজ এবং জটিলও। আমি বলতে চাই যে, উপন্যাসটির নিহিতার্থ কাফকার কাছে অত্যন্ত বিশিষ্ট এবং ব্যক্তিগত। একটা পর্যায় অবধি তিনি-ই কথা বলেন, যদিও আমার কাছে সেগুলিকে কিছু কিছু স্বীকারোক্তি বলে মনে হয়। তিনি বেঁচে রয়েছেন এবং দণ্ডিত হচ্ছেন। উপন্যাসের প্রথম দিকের পৃষ্ঠাগুলিতেই এটা তিনি জেনে যান যে, এই পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে তিনি সারাক্ষণ মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর যদি সত্যিই তা তিনি করে থাকেন, তবে, সব সময়ই তা করেছেন নিজের ভেতরে কোনো বিস্ময়বোধ না রেখে। এই বিস্ময়বোধের অভাবের জন্যে তিনি কখনই তেমন বিস্ময় প্রকাশ করেন না। এই অসঙ্গতিগুলো দিয়েই অ্যাবসার্ড রচনার প্রাথমিক লক্ষণগুলি চিহ্নিত হয়ে থাকে। মানুষের মন তার সুনির্দিষ্ট আত্মিক ট্র্যাজিডির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে এবং তা করতে পারে একমাত্র নিরবচ্ছিন্ন কূটাভাসের মাধ্যমে, যে কূটাভাস বিভিন্ন রঙকে শূন্যতা পরিস্ফূটনের ক্ষমতা প্রদান করে, আর প্রাত্যহিক জীবনাচরণকে প্রদান করে ধ্রুবের লক্ষ্যে নিজেকে রূপান্তরিত করে নেওয়ার শক্তি।

একইভাবে *দুর্গ* ঘটনাক্রমের দিক থেকে সম্ভবত একখানা চলমান থিয়োলজি, কিন্তু প্রধানত তা আত্মমর্যাদা-অন্বেষী এক সত্তার ব্যক্তিগত অভিযান, যা পৃথিবীর রাজকীয় রহস্য এবং নারীদের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা ঈশ্বরের চিহ্নগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসু। উল্টো দিকে, *মেটামরফোসিস* নিশ্চয়ই নৈতিক সুবোধ্যতার কিছু উৎকট চিত্রকল্পের সমাহার। কিন্তু তা ওই সব অগণন বিস্ময়েরও সৃষ্টি, যা মানুষ বেশ সচেতনভাবেই একটি জন্তু সম্পর্কে অনুভব করে, এবং বিনা চেষ্টাতেই নিজেই সেই জন্তুটিতেই একদিন রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই মৌলিক দ্ব্যর্থকতার ভেতরেই কাফকার গুহ্যতত্ত্বটি বিদ্যমান। স্বাভাবিক এবং অসাধারণ, ব্যক্তিক এবং সর্বজনীন, ট্র্যাজিক এবং প্রাত্যহিক, অ্যাবসার্ড এবং

যুক্তিময়তার এই অনবচ্ছিন্ন দোলাচলতাগুলি কাফকার সমস্ত লেখায় ছড়ানো এবং সেগুলি তাঁর লেখাকে একইসঙ্গে দান করছে মূর্চ্ছনা আর ব্যঞ্জনা। অ্যাবসার্ড লেখাকে বুঝতে হলে এই কূটাভাসগুলোকে এক এক করে বার করতে হবে, বৈপরীত্যগুলিকে বলবৎ করতে হবে নতুন করে।

বস্তুত, কোনও প্রতীক দুটো পরিকল্পনা, ভাবনা ও উত্তেজনার দুটো আলাদা জগৎ এবং ভাববিনিময়ের একখানি অভিধান আগাম কল্পনা করে রাখে। অভিধান-প্রণয়ন খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু দুটো জগতের সামনাসামনি হয়ে সচেতনতা অর্জনের ব্যাপারটা তাদের গোপন সম্পর্কের মাঝখানে এসে পড়ার মতো। কাফকার ক্ষেত্রে এই দুটো জগৎ হলো এক দিকে প্রাত্যহিক জীবন, অন্য দিকে অতিপ্রাকৃত উদ্বেগ। যেন এখানে আমরা নীৎশের উক্তির একটি অন্তহীন প্রয়োগ-সাফল্য লক্ষ্য করছি "বড় বড় সমস্যাগুলো একেবারে নেমে পড়েছে রাস্তায়।"

মানবিক পরিস্থিতির ভেতরে এক ধরনের মৌলিক অ্যাবসার্ডিটি ও অপ্রশমনীয় মহত্ত্ব রয়েছে (যেকোনও সাহিত্যেরই এটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য)। স্বাভাবিকভাবেই এ দুয়ের সমাপতন ঘটে। আবারও বলছি যে, উভয়ই উপস্থাপিত হয় আমাদের আত্মিক অতিরঞ্জন ও দেহের তাৎক্ষণিক আনন্দের মধ্যেকার একটি হাস্যকর বিচ্ছেদের ভেতরে। অ্যাবসার্ড বিষয়টা হলো এই যে, শরীরের আত্মাটি-ই অত্যন্ত দুর্বিনীতভাবে শরীরটিকে অতিক্রম করে যায়। যিনি-ই এই অ্যাবসার্ডিটিকে রূপায়িত করতে চাইবেন, তিনি অবশ্যই সমান্তরাল কিছু ধারাবাহিক বৈপরীত্যকে জীবন্ত করে তুলবেন। কাফকা এভাবেই ট্র্যাজেডিকে প্রাত্যহিকতা আর অ্যাবসার্ডকে যৌক্তিকতা দিয়ে প্রকাশ করেন।

একজন অভিনেতা কোনও ট্র্যাজিক চরিত্রের অভিনয়ে অতিরঞ্জন ঠেকাতে যত বেশি সতর্ক থাকে, ততই সেখানে অনেক বেশি নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করে। যদি সে নরমপন্থী হয়, তবে আতঙ্কের যে মুদ্রাগুলি ফুটিয়ে তোলে সেগুলি চরমপন্থী হয়। এদিক থেকে গ্রিক ট্র্যাজেডি উপদেশ-সমাকীর্ণ। ট্র্যাজিক শিল্পে নিয়তি সর্বদাই যুক্তি এবং স্বাভাবিকতার ছদ্মবেশে নিজেকে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ বোধ করে। ঈদিপাসের পরিণতি আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। অতিপ্রাকৃতিকভাবেই ঠিক করা হয়েছিল যে, সে খুন করবে ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সঙ্গে নিষিদ্ধ যৌনসংসর্গ ঘটাবে। যৌক্তিক পারম্পর্যের প্রদর্শনই নাটকের সর্বাত্মক প্রয়াস হয়ে থাকে, যা ক্রমান্বয়ে এক অনুমান (deduction) থেকে আর এক অনুমানে উপনীত হয়,—আর নায়কের দুর্ভাগ্যকেই মুকুট পরায়। নেহাতই ঘোষণা করে আমাদের জানানো যেন তার উদ্দেশ্য যে, ব্যতিক্রমী ভাগ্য কখনও সখনও ভয়াবহ, কারণ, তা অসম্ভবপর। কিন্তু যদি এর আবশ্যকতা আমাদের প্রাত্যহিক জীবন, সমাজ, দেশ, চেনা আবেগ ইত্যাদির কাঠামোর মধ্যে নিরূপিত হত, তাহলে আতঙ্কটা হত অন্তঃসারশূন্য। তখন যে বিদ্রোহটা মানুষকে নাড়িয়ে দিত, তা তাকে দিয়ে বলাতো

"তা অসম্ভব"। এই "তা" এর মধ্যে একটা চরম নিশ্চয়তা আছে।

গ্রিক ট্র্যাজেডির পুরো রহস্যটাই এখানে। অন্তত তার একটা অন্যতম লক্ষণ। কারণ, সেখানে একটা উল্টো পদ্ধতিও আছে, যেটা কাফকাকে আরো ভালোভাবে বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে। মানবহৃদয়ের একটি অক্লান্ত প্রবণতাই এই যে, যা তাকে ধ্বংস করে ফেলে, তাকেই সে ভাগ্য বলে ছাপ মেরে দেয়। অথচ একইভাবে সুখ যখন আসে, আসে কোনও যুক্তি ছাড়াই। কারণ, তা অবশ্যম্ভাবী। যাই হোক, আধুনিক মানুষ এর জন্যে নিজেরই কৃতিত্ব দাবি করে, যখন সুখটাকে চিনতে সে ভুল করে না কোনও। উল্টো দিক থেকে, গ্রিক ট্র্যাজেডির সুবিধাভোগী ভাগ্য এবং কিংবদন্তীর প্রসাদভোগীদের সম্পর্কেও অনেক কিছু বলা যেত। যেমন, ইউলিসিস তার নিকৃষ্ট অভিযানের মধ্যেও বেঁচে গেছে। (তার ইথাকায় ফেরার ব্যাপারটা সহজ ছিল না ততো।)

যেকোনও ক্ষেত্রেই মনে রাখতে হবে সেই গোপন যোগসাজশটিকে, যা যুক্তিশাস্ত্র এবং দৈনন্দিন মুহূর্তগুলিকে ট্র্যাজিডির সঙ্গে জুড়ে রাখে। এ কারণেই মেটামরফিসিসের নায়ক একজন ভ্রাম্যমান বিক্রেতা। এখানে এ কারণেই একমাত্র সেই নির্বেদ বস্তুটি রয়েছে তার বিচিত্র অভিযানের মধ্যে, যেখানে সে একটি কীটে রূপান্তরিত হওয়ায় অফিসে গরহাজির হবে এবং ওপরওয়ালা রেগে যাবেন তার উপরে। তার পা দুটো আর অন্যান্য অঙ্গগুলো পালটে যাচ্ছে কীটের মতো, মেরুদণ্ডটা বেঁকে যাচ্ছে ধনুকের মতো, পেটের উপরে দেখা দিচ্ছে সাদা সাদা ফুটকি—বলব না যে, এতে সে অবাক হচ্ছে না। কিন্তু অনুভূতিটা নষ্ট হয়ে যাবে, তাই ব্যাপারটায় "খানিকটা বিরক্তি" বোধ করছে সে। কাফকার সমগ্র শিল্পটাই এই গড়নটির মধ্যে রয়েছে। তাঁর কেন্দ্রীয় রচনা *দুর্গ*-এ রোজকার খুঁটিনাটি বিষয়গুলি রয়েছে। তবু, আশ্চর্য এই উপন্যাসটিতে, যেখানে কোনও কিছুই শেষ হয় না এবং সবই ফের নতুন করে শুরু হয়, সেখানে মর্যাদার সন্ধানে আত্মার গুরুত্বপূর্ণ অভিযানটি-ই রূপায়িত হয়েছে। ওই প্রতিপাদ্যটিকে কাজে পরিণত করা, ওই বিশেষ এবং নির্বিশেষের সমাপতন একইভাবে প্রত্যেক মহান স্রষ্টার ছোটখাটো কাজের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। *বিচার* উপন্যাসে নায়কের নাম তো রাখাই যেত সিমি বা ফ্রান্‌ৎস কাফকা। কিন্তু তাঁর নাম রাখা হয়েছে জোজেফ *ক*। সে কাফকা নয়, আবার কাফকাও বটে। একজন গড়পড়তা ইউরোপীয়ান সে। সে আর পাঁচ জনের মতোই। কিন্তু অস্তিত্বে সে *ক*, রক্তমাংসের সমীকরণে সে $X$।

একইভাবে কাফকা অ্যাবসার্ডকে প্রকাশ করতে চান, পারম্পর্যের ব্যবহার করে। আপনি তো সেই পাগলটার কথা জানেনই, যে বাথটাবে মাছ ধরছিল। একজন ডাক্তার, মানসিক ব্যাধি সম্পর্কেও যাঁর যথেষ্ট জ্ঞানগম্যি ছিল, তিনি তাকে জিগ্যেস করেছিলেন, "যদি ওরা কামড়ায়?" অবশ্যই চটজলদি মুখের উপর একটা জবাবও পেয়েছিলেন তিনি, "আরে ধ্যুর, বোকা, এটা তো একটা বাথ টাব"। এ গল্পটা বারোক গোত্রের। কিন্তু

অ্যাবসার্ড প্রভাব যুক্তিকে ছাড়িয়ে যতোদূর পর্যন্ত নিজেকে যুক্ত করতে পারে, এ গল্পটার ভেতরে ততো-টুকুরই মর্মগ্রহণ করা যেতে পারে। কাফকার জগৎ সত্যই বর্ণনাতীত এক জগৎ, যেখানে মানুষ মাছ ধরার মতো কষ্টকর বিলাসিতায় জীবনপাত করে, যদিও জানে যে, সেখান থেকে মিলবে না কিছুই।

যাই হোক, এখানে কোনও একটি অ্যাবসার্ড রচনাকে আমি তার মূল উপাদানগুলোর মধ্যে চিহ্নিত করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, *বিচার*-এর ক্ষেত্রে আমি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে, সেটি সম্পূর্ণত সার্থক। শরীরের জয় হয়েছে সেখানে।

কোনও কিছুরই খামতি নেই এখানে—না অনভিব্যক্ত বিদ্রোহের, না সুবোধ্য ও নিঃশব্দ হতাশার, বা সেই বিস্ময়কর স্বাধীনতার। তাছাড়া, উপন্যাসের চরিত্রগুলি মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত প্রাণভরে শ্বাস নিয়েছে এখানে।

তবু এই পৃথিবীটাকে যত কাছের মনে হয়, আসলে তা নয়। অ-প্রগতির এই পৃথিবীতে কাফকা বিচিত্ররূপী এক আশার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এ দিক থেকে *বিচার* এবং *দুর্গ* একই তাৎপর্যের অভিমুখী ছিল না। তারা একে অন্যের সম্পূরক। একটা থেকে অন্যটায় যে প্রায় দুর্নিরীক্ষ্য অগ্রগতিটিকে চিহ্নিত করা যায়, তা পলায়নপরতার পরম্পরার মধ্যে দারুণ একটা জয়ের প্রতিনিধিত্ব করছে। *বিচার* ঘোষণা করছে এমন একটি সমস্যার কথা, যা *দুর্গ* কিছু মাত্রায় সমাধান করছে। প্রথমটিতে আধা-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে এবং কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নি। দ্বিতীয়টিতে খুবই অল্প পরিমাণে সমস্যাটি ব্যাখ্যাত হয়েছে। *বিচার* ব্যাধিটির নির্ণয় করেছে, *দুর্গ* কল্পনা করেছে সেই ব্যাধির চিকিৎসার কথা। কিন্তু যে নিদানটি এখানে প্রস্তাবিত হয়েছে, সেটি ব্যাধির নিরাময়কারক নয়। তা কেবল ব্যাধিকে সুস্থ জীবনে ফেরৎ পাঠায়, তাকে মেনে নিতে সাহায্য করে। এক দিক থেকে জনতাকে ব্যাধি-উপভোগ করতে শেখায় (কিয়ের্কেগার্দের কথা স্মরণ করুন)। জমির আমিন *ক*-কে যে উদ্বেগটি কাতর করে তুলছে, তার বাইরে আর কোনও উদ্বেগের কথা সে কল্পনাই করতে পারে না। তার চারপাশের লোকজনও ওই শূন্যতা ও অনামা কষ্টের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, যেন এখানে যন্ত্রণাভোগ একটা সুবিধেজনক দিক। "তোমাকে যে কী দরকার আমার। তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর, যতদিন তুমি আমার কাছ-ছাড়া, তখন থেকে কী যে একলাবোধ করি।"—ফ্রিয়েদা বলে *ক*-কে। এই সূক্ষ্ম নিদান যা আমাদের প্রেমে পড়ায়, বিহ্বল করে তোলে এবং আশা জাগিয়ে তোলে প্রসঙ্গহীন এক পৃথিবীতে, এই আকস্মিক "উৎক্রমণ" পালটে দেয় সবকিছু—অস্তিত্ববাদী বিপ্লবের মূল রহস্য এটাই এবং *দুর্গ*-এরও।

রচনারীতির বিবর্তনে কিছু কিছু লেখা *দুর্গ*-এর থেকে অনেক বেশি কঠোর নিয়মতান্ত্রিক। *দুর্গ*-এর আমিনের নাম *ক* এবং সে গ্রামে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু গ্রাম থেকে দুর্গের সঙ্গে যোগাযোগস্থাপন করা দুঃসাধ্য। একশ পৃষ্ঠা ধরে *ক* তার পথের

খোঁজে নিরত রয়েছে, নানা জনকে পক্ষপাত দেখাচ্ছে, ছলচাতুরী প্রয়োগ করছে, কিন্তু রাগ করছে না কখনই। এত ঝামেলার মধ্যেও তার উপরে যে দায়িত্ব পড়েছে, তা পালনের চেষ্টা করে যাচ্ছে নিষ্ঠাভরে। এখানে প্রতিটি অধ্যায়ই এক একটা নতুন হতাশা। আবার একটা নতুন শুরুও বটে। এটা কোনও যুক্তির ব্যাপার না, বরং একটা ধারাবাহিক প্রয়াস। গোঁয়ার্তুমির এই অতিরেক লেখাটির ট্র্যাজিক গুণকে গড়ে তুলেছে। ক যখন দুর্গে ফোন করে তখন সে শুনতে পায় অস্পষ্ট বিভিন্ন কণ্ঠের সম্মিলিত ধ্বনি, অস্পষ্ট হাসির রোল ও দূরাগত আমন্ত্রণ। এগুলোই তাঁর আশার পুষ্টিসাধনের পক্ষে যথেষ্ট, যেমন গ্রীষ্মের আকাশে ফুটে ওঠে কিছু চিহ্ন, অথবা বাঁচার মানে তৈরি করে দেয় আনুমানিক কিছু সন্ধে। বিষণ্ণতার গোপন রহস্যকে খুঁজে পাওয়া যায় এখানেই, যা কাফকার বিশিষ্টতা। বস্তুত, একই জিনিস দেখতে পাওয়া যায় প্রুস্তের লেখায় বা প্লটিনাসের ভূচিত্রে বিলুপ্ত স্বর্গের জন্যে এক ধরনের নস্ট্যালজিয়াকে। ওলগা বলে—"যখন বারনাবাস সকালে আমাকে বলে যে, সে দুর্গের দিকে যাচ্ছে, তখন আমি খুব বিষণ্ণ হয়ে উঠি কারণ, সম্ভবত সেটা নিষ্ফল যাত্রা, সম্ভবত সেটা হবে সারাটা দিনের অপচয়, সম্ভবত অর্থহীন কোনও আশা।"

"সম্ভবত"—শব্দটির প্রয়োগ করে কাফকা তাঁর পুরো লেখাটিতে খেলা করেছেন। কিন্তু কাজের কাজ হয় নি কিছুই শাশ্বতের জন্যে অন্বেষণ এখানে অত্যন্ত নিখুঁত। আমাদের মনকে ব্যস্ত রাখার জিনিসগুলিকে[৭৭] যদি সরিয়ে নেওয়া হয়, আর যদি দৈবের হাতে আমাদের লাঞ্ছিত হতে হয়, তাহলে আমরা কেমন হবো, কাফকার ওই সব উদ্যমী যন্ত্রমানব চরিত্রেরা আমাদের সামনে তার একটি নিখুঁত ছবি তুলে ধরে।

*দুর্গ* উপন্যাসে সকলের কাছে আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা একটা নীতিবোধে পরিণত হয়। ক-এর বিরাট আশা যে, দুর্গ তাকে আপন করে নেবে। একা সফলতা মিলবে না জেনে সে প্রাণপণে চেষ্টা করে নিজের ভিনদেশি তকমাটি মুছে ফেলে গ্রামেরই একজন বাসিন্দা হয়ে দুর্গের আনুকূল্য পেতে। আসলে সে চায় ধরাবাঁধা কোনও পেশা ও একটি বাড়ি এবং সম্পন্ন ও স্বাভাবিক কোনও মানুষের জীবন। নিজের পাগলামো এখন তার কাছে অসহনীয়। একজন বুঝদার ব্যক্তি হতে চায় সে। যে উদ্ভট অভিশাপটির জন্যে লোকের কাছে সে বিদেশি হয়ে উঠেছে, সেটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায় সে। এ দিক থেকে ফ্রিয়েদার কাহিনিটি তাৎপর্যপূর্ণ। যদি সে ওই নারীটিকে রক্ষিতা হিসেবে গ্রহণ করে (যে দুর্গের একজন কর্মচারীর পরিচিত) তার কারণ, মেয়েটির অতীত জীবন। ফ্রিয়েদার কাছে ক এমন কিছু পায় যা, তার উত্তরণ ঘটায়, সঙ্গে সঙ্গে সে এও বুঝে যায় যে, ফ্রিয়েদা চিরতরে দুর্গের পক্ষে অযোগ্য হয়ে উঠেছে। এই ঘটনায় অনেকেরই রেজিনা ওলসেনের সঙ্গে কিয়ের্কগার্দের বিচিত্র প্রণয়কাহিনিটির কথা মনে পড়বে। কিছু মানুষের ক্ষেত্রে, শাশ্বতের যে আগুন তাদের দগ্ধ করছে, তা এতই লেলিহান যে,

তাদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের হৃদয় দগ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট। যা ঈশ্বরের নয়, তা ঈশ্বরকে দান করার সর্বনাশা ভুলটি *দুর্গ*-এর এই কাহিনিটির-ই মতো। কিন্তু কাফকা তাকে ভুল বলে মনে করেন না। এটা একটা তত্ত্ব এবং "উৎক্রমণ"। এমন কিছু নেই, যা ঈশ্বরের নয়।

এর থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো বারনাবাস-ভগ্নীদের কাছে চলে যাওয়ার জন্যে জমির আমিনটির ফ্রিয়েদার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটানো। কারণ, গ্রামের বারনাবাস পরিবারটি-ই একমাত্র চরমভাবে দুর্গটি থেকে বিচ্ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন গ্রামটির মধ্যেও। বড় বোন আমালিয়া দুর্গের জনৈক কর্মচারীর অপমানজনক একটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। এর ফলে যে অনৈতিক অভিশাপটি তার উপরে নেমে এসেছিল, তা চিরদিনের জন্যে ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে তাকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। ঈশ্বরের জন্যে আত্মসম্মান জলাঞ্জলি না দিতে পারার জন্যেই মানুষ ঈশ্বরের করুণা হতে বঞ্চিত হয়। এখানে অস্তিত্ববাদী দর্শনের একটি সুপরিচিত থিম আপনার চোখে পড়বে "সত্য নৈতিকতার বিরোধী।" মনে হচ্ছে, সব কিছুই ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। কারণ, কাফকার নায়কের অবলম্বিত যে পথটি ফ্রিয়েদাকে ছেড়ে বারনাবাস-ভগ্নীদের অভিমুখী, সেটি-ই সেই পথ যেটি বিশ্বস্ত প্রেম থেকে অ্যাবসার্ডের দেবতায়নের দিকে অভিযাত্রী। এখানে কাফকার ভাবনা ফের কিয়ের্কেগার্দের সমান্তরাল। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, "বারনাবাসের উপাখ্যান" বইয়ের শেষে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যা ঈশ্বরকে নাকচ করে, তার মাধ্যমেই ঈশ্বরকে দখলে আনার ও চেনার শেষ চেষ্টা করে জমির আমিনটি। এখানে সে আমাদের মতো মঙ্গল ও সৌন্দর্যের শ্রেণিভুক্ত করে ঈশ্বরকে দেখে না। নিজের নিরাসক্তি, অবিচার ও বিদ্বেষহীনতা এবং ঘৃণার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তাঁকে। যে বিদেশিটি দুর্গে আশ্রয় নেওয়ার জন্যে আবেদন করে, সে তার অভিযানের অন্তিম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যা খানিকটা নির্বাসন-গ্রহণের মতো। নিজের প্রতি এখন সে অবিশ্বস্ত। কারণ, দুর্গের ভেতরে ঢোকার জন্যে শুধুমাত্র উন্মত্ত আশার ওপর ভর করে দৈবী কৃপার এই মরুতে সে নৈতিকতা, যুক্তি এবং বৌদ্ধিক সত্যগুলিকে পরিত্যাগ করেছে।

এখানে প্রযুক্ত "আশা" শব্দটি হাস্যকর নয়। বরং, কাফকার বর্ণনায় ছবিটি যত ট্র্যাজিক হয়েছে, আশাগুলোও ততই দৃঢ় ও আগ্রাসী হয়েছে। *বিচার* উপন্যাসটি যত বেশি খাঁটি অ্যাবসার্ড, *দুর্গ* উপন্যাসের "উৎক্রমণ"টি যেন ততই মর্মস্পর্শী, অবৈধ এবং নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু এখানেও আমরা ফের অস্তিত্ববাদী ভাবনার কূটাভাসটিকে দেখতে পাই, যেভাবে তা প্রকাশিত হয়েছে কিয়ের্কেগার্দের লেখায়। যেমন পার্থিব আশাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে, তাহলেই যথার্থ আশার[৫৮] মাধ্যমে রক্ষা পাবে কেউ।

কথাটিকে এভাবে পালটে নেওয়া যায় : *দুর্গ*-এর দায়িত্ব নিতে হলে কাউকে লিখতেই হবে *বিচার*। কাফকার আলোচকরা অধিকাংশই তাঁর রচনায় অনুভব করেছেন একটা মরীয়া চিৎকার, মানুষের যেখানে যৎসামান্য আশ্রয়টুকুও নেই। কিন্তু এ অভিমতটি পুনর্বিবেচনাযোগ্য। আশা আর আশা। আমার কাছে আঁরি বোরদো'র[৫৯] আশাবাদী রচনাকে অদ্ভুতভাবে নৈরাশ্যজনক মনে হয়। কারণ, সেখানে পক্ষপাত দেখানোর কোনও জায়গা নেই। উল্টোদিকে মালরোর চিন্তা সব সময়ই সংহত। কিন্তু এ দুটি ক্ষেত্রেই শুধু আশা কিংবা হতাশাটাই বিষয় নয়। আমি নিঃসন্দিগ্ধভাবেই লক্ষ্য করি যে, অ্যাবসার্ড রচনা স্বয়ং নাস্তিকতার অভিমুখী হতে পারে, যা আমি এড়িয়ে যেতে চাই। যে লেখা একটি বন্ধ্যা অবস্থার, তাৎক্ষণিকের একটা সহজ মহিমায়ন ছাড়া কিছুই নয়, এখানে তা ইলিউশনের একটা দোলনা হয়ে ওঠে; তা ব্যাখ্যা করে, আশাকে একটা রূপ দান করে। লেখক সেখান থেকে নিজেকে কোনোমতেই আলাদা করে নিতে পারে না। এটা ট্র্যাজিক খেলা নয়, যদিও হতে চেয়েছিল তা-ই। লেখকের জীবনকে তা একটা অর্থবহতা প্রদান করে।

যাই হোক, এটা খুবই আশ্চর্যের যে, একই ধরনের অনুপ্রেরণার অধিকারী যেমন, কাফকা, কিয়ের্কেগার্দ বা চেস্তভ, সংক্ষেপে বললে, অস্তিত্ববাদী এই ঔপন্যাসিক ও দার্শনিকেরা, যাঁরা সবাই অ্যাবসার্ড এবং তার পরিণতির অভিমুখী হয়েছেন, শেষ পর্যন্ত একটি অমেয় আশার গর্জনে সামিল হবেন।

তাঁরা ঈশ্বরকে আলিঙ্গন করেন, যে ঈশ্বর তাঁদেরকেই করেন গ্রাস। বিনয়ের মাধ্যমেই আশা আগমন ঘটায় তার। কারণ, অস্তিত্বের এই অ্যাবসার্ড কিছু পরিমাণে অতিপ্রাকৃতিক বাস্তবতাকে হাজির করে। জীবনের গতিপথটা যদি ঈশ্বরাভিমুখী হয়, তাহলে মোটের উপর একটা ফল ফলবে। আর যে অধ্যবসায় ও জেদ নিয়ে কিয়ের্কেগার্দ, চেস্তভ এবং কাফকার নায়কেরা বার বার নিজেদের যাত্রাপথে সামিল হয়েছেন, অবশ্যম্ভাবিতার শক্তিকে উদ্দীপ্ত করার ক্ষেত্রে তা হয়ে উঠবে এক বিশেষ ভরসাস্থল।[৬০]

কাফকা তাঁর ঈশ্বরকে নৈতিক মহত্ত্ব, সাক্ষ্যপ্রমাণ, করুণা বা সামঞ্জস্য অর্পণ করতে অস্বীকার করেছেন, এর চেয়ে বরং ঈশ্বরের বাহুবন্ধনে নিজেকে সঁপে দেওয়াকেই মনে করেছেন ভালো। অ্যাবসার্ড স্বীকৃতি পেয়েছে, গৃহীত হয়েছে এবং মানুষ সেখানে নিজের স্বত্বটি ছেড়ে দিয়েছে, এবং তখন থেকেই আমরা জানি, তা আর অ্যাবসার্ড নেইও। মানুষের নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আশার থেকে বড় আশা আর কী-ই বা থাকতে পারে, যে আশা ওই গণ্ডি থেকে তাকে মুক্তি দিতে রাজি হয়। আমি আবারও লক্ষ্য করি যে, অস্তিত্ববাদী ভাবনাকে অমেয় আশার মধ্যে চোবানো রয়েছে, যদিও এটা আমার বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী। এ হলো সেই আশা, যা খ্রিস্টধর্মের আদি যুগে এবং সুসমাচারের প্রসারপর্বে প্রাচীন যুগের পৃথিবীটাকে সবার সামনে তুলে ধরেছিল। কিন্তু সব ধরনের

অস্তিত্ববাদী ভাবনাকে যা বিশিষ্টতা দান করে, সেই উৎক্রমণের মধ্যে, সেই অনমনীয়তার মধ্যে, অনাবরিত দিব্যতার জরিপের মধ্যে কীভাবে কোনও একজনের চোখ এড়িয়ে যাবে সুবোধ্যতার অভিজ্ঞানটি, যা নিজের দাবিকেই দেবে বিসর্জন? আমরা শুধু এটুকুই জানতে চাই যে, আত্মরক্ষার্থে গর্বই আনুষ্ঠানিকভাব তার দাবিটি ছেড়ে দেয় না তো! এ ধরনের উৎসর্জনগুলো বহুপ্রসূ হবে। কিন্তু তাতে পরিবর্তন ঘটবে না কিছুরই। সমস্ত অহঙ্কারগুলির মতো বন্ধ্যা অভিধায় নির্মলতার নৈতিক মূল্য আমার চোখে কখনই লুপ্ত হতে পারে না। কেননা, সংজ্ঞার্থের দিক থেকে সত্যও বন্ধ্যা। অন্য প্রমাণগুলোও তাই। যে পৃথিবীতে সবই স্বতঃলব্ধ এবং কিছুই ব্যাখ্যাত নয়, সেখানে কোনও মূল্যবোধ বা অধিবিদ্যার বহুপ্রসূতা অর্থশূন্য একটি তত্ত্ব মাত্র।

যাই হোক, কোন্ ভাবধারার মধ্যে কাফকার গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল, তা এখানে আমরা লক্ষ্য করি। *দুর্গ* থেকে *বিচার* পর্যন্ত তাঁর কঠোর অগ্রগতির মূল্যায়ন করা সত্যিকারেরই বুদ্ধির পরিচায়ক হবে। জোজেফ ক (*Joseph K*) এবং জমির আমিন ক (*l'arpenteur K*) নিশ্চয়ই দুটি বিপরীত মেরু, যা কাফকাকে আকর্ষণ করে।[৬১] আমিও তাঁর সঙ্গেই গলা মেলাব এবং বলব যে, তাঁর রচনা সম্ভবত অ্যাবসার্ড নয়। কিন্তু এর জন্যে তাঁর রচনার মহত্ত্ব বা সর্বজনীনতাকে উপলব্ধি করতে আমাদের কোনও বিঘ্ন ঘটবে না। আশা থেকে যন্ত্রণা এবং চূড়ান্ত প্রজ্ঞা থেকে উদ্দেশ্যমূলক অন্ধতার অভিমুখে প্রত্যহের যে যাত্রা-পথটিকে তিনি অত্যন্ত পরিপাটিভাবে উপস্থাপন করতে পারেন, সেটিই এদের সকলের উৎস। তাঁর রচনা ততদূর পর্যন্তই সর্বজনীন (সত্যিকারের অ্যাবসার্ড লেখা সর্বজনীন হয় না), যতদূর পর্যন্ত তা আবেগতাড়িত কোনও মানুষের মুখচ্ছবিটিকে প্রকাশ করে। সে মানুষ মানবতা থেকে পলায়নপর, নিজের স্ববিরোধিতা থেকে বিশ্বাসের ও অগণন হতাশা থেকে আশার যুক্তিগুলো খুঁজে বার করে আর জীবনকে অভিহিত করে মৃত্যুর এক ভয়াবহ শিক্ষানবিশি-পর্ব রূপে। এটি সর্বজনীন। কারণ, এর প্রেরণার উৎসটি ধর্মীয়। যেহেতু সব ধর্মেই মানুষ তার নিজের জীবনের ভার থেকে মুক্ত। কিন্তু সেটা আমি জানি তখনই, যখন, এমনকি তার প্রশংসাও করতে পারি। আমি এও জানি যে, যা সর্বজনীন, তাকে আমি খুঁজছি না, খুঁজছি সত্যকে। এ দুটির সমাপতন নাও ঘটতে পারে।

এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিটিকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যাবে, যদি বলি যে, সত্যিকারের আশাহীন ভাবনা নিখুঁতভাবে সংজ্ঞায়িত হয় বিরোধী মূল্যমান দ্বারা এবং কোনও ট্র্যাজিক রচনা ট্র্যাজিক হয়ে উঠতে পারে, ভবিষ্যতের সব আশা নির্বাসিত হওয়ার পরে, একজন সুখী মানুষের জীবনকে বর্ণনা করে। একটা জীবন যত বেশি আকর্ষণীয় হবে, ততই তা হারিয়ে ফেলবে অ্যাবসার্ড ভাবনাকে। সম্ভবত, এটাই নীৎশের লেখায় অনুভূত ওই চমৎকার শুষ্কতার গোপন রহস্য। এ ক্ষেত্রে নীৎশেকেই একমাত্র শিল্পী বলে মনে হয়,

যিনি অ্যাবসার্ড নন্দনতত্ত্বের চূড়ান্ত পরিণামগুলিকে ততটাই আহরণ করেছেন, যতখানি তাঁর শেষ বাণী নিহিত রয়েছে উষর এবং বিজয়ী সহজবোধ্যতায় এবং সবধরনের অতিপ্রাকৃতিক সান্ত্বনার প্রবল প্রত্যাখ্যানের মধ্যে।

এই প্রবন্ধের চৌহদ্দিতে কাফকার মূল গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি অবশ্যই যথেষ্ট। যে মানবীয় ভাবনাটিকে এতদূর পর্যন্ত আমরা বয়ে এনেছিলুম বন্দি থেকেছি তার মধ্যেই। "গুরুত্বপূর্ণ" শব্দটিকে সর্বাঙ্গীন অর্থেই ওই লেখার সমস্ত প্রসঙ্গে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সাধারণভাবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা অ্যাবসার্ড সমস্যাটিকে জড়িয়ে নেয়। আমাদের প্রারম্ভিক বক্তব্যের সঙ্গে কেউ যদি এই সিদ্ধান্তগুলিকে, বিষয়ের সঙ্গে আঙ্গিককে, *দুর্গ*-এর গুপ্ত অর্থের সঙ্গে ওই প্রাকৃতিক কলাকে (যা প্রকৃতির মধ্যেই বইছে), ক-এর আবেগী, গর্বিত অন্বেষণের সঙ্গে প্রাত্যহিক ঘটনাবলিকে মিলিয়ে নিতে চায়, তাহলে সে উপলব্ধি করবে যে, মহত্ত্ব জিনিসটা ঠিক কী হতে পারে। কারণ, নস্ট্যালজিয়া যদি মানুষের অভিজ্ঞান হয়, তাহলে ধরতে হবে যে, কেউ হয়ত অনুতাপের এই অপচ্ছায়াগুলিকে এরকম মাংসলতা ও দাক্ষিণ্যে ভরিয়ে তোলে নি। কিন্তু একই সঙ্গে এও অনুভূত হবে যে, অ্যাবসার্ড রচনা যে ধরনের ব্যতিক্রমী মহত্ত্ব দাবি করে, তা হয়ত এখানে পাওয়া যাবে না। যদি শিল্পের প্রকৃতি হয়, বিশেষের সঙ্গে নির্বিশেষের ঐক্যসাধন, এক ফোঁটা জলের উপরে আলোর ঝিকিমিকিতে বায়বীয় শাশ্বতের উপস্থাপনা, তাহলে, অ্যাবসার্ড লেখকের মহত্ত্বকে নির্ণয় করার আরও সত্যতর পদ্ধতি হচ্ছে এই দুই জগতের মাঝখানে তার দূরত্ব রচনার ক্ষমতাকে অনুধাবন করা। বিপুল অসমতার মধ্যে এ দুয়ের যথার্থ মিলনবিন্দুটির নির্ণয়ের পারঙ্গমতার উপরেই তার ক্ষমতা নির্ভরশীল।

আর সত্যি বলতে কি, মানুষ এবং মনুষ্যেতরের মধ্যে বিরাজমান এই জ্যামিতিক ক্ষেত্রটিকে শুদ্ধচিত্ত সর্বত্র দেখতে জানে। ফাউস্ট আর দন কিহেতো যদি আর্টের উজ্জ্বল ফসল হয়ে থাকে, তাহলে তাদের এই অপার মহনীয়তাগুলিই তার কারণ। তাদের এই জাগতিক হাতদুটিই আমাদের সামনে তা তুলে ধরে। তবুও সব সময়ই সেই মুহূর্তটি আসে, যখন মানুষের মন সত্যগুলিকে বাতিল করে দেয়, দু'হাতে যাদের সে স্পর্শ করতে পারত। একটা সময়ে সৃষ্টিকে আর ট্র্যাজিক হিসেবে নেওয়া হয় না নেওয়া হয় কেবলই রাশভারী হিসেবে। এর পরে মানুষ আশা'র দখল নেয়, যদিও সেটা তার কাজ নয়। তার কাজ হচ্ছে ফন্দি-ফিকিরগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এই প্রবল বিচারপ্রক্রিয়ার উপান্তে আমার চোখে শুধু সেটুকুই পড়ছে, কাফকা সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে যাকে স্থাপন করেছেন, শেষ পর্যন্ত যে অবিশ্বসণীয় রায়টিকে ঘোষণা করেছেন এই পৃথিবীটা ঘৃণ্য ও উৎকেন্দ্রিক, এখানে ছুঁচোরাও আশা করতে ভয় পায়।[৬২]

————

# টীকা-নির্দেশিকা

## টীকা-নির্দেশিকা

(স্থূলাক্ষর টীকাগুলো মূল ফরাসি গ্রন্থভুক্ত। বাকিগুলো এই অনুবাদকের করা।)

১. ফ্রেডরিক উইলহেম নীৎশে বহুমুখী প্রতিভাধর এক জার্মান ব্যক্তিত্ব। দর্শন ছাড়াও ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সঙ্গীত মানববিদ্যার বিভিন্ন শাখার চর্চায় তিনি অসামান্য মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। জন্মেছিলেন ১৮৪৪-এ, মারা গিয়েছিলেন ১৯০০-য়। অস্তিত্ববাদী দর্শন ছাড়াও টোমাস মানের উপরে তাঁর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

২. **সত্যের আপেক্ষিক মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং অন্যদিকে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে এই পণ্ডিতের ঠুনকো আচরণ আমাদের যথেষ্ট হাস্যোদ্রেক করে।**

৩. জাক দ্য লা পালিস (জন্ম ১৪৭০, মৃত্যু ১৫২৫) একজন ফরাসি অভিজাত ব্যক্তি ও সামরিক অফিসার ছিলেন। ফ্রান্সিসের অধীনে একজন মার্শাল হিসেবে তিনি ইতালীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন এবং পাভিয়ার যুদ্ধে নিহিত হয়েছিলেন।

৪. *দন কিহেতো* মিগুয়েল দ্য সেরভান্তেসের একখানি বিখ্যাত উপন্যাস। দন কিহেতো ওই উপন্যাসের নায়কও বটে। স্পেনের *লা মাঞ্চা*'র এই মধ্যবয়সি মধ্যবিত্ত ব্যক্তিটি সারা বিশ্বের সাধারণ পাঠকদের কাছেই অত্যন্ত আদৃত।

৫. **এ প্রবন্ধের আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগটিকে যেন আমরা না ভেস্তে দিই। বস্তুত, আত্মহত্যা ঢের বেশি সম্মানীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। যেমন, চীনের বিপ্লবের সময় প্রতিবাদী রাজনৈতিক আত্মহত্যা ঘটেছিল।**

৬. **আমি যুদ্ধোত্তর পর্বের একজন লেখকের কথা শুনেছিলুম, যিনি তাঁর প্রথম বইটি লেখা শেষ করে আত্মহত্যা করেছিলেন ওই বইটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে। বস্তুত তা হয়েওছিল, কিন্তু বইটিকে কেউ ভালো বলেন নি।**

৭. জ্যুল ল্যকুইয়ে একজন ফরাসি দার্শনিক। সম্ভবত সমুদ্রের জলে আত্মহত্যা করেন। জন্মেছিলেন ব্রতাইন-এ ১৮১৪-য়, মৃত্যু হয়েছিল ১৮৬২তে।

৮. কার্ল থেয়োডর জাস্‌পার্স একজন জার্মান-সুইস মনোবৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। জন্ম

১৮৮৩, মৃত্যু ১৯৬৯। অনেকেই তাঁকে জার্মান অস্তিত্ববাদের প্রবক্তা মানলেও তিনি নিজে ওই অভিধা নিতে চান নি। তবে, আধুনিক দর্শন ও মনস্তত্ত্বে তাঁর অবদান অপরিসীম।

৯. **আক্ষরিক অর্থে নয়। এটা কোনও সংজ্ঞা নয়। বরং, অনুভূতির সংখ্যায়ন, যা অ্যাবসার্ডকে মেনে নিতে পারে। যদিও সংখ্যায়ন শেষ হওয়ার পরেও অ্যাবসার্ড নিঃশেষিত হয়ে যায় নি।**

১০. সোরেন কিয়ের্কেগার্দ আধুনিক দর্শনের একটি সর্বজনবিদিত নাম। তাঁকে অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রথম প্রবক্তা বলা হয়। জন্ম ১৮১৩-য় কোপেনহাগেনে। মৃত্যু ১৮৫৫-য়। তিনি একজন কবিও ছিলেন।

১১. লিও আইজাকোভিচ চেস্তভ বিখ্যাত রুশ অস্তিত্ববাদী দার্শনিক। জন্ম ১৮৬৬, মৃত্যু ১৯৩৮।

১২. জার্মান দার্শনিক ম্যাক্স স্কেলার। জন্ম ১৮৭৪, মৃত্যু ১৯২৮। ফেনেমেনোলজি, এথিক্স্ এবং দার্শনিক নৃতত্ত্ব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে তাঁর।

১৩. মার্টিন হাইডেগার বিশ শতকের যুগান্তকারী দার্শনিক। ফেনোমেনোলজি, অস্তিত্ববাদ, হেরমেনিউটিকস্ ইত্যাদি দর্শনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর মৌলিক অবদান গগনচুম্বী। জন্ম ১৮৮৯, মৃত্যু ১৯৭৬।

১৪. আরিয়ান হলেন ইজিপ্টের ভিক্ষু আরিয়ুস-এর শিষ্য, আলেকজান্দ্রিয়ার প্রোটেস্টান চার্চের বর্ষীয়ান যাজক। ইনি ট্রিনিটিকে অমান্য করলেও খ্রিস্টের পূর্ব-অস্তিত্ব অমান্য করেন নি।

১৫. এডমণ্ড গুস্তাভ আলব্রেশট হুসের্ল সর্বজনপরিচিত জার্মান দার্শনিক ও বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপক। জন্ম ১৮৫৯, মৃত্যু ১৯৩৭। অবভাসবিদ্যার ধারাটির প্রতিষ্ঠাতা।

১৬. **বিশেষভাবে ব্যতিক্রমের ধারণার সঙ্গে মানানসই, বস্তুত, যা অ্যারিস্টটলের ভাবনার বিরোধী।**

১৭. Proposition-এর বাংলা পরিভাষা 'বচন' হলেও আভিধানিক অর্থ 'বিচারবাক্য'টিকেই এখানে অধিকতর সুপ্রযুক্ত বলে মনে করি। যে বাক্য সত্য বা মিথ্যা বলে গণ্য হতে পারে তাকে 'বচন' বা 'বিচারবাক্য' বলে।

১৮. ইগ্নাটিয়াস অব্ লোয়ালা স্প্যানিশ বাস্ক-যাজক ও থিয়োলজিয়ান। জন্ম ১৪৯১; মৃত্যু ১৫৫১। সোসাইটি অব জেসুইটের প্রতিষ্ঠাতা। ধ্যান, প্রার্থনা ও কিছু মানসিক ক্রিয়ার কতিপয় সহজ পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন তিনি।

১৯. ফার্দিনান্দ গালিয়ানি আঠেরো শতকের বিখ্যাত ইতালিয়ান অর্থনীতিবিদ ও এনলাইটেনমেন্টের প্রতিভূ। নীৎশে তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন।

২০. লুইজ দেপিনে বা মাদাম দেপিনে আঠেরো শতকের এনলাইটেনমেন্ট যুগের সেরা নারী প্রতিনিধি। সে যুগের আভাঁগার্দ প্রায় সকলের সঙ্গেই তাঁর যোগাযোগ ছিল। রুসো, দিদেরো'র কথা তো বলতেই হবে। রুসোর 'কঁফেসিওঁ'তে, সিমোন দ্য বোভোয়ারের 'ল্য দ্যুজিয়েম সেক্স' গ্রন্থে তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছে।

২১. আমি বলিনি "ঈশ্বরকে বাদ দেয়", তা বললেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হতো।

২২. আমাকে আবারও জোর দিয়ে বলার সুযোগ দিন—ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে এখানে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে না। প্রশ্ন তোলা হচ্ছে সেই যুক্তি নিয়ে, যা তাকে অস্তিত্বের দাবির দিকে নিয়ে যায়।

২৩. এমনকি, সবচেয়ে কঠোর জ্ঞানতাত্ত্বিকরাও অধিবিদ্যার সম্ভাবনা নির্দেশ করেন। আর তা এত পরিমাণে যে, একালের বহু চিন্তাবিদের অধিবিদ্যাই জ্ঞানতত্ত্ব দিয়ে ঠাসা ছাড়া কিছু না।

২৪. পারমেনিডেজ (Parmenides) হলেন সক্রেটিস পূর্ববর্তী যুগের একজন গ্রিক দার্শনিক। অধিবিদ্যা ও জ্ঞানতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁকে মান্য করা হয়ে থাকে।

২৫. প্লেটোর ভাব-ধারার বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক। তাঁর দর্শনের প্রধান সূত্র তিনটি—একত্ব, বুদ্ধি এবং আত্মা।

২৬. ক—সে সময় যুক্তিকে হয় মানিয়ে নিতে হতো, নয়ত ধ্বংস হতে হতো। তাই তা নিজেকে মানিয়েই নিত। প্লটিনাসের ক্ষেত্রে, যুক্তিপূর্ণ হওয়ার পরে তা নান্দনিক হয়ে ওঠে। উপমা সিলোগিজমের জায়গাটি নিয়ে নেয়।
খ—তাছাড়া অবভাসবিদ্যায় (phenemenology) এটা প্লটিনাসের একমাত্র অবদান নয়। এই পুরো ভঙ্গিটাই ইতিমধ্যেই সেই অ্যালেকজান্দ্রিয়ান চিন্তাবিদের অতি প্রিয় ভাবনার মধ্যে এমনভাবে নিহিত, যে তার কাছে শুধু মানুষের ধারণাই নয়, বরং সক্রেতিসের ধারণাও রয়েছে।

২৭. ইউরিডাইস (Eurydice) গ্রিক পুরানের চরিত্র। অ্যাপেলোর কন্যা এবং অর্ফিয়ুসের স্ত্রী।

২৮. র‍্যানে দেকার্তের (Descartes) লাতিন *cogito ergo sum* (আমি চিন্তা করি বলেই আমি আছি) যা ইংরেজিতে 'I think, therefore, I am' রূপে অনূদিত হয়েছে। তবে প্রথমে দেকার্তে এটি লিখেছিলেন ফরাসিতেই, লিখেছিলেন, *Je pense donc Je suis*।

২৯. এখানে আমি একটি বস্তুগত তুলনা নিয়ে চিন্তিত, বিনয়ী আবেদন নিয়ে নয়। অ্যাবসার্ড মানুষ সে-ই, যে নির্দ্বন্দ্ব মানুষ থেকে ভিন্ন।

৩০. পরিমাণ কখনও কখনও গুণেরও নির্ণায়ক। যদি আমি বৈজ্ঞানিক সূত্রের সর্বাধুনিক পুনর্বিবৃতিতে বিশ্বাস করি, তবে সমস্ত পদার্থই শক্তির কেন্দ্রসমূহের দ্বারা গঠিত। তাদের বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর পরিমাণ তার বিশেষত্বকে কম-বেশি চিহ্নিত করে। এক কোটি আয়ন (ions) এবং একটি আয়ন (ion) শুধু পরিমাণগত ভাবে পৃথক নয়, তারা গুণগত ভাবেও পৃথক। মানুষের অভিজ্ঞতার ভেতরেও এই সাদৃশ্যটি সহজলভ্য।

৩১. একই ভাবনা শূন্যতার তত্ত্বের মতোই অন্য কোনও তত্ত্বের ক্ষেত্রেও ভিন্ন। বাস্তবতা থেকে কোনও কিছুকে সে বাদও দেয় না, তার সঙ্গে জোড়েও না। শূন্যতার মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতায়, দু হাজার বছরের মধ্যে কী ঘটবে, তার বিবেচনায় আমাদের নিজস্ব শূন্যতা প্রকৃতপক্ষেই একটা দিগ্‌দর্শক হয়ে ওঠে। এক দিক থেকে শূন্যতা ভবিষ্যতের অনেকগুলি যুগের সমবায়ে নির্দিষ্টভাবে গড়ে উঠবে, যা আমাদের নয়।

৩২. ইচ্ছা এখানে একমাত্র প্রতিনিধি। চৈতন্যকে বজায় রাখার দিকেই তার ঝোঁক। তা তাকে জীবনের নিয়মানুবর্তিতা দান করে আর সেটা প্রশংসনীয়।

৩৩. বুঝতে পারাটাই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বকে মেনে নিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু এখানে। কিন্তু প্রাচ্য চিন্তা আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, বিশ্বের বিরুদ্ধে বেছে নেওয়া কোনও যুক্তিকে প্রয়োগ করেও ব্যক্তি নিজেকে উন্নীত করতে পারে। এটাও একইরকমভাবে গ্রাহ্য এবং তা এ প্রবন্ধটিকে তার উপযুক্ত মাত্রা ও সীমাবদ্ধতা দান করে। কিন্তু, যখন পৃথিবীতে কঠোরভাবে নঞর্থকতার চর্চা হয়, অনেকে প্রায়শ একইরকম ফল লাভ করে (কিছু বেদান্তী গোষ্ঠীতে)। যেমন, বলা যায় কর্মের উদাসীনতা নিয়ে একই রকম ফলাফল লাভ ঘটে। জাঁ গ্রেনিয়েরের তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই *ল্য শোয়া*-য় একইভাবে 'নিরাসক্তির দর্শন'কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

৩৪. একজন ফরাসি দার্শনিক ও সাংবাদিক। মূল নাম এমিল ওগ্যুস্ত শার্তিয়ে। তবে আল্যাঁ নামেই পরিচিত। জন্ম ১৮৬১, মৃত্যু ১৯৫১।

৩৫. এটি দস্তেয়ভস্কির বিখ্যাত একখানি উপন্যাসের নাম। যার বাংলা করলে হবে, *ভূতাবিষ্টেরা* বা *আবিষ্টেরা*।

৩৬. মাদাম রলাঁ ছিলেন জাঁ মারি রলাঁ'র স্ত্রী। তিনি ফরাসি বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন। গিলোটিনে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল।

৩৭. অস্কার মিলোজ হলেন ফরাসি-লিথুয়িনিয়ান কবি, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক। জন্ম ১৮৭৭, মৃত্যু ১৯৩৯। স্পেনের মিগুয়েল মানারাকে (ডন জুয়ান নামেও পরিচিত ছিলেন) নিয়ে মিলোজ *মিগুয়েল মানারা : মিস্তের আঁ সিজ তাবলো* নামে একখানি

নাটক লিখেছিলেন। এখানে সেই মানারার কথাই বলা হচ্ছে।

৩৮. **যাবতীয় দোষক্রটিগুলি নিয়েই পূর্ণ অর্থেই যে প্রলোভক। যেকোনও সুস্থ-স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু ক্রটিও থাকে।**

৩৯. শেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের বিখ্যাত চরিত্র ইয়াগো, 'কিং লীয়র' নাটকের চরিত্র গ্লোচেস্টার। আলসেস্ত, মলিয়েরের 'ল্য মিজান্ত্রপ' নাটকের একটি চরিত্র। *ফেদর* ফরাসি নাট্যকার রাসিনের একখানি বিখ্যাত ট্র্যাজেডি। আলেকজান্দ্রিয়ান ছন্দের এই পঞ্চাঙ্ক নাটকটি ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল।

৪০. গিয়াসিনি রোসিনি'র দুই অঙ্কের অপেরা নাটকের মূল চরিত্র সিগিস্মোঁদ বা সিগিস্মুণ্ড, পোল্যান্ডের রাজা।

৪১. সতেরো ও আঠেরো শতকের বারোক মিউজিকের একটি নৃত্যরীতি সারাবন্দ।

৪২. **এখানে আমি মলিয়েরের আলসেস্ত-এর কথা ভাবছি। সবই কত সরল, কত স্বাভাবিক এবং কত কর্কশ। ফিলিঁত (Philinte)-এর বিরুদ্ধে আলসেস্ত, এলিয়ঁত (Elianthe) -এর বিরুদ্ধে সেলিমেন (Célimène)— কোনও একটি চরিত্রের অ্যাবসার্ড পরম্পরার সমস্ত প্রসঙ্গগুলোই তার পরিণামের দিকে ধাবিত হয়েছে এবং এর পদ্যটি 'কাঁচা পদ্যটি' চরিত্রের একঘেয়েমির সঙ্গে তাল-মেল রাখতে পারে নি।**

৪৩. আদ্রিয়েন লেকুভ্রোর সতেরো শতকের ফ্রান্সের সেরা অভিনেত্রী। স্বাভাবিক অভিনয়ের পাশাপাশি কিছু পরীক্ষানিরীক্ষাও তিনি করেছিলেন। তবুও জনপ্রিয়তা ছিল তাঁর অপরিসীম। মোরিস দ্য সাক্সের সঙ্গে তাঁর রোম্যান্স ও রহস্যময় মৃত্যুও সেকালে খুবই আলোড়ন ফেলেছিল। ক্যাথলিক চার্চ তাঁর মৃতদেহকে সমাধিস্থ করতে রাজি হয় নি। ঘটনাটা তাঁর বন্ধু ভলতেরকে এতটাই বিচলিত করেছিল যে, তাঁকে নিয়ে ভলতের একটি কবিতা লিখে ফেলেছিলেন।

৪৪. *উইলহেম মেস্তর* গ্যোয়টের দ্বিতীয় উপন্যাস। প্রকাশকাল ১৭৯৫-৯৬। উপন্যাসের নায়ক উইলহেম মেস্তর। ব্যক্তিজীবনের অর্থহীনতা থেকে তার মুক্তির আকাংক্ষাই উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে। কেননা, সে বিশ্বাস করে যে, মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ীর জীবনটা শূন্যগর্ভ। তাই, সেই জীবন থেকে মুক্তি চায়। উপন্যাসটির এটি-ই থিম।

৪৫. **এটা বেশ কৌতূহলজনক ব্যাপার যে, সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত ধরনের পেইন্টিং, যা বাস্তবতার রূপকে তার প্রাথমিক উপাদানগুলির মধ্যে সংহত করার চেষ্টা করে, সেটি শেষ পর্যন্ত নয়নমনোহর ছাড়া আর কিছুই নয়। জগতের রঙটিকেই ধরে রাখে সে (বিশেষভাবে লেজেরের মধ্যে তা প্রত্যক্ষ করা যায়)।**

৪৬. **এ নিয়ে আপনি যদি একটু ভাবেন : এটা নিকৃষ্ট উপন্যাসগুলির কারণ ব্যাখ্যা করে। প্রায় সকলেই মনে করে যে, সে চিন্তা করতে সক্ষম এবং ঠিক-ভুল**

যাই হোক, কিছু মাত্রায় চিন্তা করেও তো বটে। পক্ষান্তরে, খুব কম জনই নিজেদের কবি বা শব্দ-শিল্পী বলে ভাবতে সাহস করে। কিন্তু, যে মুহূর্তে চিন্তা স্টাইলকে ছাপিয়ে যায়, জনতা উপন্যাসে দাপিয়ে অনুপ্রবেশ করে। আমরা যতটা বলে থাকি, এটা ঠিক ততটা দোষণীয় নয়। যারা শ্রেষ্ঠ, তারা নিজেদের কাছে অনেক বেশি দাবি রাখতে বাধ্য। আর যারা হাল ছেড়ে দিয়েছে, তাদের টিকে থাকবার যোগ্যতা নেই।

৪৭. আপীল বলতে ঈশ্বর বা নৈতিক আদর্শের কাছ আত্মসমর্পণের কথাই সম্ভবত এখানে বলা হয়েছে।

৪৮. যেমন, মালরো'র লেখা। কিন্তু একই সঙ্গে সামাজিক প্রসঙ্গগুলির পর্যালোচনারও প্রয়োজন ছিল, যেগুলিকে কোনওভাবেই অ্যাবসার্ড ভাবনা দিয়ে অগ্রাহ্য করা যায় না (যদিও ওই ভাবনা কিছু সমস্যার ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সমাধান নির্দেশ করতে পারে)। যাই হোক, সকলেরই একটা গণ্ডির মধ্যে থাকা প্রয়োজন।

৪৯. "স্তাভ্রোজিন 'পৃথিবীর বাইরের কোনও জগতে অনন্ত জীবনের কথায় কি তুমি বিশ্বাস করো?—"না। কিন্তু এই পৃথিবীর অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি—"

৫০. নিজেকে হত্যার জন্যেই মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি করেছিল। আজ পর্যন্ত মানুষের সার্বজনিক ইতিহাসের মর্মার্থ এটাই।

৫১. দস্তেয়ভস্কির আর একখানা বিখ্যাত উপন্যাস।

৫২. বোরিস দ্য শ্লোয়েজের। (অনুবাদকের টীকা বিখ্যাত ফরাসি লেখক, সঙ্গীতজ্ঞ ও অনুবাদক। রুশ ভাষা থেকে ফরাসিতে অনেক বিখ্যাত বইয়ের অনুবাদ করেছিলেন তিনি।)

৫৩. জিদের অদ্ভুত এবং অন্তর্ভেদী মন্তব্য : দস্তেয়ভস্কির প্রায় সব নায়কই বহুগামী।

৫৪. উদাহরণ হিসেবে এখানে মেলভিলের 'মবি ডিক'-এর কথা বলা যায়।

৫৫. প্রাচীন ইরানীয় ধর্মদর্শন যার প্রতিষ্ঠাতা 'মানি'। এই দর্শন এক প্রকারের দ্বৈতবাদ। যা সবকিছুকেই ভালোমন্দ, সাদা কালো এই দুটি বর্গে বিন্যস্ত করে ব্যাখ্যা করে।

৫৬. গেথসেমানি হচ্ছে জেরুজালেমের অলিভ পর্বতের পাদদেশের একটি শহুরে উদ্যান। জায়গাটি এ জন্যেই বিখ্যাত ও পবিত্র যে, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগের রাতে তাঁর শিষ্যেরা এখানে ঘুমিয়েছিলেন এবং যীশুখ্রিস্ট এখানে প্রার্থনা করেছিলেন।

৫৭. *দুর্গ* উপন্যাসে মনে হয়, যে সহকারীরা '*কে*'-র চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়, পাস্কালীয় অর্থে তারাই চিত্তবিক্ষেপকে মূর্ত করে তোলে। ফ্রিয়েদা যদি শেষ পর্যন্ত কোনও একজন সহকারীর রক্ষিতা হয়েও থাকে, তবে তার হেতু এই যে, সে সত্যের থেকেও পারিপার্শ্বিকতা, ভাগ করে নেওয়া উৎকণ্ঠার থেকেও

প্রতিদিনের জীবনটাকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

৫৮. চিত্তের শুদ্ধতা।

৫৯. উনিশ-বিশ শতকের ফরাসি লেখক। আকাদেমি ফ্রঁসেজের সভাপতি হিসেবে ফরাসি শব্দকোষে মৌখিক শব্দাবলি ও ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়েছিলেন।

৬০. *দুর্গ* উপন্যাসে একমাত্র নিরাশাকাতর চরিত্র আমেলিয়া। একমাত্র তার প্রতিই জমির আমিনটি অতি হিংস্র বিরূপতা প্রদর্শন করেছে।

৬১. কাফকার চিন্তার দুটি দিককে তুলনা করে দেখুন, *দণ্ড উপনিবেশে* **(Au Bagne/In the Penal Colony)** : তাতে বলা হয়েছে "দণ্ড (ধরে নিন তা মানুষের) কখনই সন্দেহের বিষয় নয়" এবং *দুর্গ* উপন্যাসের একটা অংশ ( মোমুর রিপোর্ট মোতাবেক): জমির আমিন 'ক'-এর দোষ সাব্যস্ত করা কঠিন।

৬২. এখানে যা বলা হয়েছে তা অবশ্যই কাফকার রচনার একটা ব্যাখ্যা। কিন্তু আরও একটি কথাকে এর সঙ্গে যুক্ত করা সঙ্গত হবে যে, যাবতীয় ব্যাখ্যার বাইরেও বিশুদ্ধ নন্দনতত্ত্বের দিক থেকেও এর বিচার আটকে থাকে না। যেমন, বি গ্রথোসিয়ান *বিচার* উপন্যাসের তার উল্লেখযোগ্য কথামুখে আমাদের চেয়েও সতর্কভাবে নিজেকে সীমিত রেখেছেন স্রেফ এক দিবাস্বপ্নদর্শীর (তিনি বেশ লক্ষণীয়ভাবেই এটা অভিহিত করেন) বেদনার্ত কল্পনায়। এ বইটির নিয়তি এবং সম্ভবত মহনীয়তাই এই যে, তা আমাদের বহু কিছু দেয়, কিন্তু, কোনওটিকেই নিশ্চয়তা দেয় না।

—